বঙ্গ-গৌরব

প্রথম খণ্ড

রায়বাহাদুর শ্রীজলধর সেন প্রণীত

ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড্‌
২৯৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৯৯২

সূচী

বিজ্ঞপ্তি

কবি লংফেলো বলিয়াছেন ঃ—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime".

উপরিউক্ত কবিতার ভাবার্থ এই যে, মহৎ জীবনের কাহিনী আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমরাও চেষ্টা করিলে আমাদের জীবনকে মহৎ করিতে পারি। এই গ্রন্থখানি লিখিবার ইহাই উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থে বাঙ্গালী মহাত্মাদিগেরই জীবন-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার কারণ যে, বাঙ্গালী বালক ও যুবগণের দৃষ্টির সম্মুখে বাঙ্গালী আদর্শ-চরিত্র উপস্থাপিত করিলে তাহা অধিকতর গ্রহণীয় হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। অন্য দেশের মহাত্মাদিগের জীবন যে সকল পারিপার্শ্বিক অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে গঠিত হয়, এ দেশের শিক্ষার্থীদিগের সম্মুখে সে সকল আদর্শ উপস্থাপিত করিলে অনেক স্থলে তাহা সাধ্যাতীত বলিয়া মনে হইতে পারে। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমাদের দেশের বালক ও যুবকগণ যদি আদর্শ জীবন গঠনের প্রয়াসী হন, তাহা হইলে আমাদের যত্ন চেষ্টা সফল হইবে।

শ্রীজলধর সেন

বঙ্গ-গৌরব

দ্বিতীয় খণ্ড

রায়বাহাদুর শ্রীজলধর সেন প্রণীত

ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড্
২৯৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৯১৪

সূচী

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গ-গৌরবের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। বাংলা দেশের কিশোর কিশোরীদিগের অভিভাবকবর্গ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সাদরে গৃহীত হওয়ায় আমি এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে উৎসাহিত হইয়াছি। প্রথম খণ্ডের ন্যায় এখানিও জনাদর লাভ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।

এই গ্রন্থে বাঙালী মহাত্মাদিগেরই জীবন-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙালী ছাত্রগণের দৃষ্টির সম্মুখে বাঙালী আদর্শচরিত্র উপস্থাপিত করিলে তাহা সহজেই গ্রহণীয় হইবে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমাদের দেশের বালক ও যুবকগণ যদি আদর্শ জীবন গঠনের প্রয়াসী হন তাহা হইলেই আমাদের শ্রম সফল হইবে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার বন্ধুগণ নানাপ্রকারে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ ও শ্রীমান্ গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; তাঁহারা শ্রম স্বীকার না করিলে এই বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরে আমি এই খণ্ড প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ।

শ্রীজলধর সেন

রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন বর্তমান ভারতের বিরাটতম পুরুষ। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা শক্তিশালী লোক এ যুগে আর একটিও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রামমোহনের পূর্বপুরুষেরা বাঙালি ছিলেন না। তাঁহাদের আদিম নিবাস ছিল পশ্চিমে কনৌজ[১] প্রদেশ। কর্মব্যপদেশে তাঁহারা বাংলায় আসেন। তারপর এইখানেই থাকিয়া যান। ধীরে ধীরে বাংলার সমাজের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহারা বাঙালি হইয়া গিয়াছিলেন।

রামমোহনের পূর্বপুরুষদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা যেরূপ শ্রেষ্ঠ ছিল, তাঁহাদের সৎকার্যে ব্যয়, দান, ধ্যান, ধর্মানুরাগ প্রভৃতির খ্যাতিও তেমনি প্রচুর ছিল। রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[২] নবাবি আমলে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই তাঁহার কৃতিত্বের দ্বারা 'রায়' খেতাব লাভ করেন। তাহার পর হইতে এই খেতাব বংশানুক্রমিক ভাবে চলিয়া আসিয়াছে।

রামমোহনের পিতার নাম ছিল রামকান্ত রায়।[৩] রামকান্তের পিতা ব্রজবিনোদ[৪] যেমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন—রামকান্তও তেমনি পিতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতৃভক্তির একটি দৃষ্টান্ত বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ব্রজবিনোদ তখন মৃত্যুশয্যায়। এই আসন্নকালে শ্রীরামপুরের চাতরা গ্রামের শ্যাম ভট্টাচার্য[৫] নামক জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, তিনি রায় মহাশয়ের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

ব্রজবিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভিক্ষা?"

শ্যাম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন—"আপনি প্রতিশ্রুতি দিন আমাকে বিমুখ করিবেন না; তবেই আমি আমার যাচ্ঞার কথা নিবেদন করিব।"

"যদি আমার ক্ষমতায় কুলায়, আমি আপনাকে বিমুখ করিব না।"

শ্যাম ভট্টাচার্য তখন বলিলেন—"আমার কন্যার সহিত আপনার ছেলের বিবাহ দিতে হইবে।"

রায়-বংশ স্বভাব-কুলীন, পরম বৈষ্ণব। কিন্তু ভট্টাচার্য মহাশয় ভঙ্গ ও শাক্ত। সুতরাং উভয় পরিবারে বিবাহ অসম্ভব। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ব্রজবিনোদ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—সম্ভ্রম ও কুলের অপেক্ষা তিনি সেই প্রতিশ্রুতিই বড় বলিয়া মনে করিলেন। তিনি একে একে পুত্রগণকে ডাকিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা জানাইলেন এবং তাঁহাকে পণ হইতে মুক্তিদানের জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রজবিনোদের সাত পুত্রের মধ্যে কুল-ভঙ্গ ও একঘরে হইয়া থাকিবার ভয়ে পিতৃসত্য পালনে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পিতার বিষণ্ণ ও সজল চক্ষুর দিকে চাহিয়া রামকান্ত অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন—"বাবা,

আপনি চিন্তা ত্যাগ করুন, আমি ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিব।" শ্যাম ভট্টাচার্যের এই কন্যা তারিণী দেবীই রামমোহনের জননী।

রামমোহনের শৈশব জীবনের সঙ্গেও অনেক রকমের গল্প আছে এখানে একটির উল্লেখ করা গেল। রামমোহন মাতার সঙ্গে মাতামহের গৃহে গিয়াছিলেন। মাতামহের স্নেহে শিশুর হৃদয় সহজেই বশীভূত হইয়া পড়িল ও শ্যাম ভট্টাচার্য মহাশয় কেবলমাত্র পূজা করিয়াছেন, এমন সময়ে রামমোহন আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ভট্টাচার্য মহাশয় বিল্বপত্র দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। শিশু বিল্বপত্রের মর্যাদা বুঝতে না পারিয়া তাহা মুখে পুরিয়া দিল। বৈষ্ণবের পুত্রকে বিল্বপত্র মুখে দিতে দেখিয়া মাতা তারিণী দেবী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পুত্রের মুখ হইতে পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"বাবা, আপনি পরম বৈষ্ণবের পুত্রকে বেলপাতা খাওয়াইতেছেন, এ আপনার ভারী অন্যায়।"

কন্যার কথায় ভট্টাচার্য মহাশয়ের ক্রোধ কূল ছাপাইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার এই স্নেহের অবমাননায় অধীর হইয়া অভিসম্পাত দিলেন—"তোর এই সন্তান বিধর্মী হইবে।"

পিতার অভিসম্পাত শুনিয়া ভয়ে কন্যার মুখ শুকাইয়া গেল, চোখে ঝরনার ধারা জাগিয়া উঠিল। কন্যার কাতর মুখের পানে চাহিয়া ব্রাহ্মণের রোষ কিন্তু এক মুহূর্তও টিকিতে পারিল না। তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"মা, আমি ক্রোধবশে যে অভিসম্পাত দিয়াছি, তাহা ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার এই পুত্র অসাধারণ লোক হইবে। দেশবিদেশের লোক ইহার পূজার অর্ঘ্য রচনা করিবে। ইহার কীর্তিতে তোমার স্বামীর বংশ উজ্জ্বল হইবে।"

মাতামহের অভিসম্পাত এবং আশীর্বাদ রামমোহনের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল।

রামমোহনের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় অতি শৈশবেই পাওয়া যায়। পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে-খড়ির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একসঙ্গে দুইটি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই দুইটি ভাষা শিক্ষা করিতে তাঁহার মোটে তিন বৎসর লাগিয়াছিল। আট বৎসর বয়সে তিনি বাংলা ও পারসিতে পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রামমোহনের মনোযোগ এবং অধ্যবসায় অদ্ভুত ছিল। সেই বয়সেই তিনি গ্রন্থের ভিতর ডুবিয়া থাকিতেন। বালসুলভ কোন চাঞ্চল্য তাঁহার ছিল না। খেলাধূলার দিকেও মনোযোগ ছিল না; দিবারাত্রি সরস্বতীর আরাধনায় তাঁহার কাটিয়া যাইত। সুতরাং দেবীও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দান করিয়াছিলেন। রামমোহনের তীক্ষ্ণ ধী ও অপূর্ব প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত উজ্জ্বল, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না।

এই সময়ে রামমোহনের আরবি শিক্ষার দিকে ঝোঁক পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশে তখন আরবি শিখাইবার উপযুক্ত মৌলবি ছিল না, আরবি শিখিবার জন্য পাটনায় যাইতে হইত। নয় বৎসরের শিশুকে পাটনার মত দূরতর স্থানে পাঠাইতে পিতামাতার মন সহজেই

শঙ্কিত হইয়া পড়ে। সুতরাং রামমোহনের পিতামাতাও শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অবশেষে পুত্রের আগ্রহই জয়ী হইল। রামমোহন আরবি শিখিবার জন্য পাটনায় প্রেরিত হইলেন। আরবি ভাষা শিক্ষা করিতে তাঁহার তিন বৎসর লাগিয়াছিল। বারো বৎসরে তিনটি ভাষায় যাহা শিখিবার ছিল, সমস্তই তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িল।

হিন্দুদের মূর্তির প্রতি বিদ্বেষ এই সময়েই তাঁহার মনে সাড়া দেয়। মুসলমানদের সঙ্গে থাকিয়া এবং মুসলমান-গ্রন্থ পড়িয়া প্রতিমা-পূজার প্রতি তাঁহার ঘোরতর অশ্রদ্ধা জাগিয়া উঠে। তখন হইতেই তিনি মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধে সুযোগ পাইলেই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেন। পাটনা হইতে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বারাণসীতে গমন করেন।

সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতেও তাঁহার বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। অতি অল্প দিনের ভিতরেই সাহিত্য, দর্শন, উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে তিনি পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। উপনিষদ প্রভৃতির ভিতর তাঁহার মন যাহা খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, তাহাই লাভ করিল। মূর্তি-পূজার অসারত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মনে যতটুকু সংশয় ছিল, তাহাও ঘুচিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের ও সমাজের কুসংস্কার সম্বন্ধে তিনি তীব্রভাবে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেন, বৃদ্ধদের মুখের উপরেও তাহা ব্যক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। সুতরাং বারাণসীর পণ্ডিত-সমাজ তাঁহার উপর অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু বালকের তর্কশক্তি, যুক্তির ধারা এতই প্রবল ছিল যে, তাহাকে উপেক্ষা করা চলিত না। যুক্তিতর্কে আঁটিতে না পারিয়া অবশেষে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিধর্মী আখ্যা দান করিলেন। এই সময়েই প্রতিমা-পূজার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া রামমোহন তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন। সে সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ষোলো বৎসর।

সংস্কৃত পড়া শেষ করিয়া রামমোহন দেশে ফিরিয়া আসিয়াও এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। নিজের পুস্তকে তিনি যে মত এবং যুক্তি ব্যবহার করিয়াছিলেন, এখানেও তাহারই প্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। পিতামাতা, আত্মীয়স্বজনের উপদেশ ত ব্যর্থ হইলই, তাঁহাদের শাসনেও তাঁহার মন টলিল না। অবশেষে পরম বৈষ্ণব, গোঁড়া হিন্দু রামকান্ত রায় ধর্মদ্রোহী পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন!

ষোলো বৎসরের বালক গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াও ভীত হইলেন না। রামমোহন দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এখনকার মত তখন রেল বা স্টিমারের সৃষ্টি হয় নাই। তিনি পায়ে হাঁটিয়াই নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই ভ্রমণের ভিতর দিয়া তাঁহার যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল, তাঁহার জীবনে তাহার মূল্যও অল্প ছিল না। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি সুদূর তিব্বতে উপস্থিত হন। সেখানেও ধর্ম ও সমাজের নানারূপ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি মহা আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার ফলে অনেকগুলি লোক তাঁহার মহাশত্রু হইয়া উঠে। তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি স্নেহ-কোমলা দয়ার্দ্রহৃদয়া রমণীর চেষ্টায় তাহাদের সে সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়। সেই মেয়েদের কাছে ঋণের কথা রামমোহন জীবনে কখন বিস্মৃত হন নাই; সমস্ত জীবন ধরিয়া মেয়েদের প্রতি

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া এবং নারীজাতির উন্নতি-কল্পে চেষ্টা করিয়া রামমোহন এ ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রামমোহনের কষ্টের বার্তা এ-দিকে গৃহে আসিয়া পৌঁছিল। পিতামাতার হৃদয় পুত্রের বিপদে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। এই সময় রামমোহনের বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। গৃহে ফিরিয়া রামমোহন আবার নূতন করিয়া ভাষা-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ইংরেজি, হিব্রু, গ্রিক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, উর্দু ভাষা তাঁহার আয়ত্ত হইয়া গেল। রামমোহন মোটের উপর দশটি ভাষা জানিতেন। সেকালে তাঁহার মত এত ভাষাবিদ্ পণ্ডিত আর একজনও ছিলেন না। এই ভাষা-শিক্ষার ভিতর দিয়া প্রত্যেক জাতির সামাজিক ও ধর্ম-ধারা তাঁহার বৈশিষ্ট্য-অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে ধরা পড়িল। রামমোহনের অদ্ভুত প্রতিভার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই এ কথা সপ্রমাণ হইবে। তিনি বৃহৎ সাতকাণ্ড রামায়ণ[৬] একদিনে শেষ করিয়াছিলেন। এ শেষ করা কেবল পড়িয়াই শেষ করা নহে; প্রত্যেকটি শ্লোকের গূঢ় অর্থ, রচনার ভঙ্গি, ভাষার দোষগুণও এই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাছে একেবারে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

রামমোহন সমাজের বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত ধর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশ-দেশান্তর হইতে মহামহোপাধ্যায়েরা তাঁহার সহিত শাস্ত্র-বিচারের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এই বিচারে কখন কোনো পণ্ডিত জয়ের মাল্য জিনিয়া লইতে পারেন নাই একবার একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত তাঁহার সহিত তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসেন। তন্ত্র সম্বন্ধে রামমোহন কখনও চর্চা করেন নাই ; কিন্তু পরাজয় স্বীকার করাও তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি তাই একদিন পরে বিচারের দিন স্থির করিয়া শোভাবাজারের স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের[৭] নিকট হইতে একখানা তন্ত্র আনাইয়া লইলেন। একদিনে তিনি সেই দুরূহ তন্ত্রগ্রন্থ এরূপভাবে অধিগত করিয়াছিলেন যে, পরের দিন বিচারের আসরে সেই খ্যাতনামা তান্ত্রিক পণ্ডিতের যুক্তি তাঁহার যুক্তির সম্মুখে সূর্যালোক-ছিন্ন তুষারের মত মিলাইয়া গেল।

রামমোহনের পিতা মনে করিয়াছিলেন, তিব্বতের দুঃখ পুত্রকে হয় ত খানিকটা শান্ত করিয়াছে—সমাজের বিরুদ্ধে আর বিদ্রোহ করিতে তাঁহার সাহস হইবে না। কিন্তু রামমোহনের প্রকৃতি চিনিতেই তাঁহার ভুল হইয়াছিল। গৃহে ফিরিয়া পুত্রের সেই বিদ্রোহের স্পৃহা কিছুমাত্র কমিল না। সমাজ ও ধর্মের প্রতি আক্রমণ তাঁহার সমানভাবে চলিতে লাগিল। অবশেষে সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে ভীত হইয়া তিনি দ্বিতীয়বার পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। নির্ভীক রামমোহন এবারেও এই নির্বাসন-দণ্ড নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১২১০ সালে রামমোহনের পিতার মৃত্যু হয়। বিধর্মী পুত্রকে পিতার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। এবার আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে মাতাও পুত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। হাইকোর্টে নালিশ রুজু হইল। প্রথমে রামমোহন মামলা

করিবেন না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে মিথ্যার জয় হয়, এই আশঙ্কা করিয়া অনিচ্ছায় মাতার সহিত তাঁহাকে মোকদ্দমায় লিপ্ত হইতে হইল। বিচারে রামমোহনের জয় হইয়াছিল। কিন্তু তিনি জয়ের পর সমস্ত সম্পত্তি মাতৃচরণে অর্পণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। মা পুত্রের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া শেষে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

রামমোহনের সংস্কার-স্পৃহা যেমন একদল লোককে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল, তেমনি তাঁহার পাণ্ডিত্য, সত্যানুরাগ, তেজস্বিতা আর একদল লোককে তাঁহার অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার এই অনুরাগীদের ভিতর ডিগ্‌বি[৮] সাহেব ছিলেন একজন। ডিগ্‌বি যখন রংপুরের কালেক্টার, তখনই তিনি রামমোহনকে রাজকার্যে নিয়োগ করেন। চাকুরির জন্য আবেদন করিবার সময়েও তিনি তাঁহার নির্ভীক তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রামমোহন তাঁহার দরখাস্তে লিখিয়াছিলেন—তিনি উপরওয়ালাদের কাহারও কাছে হীনতা স্বীকার করিতে পারিবেন না; সকলের সঙ্গে তাঁহাকেও বসিবার জন্য সমানভাবে চেয়ার দিতে হইবে; তিনি কাহারও কাছে সেলাম ঠুকিয়া ঘাড় নীচু করিয়া দাঁড়াইবেন না।

চব্বিশ বৎসর বয়সে রামমোহন রাজকার্য গ্রহণ করেন। রাজকর্মচারীরূপে তিনি যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় সুপরিস্ফুট। তাঁহার চেষ্টায় গবর্নমেন্ট অফিস হইতে ঘুষ লওয়া বন্ধ হইয়াছিল; প্রজারা ন্যায় বিচার লাভ করিত; এবং বহু অত্যাচার দূর হইয়াছিল। গবর্নমেন্টও তাঁহার কৃতিত্বকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর সম্মানের পদ তখনকার দিনে আর কোন বাঙালি লাভ করেন নাই। রামমোহন ১৩ বৎসর রাজকার্য করিয়াছিলেন। তাবপর ৩৭।৩৮ বৎসর বয়সে একান্তভাবে আপনাকে সংস্কারের কার্যে নিযুক্ত করিবার জন্য তিনি রাজকার্য পরিত্যাগ করেন।

এই সময়ে মাতার সহিত এই সংস্কার ব্যাপার লইয়া তাঁহার আবার মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইল। রামমোহন এবার স্বেচ্ছায় পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া রঘুনাথপুরে আসিয়া বাড়ি করিলেন এবং সেই বাড়িতে একটি বেদি প্রস্তুত করাইয়া তাহার সম্মুখে লিখিয়া দিলেন— "ওঁ তৎসৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্।" বর্তমান ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি এইরূপে সেইখানেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল।

৪০ বৎসর বয়সে রামমোহন কলিকাতায় বাস করিবার জন্য আগমন করিলেন। তাঁহার গৃহে সেই সময় 'আত্মীয়সভা'[৯] নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় বেদপাঠ, পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা, ভগবানের নামগান প্রভৃতি করা হইত। তিনি নামগানের জন্য নিজে কতকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত[১০] রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, একদিকে যেমন ধীরে ধীরে তাঁহার ধর্মমত দেশের শিক্ষিত সমাজের মনে রেখা কাটিতে লাগিল, অন্যদিকে আবার তেমনি তাঁহার বিরুদ্ধে একটি পরাক্রান্ত দলের ও সৃষ্টি হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরই এই দলের সভাপতি হইয়া দেশবিদেশ হইতে বিখ্যাত পণ্ডিতের দল আনিয়া রামমোহনকে শাস্ত্রতর্কে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু, রামমোহনের তীক্ষ্ণ

প্রতিভার কাছে তাঁহারা কেহই টিকিতে পারেন নাই। এই সময় কতকগুলি শক্তিমান লোক রামমোহনের দলে যোগদান করেন। তাঁহাদিগকে লইয়াই আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ[১১] এই আদি-ব্রাহ্মসমাজের সর্বপ্রথম আচার্য।

অনেকে রামমোহনকে বিধর্মী, নাস্তিক বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া স্পষ্ট ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—তিনি পরম হিন্দু—এমন কি তিনি নূতন ধর্ম-প্রচারকও নহেন। আর্যঋষিদের সনাতন ধর্মের ভিতর কুসংস্কার প্রবেশ করিয়া যে জঞ্জাল ও গ্লানির সৃষ্টি করিয়াছে, তিনি সেই কুসংস্কারের হাত হইতে দেশকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।

রামমোহনের প্রণীত গ্রন্থের[১২] সংখ্যা ৭০ খানা। ইহার ৩২ খানা বাংলায় লিখিত এবং ৩৮ খানা ইংরেজিতে লিখিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি যে কত গভীর ছিল, এই পুস্তকগুলি পাঠ করিলেই তাহা বোঝা যায়। ইহা ছাড়া তিনি অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকারও সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইহাদের ভিতর 'ব্রাহ্মণ[১৩] নাম্নী একখানি পত্রিকার সম্পাদনায় রামমোহন 'শিবপ্রসাদ শর্মা' ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের পাদরিদের পরিচালিত 'সমাচার চন্দ্রিকা'[১৪] নাম্নী পত্রিকায় মিথ্যা কুৎসার প্রতিবাদকল্পে উহার জন্ম হয়। কিন্তু তাঁহার ছদ্মবেশ ধরা পড়িতেও বিলম্ব হয় নাই। রচনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যুক্তিই তাঁর ছদ্মবেশ ধরাইয়া দিয়াছিল। রামমোহনের যুক্তি-তর্ক, তাঁহার পাণ্ডিত্য, সর্বধর্মে তাঁহার গভীর জ্ঞান—বহু ইংরেজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। কলকাতার 'ব্যাপ্‌টিস্ট' মিশনের বড় পাদরি এ্যাডাম[১৫] সাহেব ত রামমোহনের কাছে দীক্ষাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনকার-ইতিহাসে এরূপ ঘটনার উদাহরণ আর একটিও পাওয়া যায় না।

সমাজ-সংস্কারের দিক হইতেও রামমোহনের দাবি কোন সংস্কারকের অপেক্ষা কম নহে। তখনকার দিনে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকেও স্বামীর চিতায় দাহ করা হইত। এই প্রথার নাম ছিল সতীদাহ।[১৬] ব্যাপারটা হৃদয়বিদারক হইলেও পাছে হিন্দুধর্ম এবং সমাজের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়, এই আশঙ্কায় গবর্নমেন্ট এ প্রথাটাকে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। রামমোহনই আন্দোলন, আলোচনার দ্বারা ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। বড়লাট সার উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের[১৭] কাছে তিনি ইহার বিরুদ্ধে যে দরবার করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আইন করিয়া সতীদাহ উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া কৌলীন্যপ্রথা, বালিকা-বিবাহপ্রথা, কুলীন কন্যাগণকে চিরকুমারী করিয়া রাখিবার প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধেও তিনি প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় হিন্দু রমণীদের অনেক কষ্ট দূরীভূত হইয়াছিল। দেশে ইংরেজি-শিক্ষার প্রচলনও বহুল পরিমাণে রামমোহনের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফল।

ইংরেজি ১৮৩০ অব্দের ১৫ নভেম্বর রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন। সেই সময় দিল্লির বাদশাহের সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কতকগুলি বিষয় লইয়া গোলমাল চলিতেছিল। পার্লামেন্টে আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্য বাদশাহ উপযুক্ত লোক খুঁজিতেছিলেন। রামমোহন স্বীকৃত হইতেই বাদশাহ তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিয়া বিলাত

পাঠাইয়া দেন। ইংল্যাণ্ডে রামমোহনের খ্যাতি ইতিপূর্বেই রটিয়া গিয়াছিল। তাই, তিনি যখন সেখানে পদার্পণ করিলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দন করিলেন। মন্ত্রীসভায় দরবার করিয়া তিনি এ দেশের হিতকর অনেকগুলি ব্যবস্থারও প্রবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাঁহার বাদশাহ-প্রদত্ত রাজা উপাধি মঞ্জুর করেন।

ইহার পর তিনি ফ্রান্সে বেড়াইতে যান। সেখানে ফরাসি সম্রাট স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সহিত আহার করিয়াছিলেন। এইখানেই কবি টমাস্ মুরের[১৮] সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। কবিবর তাঁহার ডায়ারিতে রাজার শক্তি, প্রতিভা ও গুণগ্রামের উল্লেখ করিয়া অনেক কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

লণ্ডনে ফিরিয়া তিনি ক্যাস্‌ল্ পরিবারের নিমন্ত্রণে ব্রিস্টলে গমন করেন। এইখানেই কুমারী মেরি কার্পেন্টারের[১৯] সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই মহিয়সী মহিলা রাজার নিকট হইতেই তাঁহার লোকহিত-ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রিস্টলে একটি বিরাট সভায় রাজা যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা। এই সভা হইতে ফিরিয়াই তিনি জ্বরে পড়েন। কুমারী ক্যাস্‌ল,[২০] কুমারী কার্পেন্টার, ডেভিড্ হেয়ারের ভগ্নী কুমারী হেয়ারের[২১] অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষা, শ্রেষ্ঠ চিকিৎকগণের ব্যবস্থা তাঁহার দেহের ভিতর প্রাণটা ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ২৭ সেপ্টেম্বর সেই বিদেশে নিঃসম্পর্কীয় অথচ পরম আত্মীয়দের ভিতর তিনি দেহ রক্ষা করিলেন। পর যে কত বেশি আত্মীয় হইতে পারে, রাজার মৃত্যুতে তাঁহার বিদেশি বন্ধুবান্ধবের অশ্রু-প্রবাহ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। সেইখানেই কুমারী ক্যাসেলের একটি সুন্দর উদ্যানে তাঁহাকে মহাসমারোহে সমাহিত করা হয়। তারপর দ্বারকানাথ ঠাকুর[২২] যখন বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুণ্যময় দেহ সেখান হইতে উঠাইয়া আনিয়া নস্‌ভেল্[২৩] নামক স্থানে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। সমাধিক্ষেত্রের উপর তিনি একটি মন্দিরও নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বাংলার এই বিরাট পুরুষকে বাংলা তখনকার দিনে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই ; আজ চিনিয়াছে। তাই আজ রামমোহনের কথা স্মরণ করিয়া সমগ্র জাতি গর্ব ও গৌরব অনুভব করে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নাম আজ বাংলা দেশের প্রায় সকলের কাছেই সুপরিচিত। বহুকাল হইতেই এই ঠাকুরবাড়ি দেশ-দেশান্তরে খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে। বুদ্ধিতে, ধনে, সম্পদে, কুলে, শীলে, দানশীলতায় এবং অন্যান্য বিবিধ গুণে এই ঠাকুর-বংশের অনুরূপ আর একটা বড় বংশ দেখা যায় না।

এই ঠাকুর পরিবারে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। মহাসম্মানকর 'প্রিন্স' উপাধি তাঁহার নামকে ভূষিত করিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দ্বারকানাথেরই[১] পুত্র। ইংরেজি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে দেবেন্দ্রনাথের[২] জন্ম হয়। দেবেন্দ্রনাথের জন্মের দ্বারা কেবলমাত্র ঠাকুরবংশ নহে, বাংলাদেশও ধন্য হইয়াছে।

অতি বাল্যকালেই দেবেন্দ্রনাথের ভিতর ধীর, স্থির, সদাপ্রসন্ন ভাব ও বুদ্ধির প্রখরতা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। উপনয়নক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ব্রাহ্মণের নিত্যকর্মগুলি তিনি অনায়াসেই অধিগত করিয়া লইয়াছিলেন। তখন হইতেই তিনি অতি নিবিষ্ট চিত্তে পূজা-আরাধনা করিতেন। শৈশব হইতেই দেবেন্দ্রনাথ পরম শুদ্ধাচারী, কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, পরিশ্রমী ও ধার্মিক ছিলেন।

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ধর্মশিক্ষার অভাব না হয়, এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রথম আমলে সেই ধর্মবিপ্লবের যুগে খ্রিস্টান মিশনারিদের স্থাপিত স্কুলসমূহে অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রেরা যাহাতে বিপথে ধাবিত না হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় নিজ বন্ধুদের সহায়তায় একটি পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের নিজ বাটীর বালকগণ এবং তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুদের অনেক ছেলে তখন এই স্কুলেই পাঠাভ্যাস করিত। দেবেন্দ্রনাথকে যথাসময়ে এই স্কুলেই ভরতি করিয়া দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া বালক দেবেন্দ্রনাথ অতি আশ্চর্যরূপ জ্ঞানলাভ করেন। তিনি যে স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, তাহাও বিস্ময়কর। ইহার পর উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য দ্বারকানাথ তাঁহাকে চৌদ্দ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন।

রামমোহন দ্বারকানাথের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। রামমোহনের অভিলাষ অনুযায়ী দ্বারকানাথের সুবৃহৎ বাসভবনের এক অংশে ব্রাহ্মধর্মের প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরটিই 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'[৩] নামে সুপরিচিত। রামমোহনের গভীর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, দেবেন্দ্রনাথ হইতেই তাহার প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। দেবেন্দ্রনাথও রামমোহনের একান্ত গুণমুগ্ধ ও পরম ভক্ত হইয়া পড়েন। রামমোহন যখন স্বদেশ ছাড়িয়া বিলাত গমন করেন, সেই সময়

তিনি তাঁহার এই প্রিয়তম শিষ্যটিকে নিকটে ডাকিয়া কতকগুলি উপদেশ দিয়া যান। সেই উপদেশগুলিই দেবেন্দ্রনাথের জীবনে নূতন পথের সন্ধান আনিয়া দিয়াছিল। ইহার পর হইতেই তাঁর ধর্মানুসন্ধিৎসাও অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠে। তিনি বড় বড় ধার্মিক পণ্ডিতের সহিত ধর্ম-আলোচনা করিতে করিতে এমন সকল প্রশ্ন করিতেন, যাহাতে মহামহোপাধ্যায়েরাও অবাক হইয়া যাইতেন।

এই সময় একদিন হঠাৎ একখানা উপনিষদের ছেঁড়া পাতা[৪] তিনি কুড়াইয়া পান। পাতাটি পড়িয়া সমস্ত অর্থ তাঁহার বোধগম্য হইল। না। কিন্তু যেটুকু বুঝিলেন, তাহাতেই মনে হইল—তিনি যাহা খুঁজিতেছেন ইহার ভিতর দিয়াই তিনি তাহা লাভ করিতে পারিবেন। ইহার পর সেই ছেঁড়া পাতাখানি লইয়া দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট উহার তাৎপর্য অবগত হইবার জন্য গমন করেন। উপনিষদের ধর্ম এইরূপ আকস্মিক ভাবে দেবেন্দ্রনাথের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

হিন্দু কলেজে দেবেন্দ্রনাথ লেখাপড়ায় যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেখানকার শিক্ষাও তাঁহার সমাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু যে জ্ঞান লাভের জন্য দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সে জ্ঞান সেখানকার শিক্ষা তাঁহাকে দিতে পারে নাই। কলেজ-গৃহে ছাত্রদের চেষ্টায় 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জন সভা'[৫] নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ সে সভার সভ্য ছিলেন। কিন্তু নামে জ্ঞানোপার্জনী সভা হইলেও জ্ঞান উপার্জনের সুবিধা সেখানে ছিল না; অথচ সভায় নানা রকমের আলোচনার দ্বারা জ্ঞানার্জনের যে একটা সুযোগ পাওয়া যায়, দেবেন্দ্রনাথ তাহা বিশ্বাস করিতেন। তাই হিন্দু-কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই একটি সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার নাম হইল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'।[৬] প্রতি মাসেই নিয়মিত ভাবে এই সভার অধিবেশন হইত এবং ধর্ম সম্বন্ধে নানা তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা চলিত। এই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাই দেবেন্দ্রনাথের জীবনের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁচিশ বৎসর মাত্র।

এই তত্ত্ববোধিনী সভা দেশের বহু হিতকর কার্য সম্পাদন করিয়াছে। তখনকার দিনে ইহা জ্ঞান-চর্চ্চার একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ছিল। পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার সভ্য ছিলেন এবং সকলেই ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ যদিও সাধারণত বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনায় মগ্ন থাকিতেন, তথাপি সাংসারিক কর্তব্য-পালনে কখনও তাঁহাকে অবহেলা করিতে দেখা যায় নাই। পুত্রের ক্ষমতা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া দ্বারকানাথ জমিদারি পরিচালনার ভার তাঁহার হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ব্যবসায়ে মনোযোগ দেন। তাঁহার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "কার ঠাকুর এন্ড কোং"।[৭]

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পর নানা স্থানেই স্কুল-কলেজ গড়িয়া উঠে। কিন্তু এ সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার কোনও উপায় ছিল না। এই অভাব

দূর করিবার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার সাহায্যে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা[৮] নামে একটি নূতন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রের সঙ্গে লেখাপড়াও শিক্ষা দেওয়া হইত। যাহাতে ধর্মের জটিল তত্ত্বসমূহ ছাত্রগণ সহজে বুঝিতে পারে, সেজন্য স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত[৯] প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যকদের দ্বারা পুস্তক লিখাইয়া দেবেন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ে পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান সমৃদ্ধি দেবেন্দ্রনাথের কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী।

বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য দেবেন্দ্রনাথ যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বাঙালি যাহাতে সহজ, সরল এবং সাধু বাংলা লিখিতে পারে, বাংলা ভাষার যাহাতে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠে, দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য সেদিকে কম ছিল না। আজ বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকার অভাব নাই। কিন্তু এ প্রথার প্রবর্তক যে কে, আমরা অনেকেই তাহার সংবাদ রাখি না। বাংলায় দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই[১০] সর্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা। তখনকার দিনে ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই পত্রিকাখানি বাংলার শিক্ষিত-সমাজের ভিতর যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের সেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এখনও প্রকাশিত হয়—এখনও তাহা লুপ্ত হয় নাই।*

তখনকার দিনে আজকালকার মত সকল রকমের পুস্তক এ দেশে এত সহজ-লভ্য ছিল না। সুতরাং জ্ঞানার্জনের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে পুস্তক পড়িবার সুযোগ পাইতেন না। দেশের এত বড় একটা অভাব দূর করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার পরিচালনায় একটি গ্রন্থসভা ও পুস্তকাগারেরও প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুস্তকালয় এক্ষণে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি' নামে প্রসিদ্ধ। বহু প্রাচীন গ্রন্থ এই পুস্তকাগারে সংগৃহীত আছে।

মিশনারিরা বড় বড় স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়া খ্রিস্টধর্ম প্রচারের যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন। অনেক হিন্দুর ছেলে তাঁহাদের স্কুলে পড়িতে গিয়া তাঁহাদের ধর্ম গ্রহণ করিতেন। হিন্দুদের খ্রিস্টান হইবার এই পথটি বন্ধ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের মাথায় বড় বড় স্কুল প্রতিষ্ঠার কল্পনা জাগিয়া উঠে। তিনি দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা বুঝাইয়া দেন। ফলে ইতর-ভদ্র ছোট-বড় প্রায় সহস্র লোক লইয়া ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়[১১] নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। স্কুল স্থাপনের জন্য ৪০ হাজার টাকা মূলধন উঠিয়াছিল এবং স্বনামধন্য পণ্ডিত স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়[১২] ইহার প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিলাতে একান্ন বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। পিতার শোক পুত্রের হৃদয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবেই বিদ্ধ হইল। তাহা ছাড়া দেখা গেল দ্বারকানাথ প্রচুর ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। দানে তাঁহার কুবেরের ভাণ্ডারও একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

---

* বর্তমানে লুপ্ত।

বিপন্ন দেবেন্দ্রনাথকে অনেক হিতৈষী বন্ধু পিতৃঋণ অস্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঘৃণার সহিত সে সকল প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করেন নাই। দীন দরিদ্রের বেশ ধারণ করিয়া অতিশয় মিতব্যয়িতার সহিত সংসার চালাইয়া দেবেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ঋণের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত পরিশোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ধর্মপথে চলার পুরস্কার পাইতেও বিলম্ব হয় নাই। ভগবৎকৃপায় ক্রমে ক্রমে আবার অগাধ ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়া তিনি বিপুল সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি ধর্মের সংস্কার, উন্নতি ও প্রচার কার্যে মন দেন। প্রাচ্যধর্মের নিয়ম-প্রণালী, আচার-অনুষ্ঠান সাধারণ লোকে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, সেজন্য তিনি ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত বহু পুস্তক[১৩] লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই সকল সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যাও তাঁহার অল্প নহে। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় এবং প্রধান শিষ্য ছিলেন।

সর্বদা, সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রাচীন আর্য ঋষিদের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথের জীবন শুদ্ধ, পবিত্র ও নির্মল ছিল। তাই লোকে তাঁহাকে 'মহর্ষি' আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। বস্তুত তিনি মহর্ষিদের মত আশ্রমও রচনা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ বয়সে নির্জনে ধর্মচর্চার জন্য শহরের কল-কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া বোলপুরের এক প্রান্তে এক আশ্রম রচনা করিয়া তিনি ব্রহ্ম-আরাধনায় ব্যাপৃত হন। তাঁহার এই আশ্রমই বর্তমানে শান্তিনিকেতন আশ্রম নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু কিন্তু তাহা হইলেও এক দলের সহিত অন্য দলের প্রীতির যাহাতে অভাব না ঘটে, তজ্জন্য দেবেন্দ্রনাথ একটি বাৎসরিক ব্রাহ্ম-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া যান। ইংরেজি ১৮৭৪ অব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহারই চেষ্টায় 'সমদর্শী'[১৪] নামে একখানি পত্রিকা বাহির হয়। সেই বৎসরই তাঁহার গৃহে সমবেত হইয়া সমস্ত ব্রাহ্ম মহাসমারোহে মহাসম্মিলনের উৎসব করিলেন। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় নানা ভাগে বিভক্ত হইলেও দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব কোন দলের লোকই অস্বীকার করেন নাই। নিজের চরিত্রগুণে তিনি সকল দলের সমস্ত লোকেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন।

দানশীলতায় হাত অতিমাত্রায় মুক্ত ছিল। বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার দ্বার হইতে কখনও শূন্য-হস্তে ফেরে নাই। দেশের দুর্ভিক্ষ, মহামারি, জলপ্লাবন—সমস্ত দৈবদুর্বিপাকেই তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে দান করিতেন।

সমগ্র ভারতের গৌরব দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৫] দেবেন্দ্রনাথেরই পুত্র। তাঁহার আর একটি পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ[১৬] এবং একটি কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী[১৭] বাংলাসাহিত্যের সেবা করিয়া যশ অর্জন করিয়াছেন। আর, আজ যাঁহার যশ-সৌরভে সমস্ত পৃথিবী উদ্‌ভ্রান্ত, যাঁহার কাব্য-প্রতিভা বিশ্বের সমস্ত কবির দীপ্তিকে ম্লান করিয়া দিয়াছে, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও জনক আমাদের এই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

বাংলাদেশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট অজস্র ঋণে ঋণী। নানারকমের অবদানে তিনি বাংলাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন। তাই বাঙালি চিরদিন তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত, আনন্দের সহিত, গৌরবের সহিত স্মরণ করিবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের নাম জানে না, বাংলায় এমন লোক কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। 'বিদ্যাসাগর' বলিলে যে বিরাট পুরুষের ভাস্বর মূর্তি চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠে, সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ-সিংহের নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালি ছিলেন, প্রকৃত মানুষ ছিলেন—যেমন ভাবুক, তেমনি কর্মী; যেমন দয়ালু, তেমনি দাতা ; যেমন সত্যনিষ্ঠ, তেমনি নির্ভীক। তাঁহার আত্মমর্যাদা-বোধ যেমন সজাগ ছিল, তিনি তেমনি নিরহঙ্কার ছিলেন। এদিকে প্রকাণ্ড পণ্ডিত, কিন্তু সরলতা দেখিলে মনে হইত যেন বালক। ন্যায়পরায়ণতায় বজ্রের মত কঠোর, আবার ঔদার্যে কুসুমের মত কোমল। জাতির বহুভাগ্যে দেশে এ-হেন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। শতাধিক বর্ষ বাঙালির জীবনে একদিন সেই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। সন ১২২৭ সালের ১২ আশ্বিন মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হুগলি জেলার বনমালীপুরের ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালংকার মহাশয়ের পুত্র রামজয় বিদ্যাভূষণ পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবিরোধে বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। যে ভাইয়ের মুখ দেখিতে চাহে না,—সে যে পরের মেয়ে ভ্রাতৃবধূর দিকে তাকাইবে না, সে ত জানা কথা! সুতরাং বিদ্যাভূষণের সন্ন্যাস গ্রহণে পত্নী দুর্গা বড়ই বিপদে পড়িলেন; অপোগণ্ড ছেলেমেয়েগুলি লইয়া তাঁহার দুঃখকষ্টের আর অবধি রহিল না। সংবাদ বীরসিংহে পৌঁছিল, কন্যার দুরবস্থার কথা শুনিয়া উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় অস্থির হইয়া উঠিলেন; অচিরে পুত্রকন্যাসহ দুর্গা দেবী বীরসিংহে পিত্রালয়ে নীত হইলেন। কিন্তু, অদৃষ্টের লিপি কেহ খণ্ডাইতে পারে না—পিত্রালয়ে আসিয়াও তিনি স্বস্তি লাভ করিতে পারিলেন না, ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবধু তাঁহাকে যখন তখন গঞ্জনা দিতে লাগিলেন। অবস্থা বুঝিয়া তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বাটীর নিকটে দুর্গা দেবীর বাসের জন্য একখানি কুটির তুলিয়া দিলেন। দুর্গা দেবী ছেলেমেয়েদের লইয়া ভ্রাতার সঙ্গে পৃথক হইয়া অনেকটা আরাম পাইলেন বটে, কিন্তু চমৎকারা অন্নচিন্তা তাঁহাকে দিশাহারা করিয়া তুলিল। তবু ত সেকালে অনাথ রমণীদের পরম ভরসাস্থল চরকা ছিল। দুর্গা দেবী অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে চরকা কাটিয়া যাহা উপার্জন করিতে লাগিলেন, নিজে কোনো দিন না খাইয়া, কোনো দিন আধপেটা খাইয়া, তাহা হইতেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া-পরার সংস্থান জুটাইয়া চলিলেন। দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস মায়ের কষ্ট দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বীরসিংহের জগন্মোহন ন্যায়ালংকার[১]
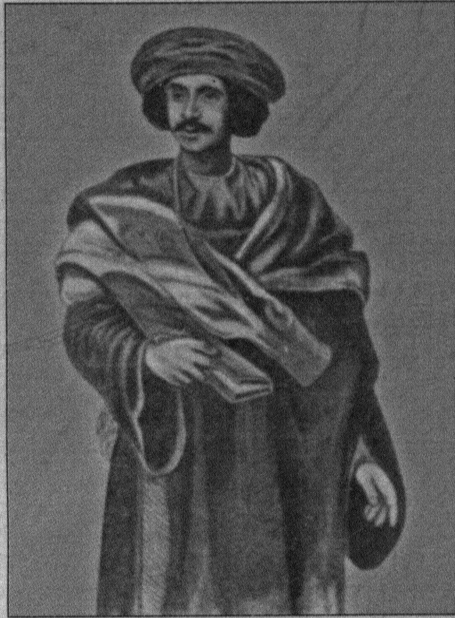
রাজা রামমোহন রায়
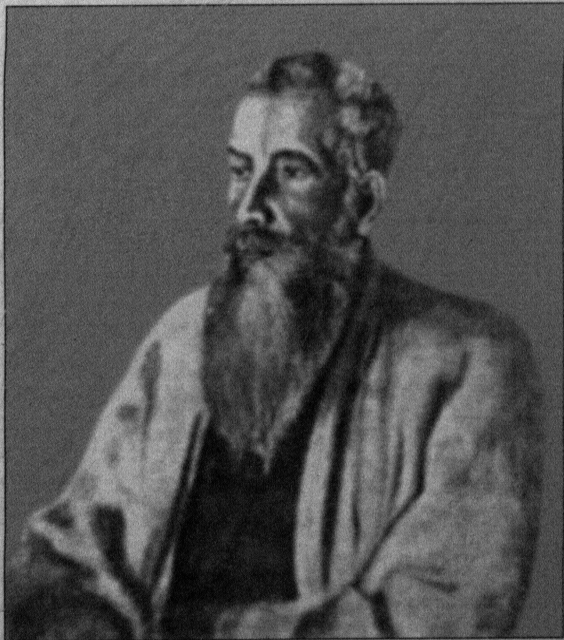
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
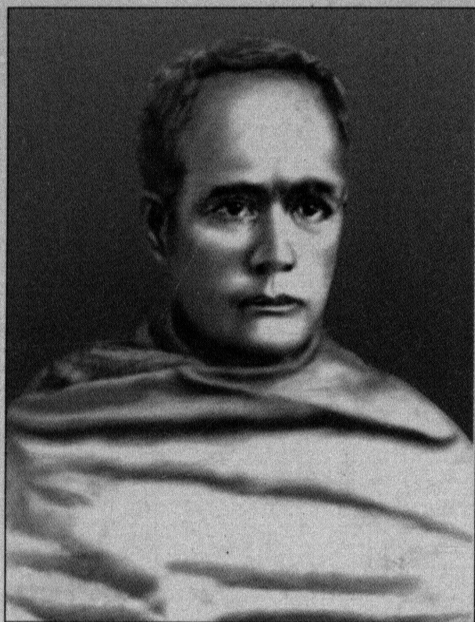
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কেশবচন্দ্র সেন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
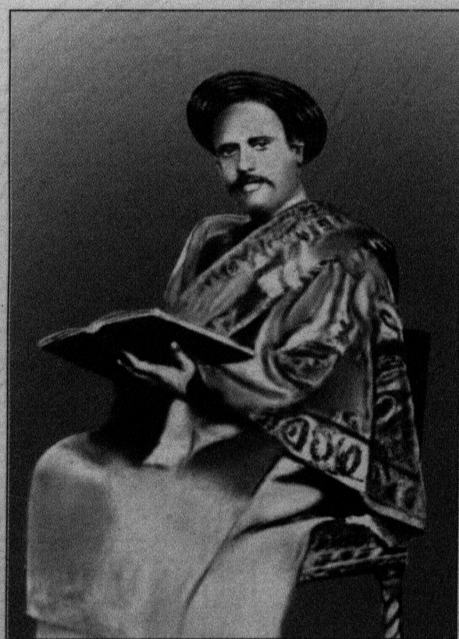
কৃষ্ণদাস পাল
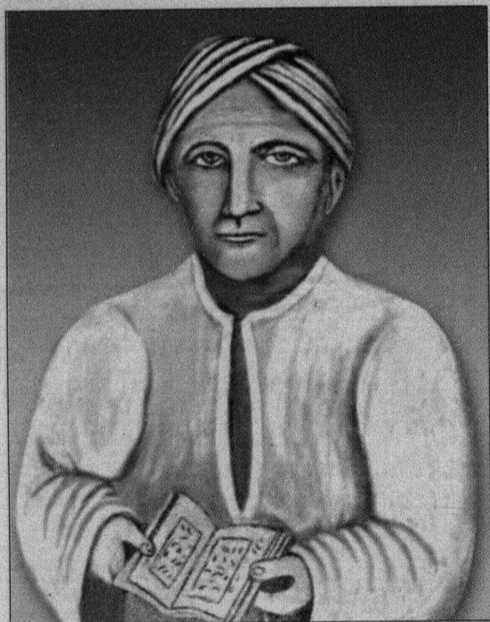
হাজি মহম্মদ মহসীন

স্বামী বিবেকানন্দ
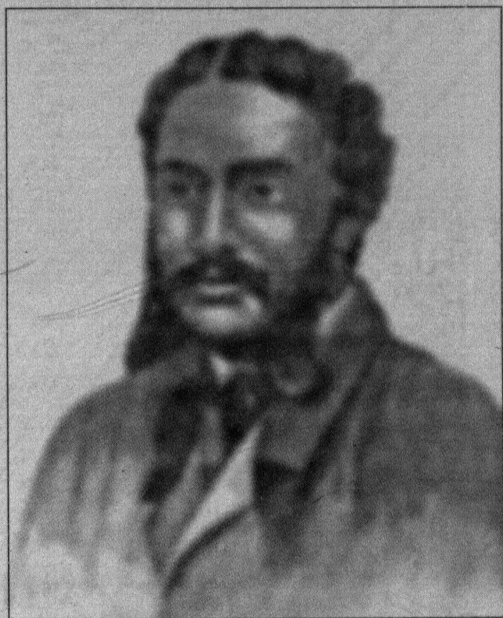
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
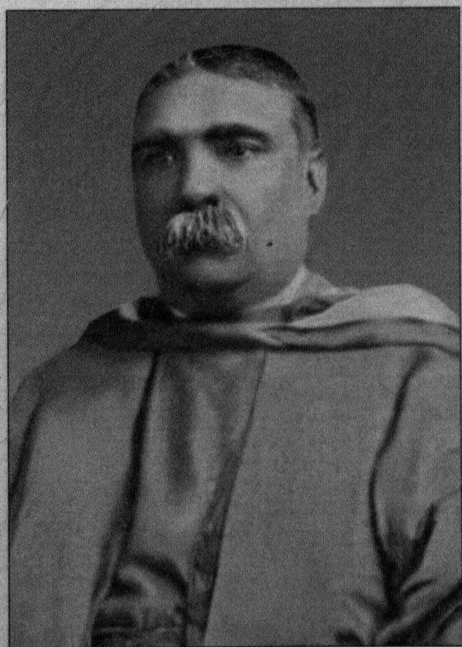
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
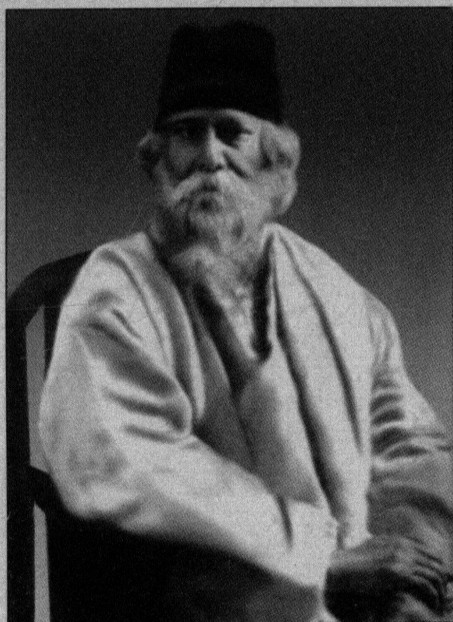
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
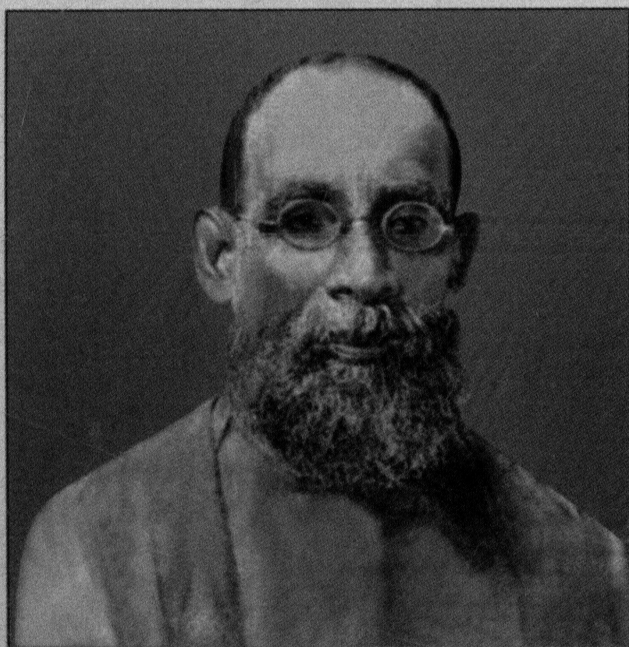
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
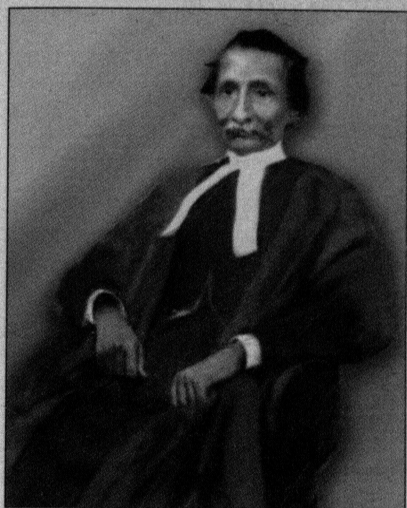
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
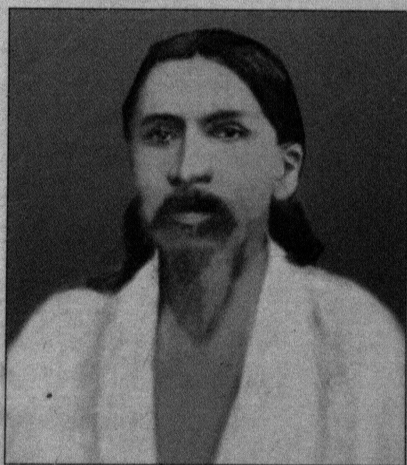
অরবিন্দ ঘোষ
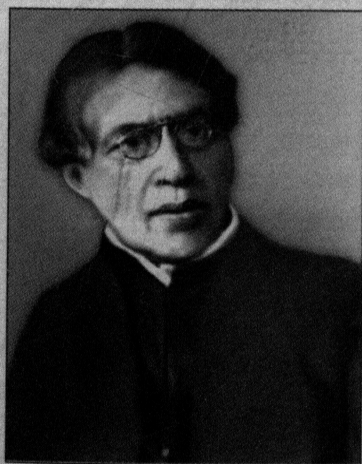
জগদীশচন্দ্র বসু

প্রফুল্লচন্দ্র রায়
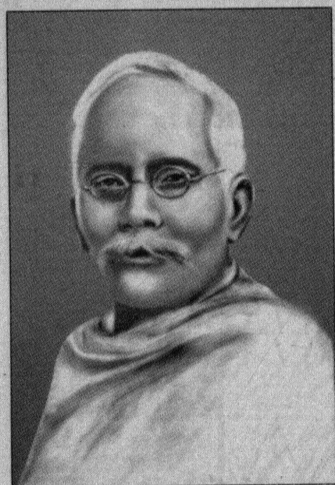
অশ্বিনীকুমার দত্ত
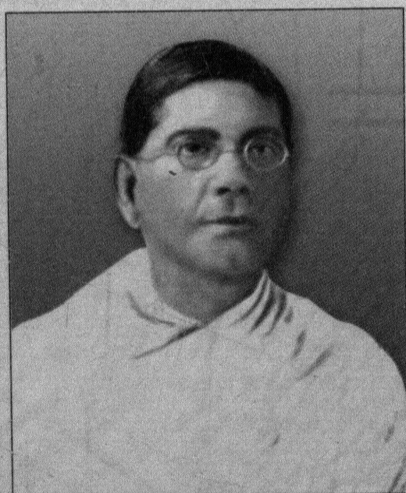
চিত্তরঞ্জন দাশ

সে সময় কলিকাতায় থাকিতেন; তাঁহার অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল। ন্যায়ালংকারের পরামর্শমত পনেরো বৎসরের বালক অর্থোপার্জনের আশায় কলিকাতা যাত্রা করিলেন; ন্যায়ালংকার নিজের বাসায় তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ঠাকুরদাস কলিকাতায় আসিয়া চাকুরির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু লেখাপড়া ভাল শেখেন নাই; বিশেষত ইংরেজি ত একেবারেই জানেন না। চাকুরি করিতে হইলে এ সব একটু-আধটু জানা দরকার। সুতরাং প্রথমে তিনি কিছু ইংরেজি শিখিতে মনস্থ করিলেন। কিছুদিন ন্যায়ালংকারের বাড়িতে থাকিয়া, পরে ভাগবতচরণ সিংহের[২] আশ্রয়ে নিজে রাঁধিয়া খাইয়া, অতি কষ্টে সামান্য কিছু ইংরেজি শিখিয়া ঠাকুরদাস মাসে দুই টাকা মাহিনায় একটি চাকুরি লাভ করেন। ভাগবতচরণ দালালি করিতেন; ব্যবসায়ের বাজার নরম হওয়ায় তাঁহার উপার্জন বন্ধ হইয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাসকেও তাহার ফলভাগী হইতে হয়। এই সময় এক একদিন তাঁহাকে উপবাসে কাটাইতে হইত। একদিন ক্ষুধার তাড়নায় বসিয়া থাকিতে না পারিয়া পথে বাহির হইয়া পড়েন, এবং বড়বাজার হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে ঠনঠনিয়ায় গিয়া উপস্থিত হন। সেদিন এক মুড়কিওয়ালী তাঁহার মুখ দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে দই-মুড়কি না খাওয়াইলে তিনি বোধ হয় হাঁটিয়া আর বাসায় ফিরিতে পারিতেন না। যাহা হউক দুই টাকা মাহিনার চাকুরি পাইয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং সেই সংবাদে তাঁহার জননী যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গলাভ করিলেন। সেকালে জিনিষপত্র এত সস্তা ছিল যে, দুই টাকাতেই একটি বৃহৎ পরিবারের ব্যয় সংকুলান হইত। সুতরাং দুই টাকা মাহিনাতেও আনন্দের কারণ যথেষ্টই ছিল।

দেখিতে দেখিতে আট বৎসর গত হইয়া গেল, হঠাৎ একদিন রামজয় তর্কভূষণ মহাশয় আসিয়া বীরসিংহে উপস্থিত হইলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহধর্ম পালনের জন্য তিনি দেবাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় বাড়ি আসিয়া ঠাকুরদাসের বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গোঘাট গ্রামের রামকান্ত তর্কবাগীশ[৩] শবসাধনা করিতে গিয়া পাগল হইয়াছিলেন ; তাঁহার পত্নী গঙ্গা দেবী পাগল স্বামী ও দুইটি মেয়ে লইয়া পিত্রালয় পাতুলে আসিয়া বাস করেন। তর্কভূষণ মহাশয় রামকান্তের কনিষ্ঠা কন্যা ভগবতী দেবীর সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিবাহ দেন। প্রথম সন্তান-সম্ভাবনার সময় ভগবতী দেবী পাগলের মত হইয়াছিলেন। লোকে মনে করিত এ বংশানুক্রমিক ব্যাধি বোধহয় সারিবে না। নানারূপ চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া তর্কভূষণ মহাশয় ভবানন্দ শিরোমণি[৪] নামক একজন জ্যোতিষীকে আনাইয়া ভগবতী দেবীর কোষ্ঠী-বিচার করেন। শিরোমণি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, "এঁর গর্ভে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন এবং প্রসবের পর এ পাগলামির চিহ্নমাত্রও থাকিবে না"। আশ্চর্যের বিষয়, ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হইয়াছিল। পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের পরমুহূর্তেই ভগবতী দেবী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ তাহার জিহ্বার নীচে আলতা দিয়া কি মন্ত্র লিখিয়া দিলেন; তারপর পুত্র ঠাকুরদাসকে গিয়া বলিলেন, "আমাদের একটা এঁড়ে বাছুর হইয়াছে, ইহার সামনে

কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না। এ বালক ভবিষ্যতে মহাপুরুষ হইবে। আমি নিজে ইহাকে দীক্ষা দান করিলাম এবং ইহার নাম রাখিলাম ঈশ্বরচন্দ্র"।

পাঁচ বৎসর বয়সে গ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে-খড়ি হয়। বিদ্যারম্ভের বৎসর-খানেকের মধ্যে একবার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন ; চিকিৎসার জন্য প্রায় ছয়মাস কাল তাঁহাকে পাতুলে গিয়া থাকিতে হয়। মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের[৫] যত্নে আরোগ্যলাভের পর তিনি বীরসিংহে ফিরিয়া আসেন এবং পুনরায় সেই পাঠশালায় ভরতি হন। আট বৎসর বয়সের সময় পড়িবার জন্য তিনি পিতার সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করেন।

গল্প আছে, মেদিনীপুর হইতে পদব্রজে কলিকাতা যাইবার কালে 'মাইল-স্টোনের' ইংরেজি সংখ্যা দেখিয়া তিনি কলিকাতা পৌঁছিয়া ইংরেজি বিলের অঙ্ক-সংখ্যা যোগ করিতে পিতার সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসে কলিকাতায় আসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হন। ঠাকুরদাস ভাগবত সিংহের বাড়িতেই থাকিতেন। ভাগবতবাবুর পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ,[৬] বিশেষত তাঁহার ভগিনী রাইমণি বিদ্যাসাগরকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহাদের প্রাণপণ যত্নেও বিদ্যাসাগর আরোগ্যলাভ করিলেন না ; তখন তাঁহার পিতামহ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে দেশে লইয়া গেলেন। আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং ইং ১৮২৯ অব্দে ১ জুন সংস্কৃত কলেজে ভরতি হইলেন। নয় বৎসর বয়সে কলেজে প্রবেশ করিয়া একুশ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি[৭] লাভ করিয়াছিলেন। কলেজে বরাবর তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, বৃত্তি পাইয়াছেন; অধ্যাপকগণ তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি,অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি, নিষ্ঠাপূর্ণ অনুরাগ এবং প্রচুর পরিশ্রম-সামর্থ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন, এবং তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। বিদ্যাসাগর কলেজে প্রবেশের ছয় মাস পরের পরীক্ষায় পাঁচ টাকা বৃত্তি পান; সতেরো বৎসর বয়সে[৮] সেকালের কঠিন পরীক্ষা ল' কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিপুরা জেলায় জজ-পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন ; কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে সে পদ গ্রহণ করিতে দেন নাই[৯]। তিনি দর্শনের পরীক্ষায় একশত টাকা এবং সর্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিয়া আরও একশত টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পড়িবার কালে কলিকাতা বাসায় তাঁহাকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা ভাবিলে, এখনকার প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বিদ্যুতের পাখার নীচে অতি আরামে উপবিষ্ট কলিকাতার বিদ্যার্থীমণ্ডলী হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বাসার সমস্ত রান্না বিদ্যাসাগরকেই সম্পন্ন করিতে হইত ; পিতাকে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে খাওয়াইয়া, বাসন মাজিয়া, ঘর ধুইয়া তবে তিনি নিজে খাইতে পাইতেন। দুই বেলাই এইরূপ করিতে হইত। ইহার উপর যদি একটু কাজে ত্রুটি ঘটিত, রাত্রে পড়িবার সময় একটু ঢুলিয়া পড়িতেন, ঠাকুরদাস এমন প্রহার করিতেন যে, সিংহদিগের লোকেরা ছুটিয়া আসিয়া বালককে রক্ষা করিতেন। এ দিকের ত এই দুর্দশা ; খাওয়ার অবস্থা ছিল

ইহা অপেক্ষাও শোচনীয়। দুইবেলা নুন ভাত, বৈকালে একমুঠো ছোলা-ভিজা ইহাই ছিল নিত্যকার আহার। দৈবাৎ যদি কোনো দিন মাছ জুটিত, মাছ ও তরকারির ঝোল রাঁধিয়া একবেলা শুধু ঝোল, পরের বেলায় শুকনো তরকারি, তার পরদিনে সেই মাছ অম্বলে দিয়া তাহার খানিকটা, এমনি করিয়া চারি পাঁচদিন তাহার জের চালাইয়া তবে মাছটুকু খাইতে পাইতেন।

কিন্তু ইহাই বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব ছিল তাঁহার দয়ার ভাণ্ডারে। তিনি সকল বিদ্যার সার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ; তাহা সর্বজীবে সমভাবে দয়া বিতরণ। দয়ায় তাঁহার পাত্রাপাত্র ভেদ ছিল না। তিনি মাইকেল মধুসূদনের মত লোককে টাকা দিয়া কতবার সাহায্য করিয়াছেন। বিসূচিকা-রোগাক্রান্ত, সর্বাঙ্গবিষ্ঠালিপ্ত, পথে পতিত ভিখারিনিকেও তুলিয়া সাহায্যদানে তিনি কোনোরূপ কুণ্ঠিত হইতেন না। এই দয়াই তাঁহাকে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে প্রবর্তিত করিয়াছিল। বাল্যবিধবাদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ গলিয়াছিল, তাই তিনি তাঁহাদের পুনরায় বিবাহ দিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ বৈধ কি অবৈধ, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সহৃদয়তা সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। এ জন্য তিনি যে পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, সে শুধু তাঁহাতেই সম্ভব। শুনিয়াছি এইরূপ একটা বিবাহেই তাঁহার দশ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। দেশের দুর্দশায় সত্যই তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, দেশের জন্য তিনি অনেক করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল, তাই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বালক বালিকা সকলেরই শিক্ষার সুব্যবস্থায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আবার মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; সেজন্য বাংলা ভাষাকে তিনি নূতনরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন ; নানা বিষয়ের বই লিখিয়া ভাষা-শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষার প্রাথমিক পদ্ধতির জন্য বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি এই তিনটি ভাষার এ-দেশীয় শিক্ষার্থীমাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী। কলিকাতার মেট্রোপলিটান (বর্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতুলনীয় কীর্তি।

১২৪৮ সালে তিনি ৫০ টাকা মাহিনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন ; ইহাই তাঁহার প্রথম চাকুরি। তারপর তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদ হন, কিন্তু সেক্রেটারির সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় তিনি সে চাকুরি পরিত্যাগ করেন। পুনরায় তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কিছুদিন কার্য করিয়াছিলেন, বেতন হইয়াছিল ৮০ টাকা। পরে ৫০০ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। কয়েক বৎসর এক সঙ্গে ইনস্পেক্টরের কার্য করার জন্য তিনি আরও পাঁচশত টাকা পাইতেন। কিন্তু এত টাকার প্রলোভনও তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। এই চির-স্বাধীন, তেজস্বী, পুরুষ-সিংহ কিছুকাল পরে চিরদিনের মত চাকুরি ত্যাগ করেন।

তাঁহার পোশাক ছিল পরনে মোটা থান ধুতি, গায়ে একখানা মোটা সাদা উডানি.

আর পায়ে তালতলার চটি। এই পোশাকেই তিনি সর্বত্র যাতায়াত করিতেন। বিদ্যাসাগরের চটির যেখানে অসম্মান হইত তিনি আর কখনও তাহার ত্রিসীমানা মাড়াইতেন না। দেশের প্রধান রাজপুরুষেরাও তাঁহার সে বেশের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিতে পারিতেন না। তাঁহার তেজস্বিতার একটা গল্প বলি।

একদিন তিনি প্রিন্সিপাল কার সাহেবের[১০] সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। সাহেব চুরুট মুখে দিয়া স-পাদুকা পদদ্বয় চৌপায়ার উপর তুলিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিলেন। ব্যাপারটি বিদ্যাসাগরের মনে রহিল। একদিন কার সাহেব কি কাজে পড়িয়া বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর আর চুরুট কোথায় পাইবেন, তিনি তাড়াতাড়ি সাহেবের সম্মুখে চটি-পরিহিত চরণ দুইটি চৌপায়ায় তুলিয়া দিয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন। সাহেব এজন্য ভারি চটিয়াছিলেন ; কিন্তু উপরওয়ালারা বিদ্যাসাগরের নিকট সমস্ত শুনিয়া কোন উচ্চবাক্য করেন নাই। কলিকাতায় পড়িবার কালেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীর নাম দিনময়ী দেবী।[১১]

গত ১২৯৭ সালের ১০ শ্রাবণ[১২] রাত্রি দুই ঘটিকা আট মিনিটের সময় বাংলাকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া এই আদর্শ বাঙালি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কবে এই মহাপুরুষের সাধনা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর জীবনে সত্য হইয়া উঠিবে?

কেশবচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বীজ মিশিয়া আছে। তাই যুগে যুগে এ দেশে সংস্কারকের দল আবির্ভূত হইয়াছেন। ইউরোপের জলবায়ুর সঙ্গে ভারতবর্ষের জলবায়ুর এইখানেই প্রভেদ। পার্থিব উন্নতির পতাকা হাতে লইয়া ইউরোপে কর্মীর পর কর্মী জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ এই পার্থিব উন্নতির আহ্বানটাকে বরাবরই উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এদেশের যাঁহারা শক্তিমান পুরুষ, এই পৃথিবীর সুখদুঃখ, হাসিকান্নার স্রোত তাঁহাদের মনে জোয়ার জাগাইয়াছে ভগবানের আহ্বান—আধ্যাত্মিক জীবনের অপার্থিব আনন্দ। কেশবচন্দ্রের জীবন এই ধর্মের আহ্বানেই সাড়া দিয়াছিল। মানুষের আত্মিক উন্নতিকল্পেই তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ইংরেজি ১৮৩৮ অব্দের ১৯ নভেম্বর কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেই সেন পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তখন সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পিতামহ রামকমল সেনের[১] উৎসাহ, বুদ্ধি ও পরিশ্রমে একদিকে সাংসারিক উন্নতি যেমন কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে আবার তেমনি তাঁহার সৎস্বভাব, ধর্মনিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তিতে সেন-সংসার পুণ্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

রামকমল গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। দান-ধ্যান, অতিথি-সৎকার, দরিদ্র-সেবা ত তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য ছিলই ; উপরন্তু নাম-গানে, হরি-সংকীর্তনেও তাঁহার গৃহ সর্বদা মুখরিত থাকিত। এই আবেষ্টনের ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়া কেশবচন্দ্র শৈশব হইতেই ধর্মানুরাগী হইয়া উঠেন। উত্তর জীবনে এই ধর্মানুরাগই তাঁহাকে নতুন পথে লইয়া গিয়াছিল এবং ব্রাহ্মধর্মের ভিতর নবজীবনের প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই। কেশবচন্দ্রের পিতার নাম ছিল প্যারীমোহন সেন।[২] তাঁহার পিতার ভিতরেও পিতামহের মতই ধর্মভাব প্রবল ছিল এবং তাঁহার মাতাও নানা সদ্গুণের আধার, আদর্শ রমণী ছিলেন। সুতরাং বাড়ির আবহাওয়া যে তাঁহার ধর্ম-জীবনের বিকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। আড়াই বৎসরের শিশু কেশবচন্দ্রের কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার পিতামহ রামকমল সেন বলিয়াছিলেন—"এই শিশু আমার বংশের গৌরব হইবে। ইহার জন্মে আমার কুল উজ্জ্বল ও বংশ পবিত্র ও ধন্য হইয়াছে।" তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী যে ব্যর্থ হয় নাই, কেশবচন্দ্রের উত্তর জীবনের ভিতর দিয়াই তাহার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই কেশবচন্দ্রের প্রকৃতিতে চাঞ্চল্য ছিল না। যে বয়সে ছেলেরা খেলাধূলা ছাড়া আর কিছু করে না, সে বয়সেও তাঁহাকে চুপ করিয়া এক স্থানে গম্ভীরভাবে

বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। অনেকে এই জন্যই মনে করিতেন তাঁহার বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ হইবে না ; চল্‌তি কথায় যাহাকে হাঁদারাম বলে, বড় হইলেও তিনি সেই হাঁদারামই থাকিয়া যাইবেন। তাঁহাদের এ ধারণা পরবর্তীকালে যে মিথ্যা হইয়াছিল, আজ আর তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার আবশ্যক হয় না।

এই শিশু-বয়সেই কেশবচন্দ্রের যে গুণটি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, তাহা তাঁহার নির্ভীকতা। ভয় কাহাকে বলে তাহা যেন তিনি জানিতেনই না। কেহ কোন বিষয় লইয়া ভয় দেখাইলে সেই জিনিসটার জন্যই তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া যাইত। এই সাহস তাঁহার জীবনকে চিরদিন সত্যের পথে ধরিয়া রাখিয়াছিল। যে সব খেলা-সঙ্গী তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা তাঁহার আধিপত্য স্বীকার না করিয়া পারে নাই। কেশবচন্দ্র পাড়ার ছেলেদের সর্দার ছিলেন। কিন্তু সর্দার হইলেও তাঁহার দ্বারা কখনও কাহারও অন্যায় সাধিত হয় নাই। বাড়ির কর্তাদের অনুকরণে ছেলেদের লইয়া তিনি সংকীর্তনেব দল গঠন করিয়াছিলেন। তাহারা কপালে চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া, 'হরি হরি' বলিয়া গান ও নৃত্য করিত। কেশবচন্দ্র তাহাদিগকে গুরুজনের কথা শুনিতে, পশুপক্ষী সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে, ভগবানকে ডাকিতে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে জীবনের প্রভাতেই তিনি সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় এখন যেখানে এলবার্ট হল[৩] স্থাপিত হইয়াছে, সেইখানে একটি ছোট রকমের পাঠশালা ছিল। এই পাঠশালাতে কেশবচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। পড়াশুনায় কেশবচন্দ্রের মনোযোগের অভাব ছিল না। সুতরাং গুরুমহাশয় অল্পদিন পরেই তাঁহাকে 'সর্দার পড়ো' করিয়া দিলেন। কিন্তু, এখানে অধিক দিন থাকা তাঁহার চলিল না। ইংরেজি শিখিবার জন্য তিনি শীঘ্রই হিন্দু স্কুলে ভরতি হইলেন। এখানেও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কৃতিত্ব ছাত্র এবং শিক্ষক সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

কেশবচন্দ্র ছাত্র হিসাবে অসাধারণ কোনো প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান আশাতিরিক্ত হইলেও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার মাথা একেবারেই খেলিত না। সুতরাং তাঁহাকে কলেজ ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু কলেজ ছাড়িলেও পড়াশুনা বা জ্ঞান-চর্চা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। নিভৃতে অনন্যমনে দুরূহ ও জটিল গ্রন্থসমূহ লইয়া তিনি জ্ঞানালোচনার ভিতর ডুবিয়া গেলেন। ইহার ফলে বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা ও চিন্তার ধারার সহিত তাঁহার পরিচয় যেমন একান্ত সহজ হইয়া উঠিল, তেমনি তাঁহার নিজের চিন্তাশীলতাও অসাধারণ বাড়িয়া গেল।

ভগবানের প্রতি অনুরাগ কেশবচন্দ্রের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া ছিল। তাই বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের কাছে আত্মনিবেদনের আকুলতাও তাঁহার বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই আত্মনিবেদনের আকুলতা হইতেই প্রার্থনার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা নূতন পথ ধরিয়া বহিতে শুরু করিল। তিনি সকলের কাছে তাঁহার প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পাছে অশিক্ষিত লোক তাঁহার কথা বুঝিতে না পারে, এই নিমিত্ত ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলুটোলায় একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই বিদ্যালয়ে পাড়ার ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সকলকেই লেখাপড়া শিখানো হইত এবং তাহাদিগকে নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইত।

কিন্তু কেশবচন্দ্রের মনে সত্য পথ সম্বন্ধে যে দ্বিধা জাগিয়াছিল তাহা সহজে দূরীভূত হইল না। পাদরি ব্যারন সাহেবের কাছে তিনি বাইবেল পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাঝে মাঝে 'ও লর্ড' বলিয়া তাঁহাকে ইংরেজিতে উপাসনা করিতেও শোনা যাইত। অনেকে মনে করিলেন এইবার কেশবচন্দ্র বুঝি খ্রিস্টান হইয়া যান। কিন্তু বাইবেল প্রভৃতি পড়ার ফলে ঈশ্বর নিরাকার এ ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইলেও তিনি খ্রিস্টান ধর্ম ত গ্রহণ করিলেনই না, বরং হিন্দু ধর্মের বাহিবের আড়ম্বরগুলি ছাঁটিয়া ফেলিয়া হিন্দু ধর্মের গোড়াকার তথ্যটাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময় কলুটোলার নিজ বাটীতে তিনি 'গুডউইল ফ্রেটারনিটি'[৪] নাম দিয়া ধর্মালোচনা করিবার জন্য একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভায় এবং পরে যখন হিন্দু কলেজ থিয়েটার-গৃহে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'[৫] নামে একটি সাহিত্য ও বিজ্ঞান-সভা স্থাপিত হইল, তখন তাহাতে বক্তৃতা করিয়াই তিনি তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মিতার অদ্ভুত শক্তি অর্জন করেন। বক্তা হিসাবে তাঁহার মত খ্যাতিলাভ ভারতবর্ষের অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা পড়িয়াই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট হন। ইহার পর ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহার সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। কেশবচন্দ্রের চরিত্র, জ্ঞান, ধর্মবুদ্ধি ও বক্তৃতা-শক্তি মহর্ষির মনে সহজেই রেখাপাত করিল। তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সময় কেশবচন্দ্রের আত্মীয়-পরিজন ভীত হইয়া কুলগুরুর নিকট হইতে তাঁহাকে মন্ত্র গ্রহণ করাইবার জন্য একবার চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্র পীড়নের আশঙ্কা করিয়া সমস্ত দিন দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে পলাইয়া থাকিলেন এবং রাত্রিতে বাড়ি ফিরিয়া মাতার দ্বারা গুরুর নিকট কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠাইয়া তাঁহাকে জানাইলেন—তিনি এই গ্রন্থোক্ত ধর্মেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং অন্য মন্ত্র লইতে পারিবেন না। গুরু গ্রন্থগুলি পড়িয়া কহিলেন, "এ ধর্ম ত উৎকৃষ্ট ধর্ম। হিন্দুধর্মের সার-সংগ্রহ। কিন্তু পালন করা ভারী কঠিন।" ইহার পর ইং ১৮৫৭ অব্দের শেষভাগে তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে যথারীতি দীক্ষিত হন।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার প্রতি লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন বড় অল্প হয় নাই। নিকট আত্মীয়েরাও তাঁহাকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার সংকল্প টলে নাই। পীড়ন ও লাঞ্ছনা তিনি হাসি মুখে সহ্য করিয়াছেন।

এই লাঞ্ছনার ভিতর দিয়াই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হইয়া উঠে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ এপ্রিল যুবকদিগকে ধর্মশিক্ষা দানের জন্য সর্বপ্রথম ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে মহর্ষি বাংলাতে এবং কেশবচন্দ্র ইংরেজিতে ধর্মবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ভার গ্রহণ করেন। হিন্দু যুবকদের ভিতরে খ্রিস্টান হইবার

যে ঢেউ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের শিক্ষা সেই ঢেউটার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বস্তুত কেশবচন্দ্রই তখনকার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক হইলেও তাঁহার সময় উহা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রই উহাকে শিক্ষিত সমাজের গ্রহণীয় করেন। তাঁহার পূর্বে এখনকার মত ব্রাহ্ম বলিয়া কোন পৃথক সম্প্রদায় ছিল না। যাঁহারা উক্ত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমাজের ভিতর থাকিয়াই এবং হিন্দুধর্ম মতে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিয়াই সপ্তাহে একদিন ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন। ব্রাহ্ম বলিয়া এখন যে পৃথক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, তাহা কেশবচন্দ্রেরই সৃষ্টি। তিনি ব্রাহ্মধর্মের জন্য কতকগুলি কড়াকড়ি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন। ব্রহ্মচর্য পালন, নিরামিষ আহার, মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ, পরিচ্ছদে বিলাসবর্জন—এগুলি ব্রাহ্ম ধর্মের বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত হইল।

বাড়ির লোকের পীড়াপীড়িতে কেশবচন্দ্রকে ইং ১৮৫৯ অব্দে একটি চাকুরি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের চাকুরি, বেতন ৩০ টাকা। এই চাকুরিতেও তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরওয়ালারা তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া অল্পদিনের ভিতরেই তাঁহার বেতন বাড়াইয়া দেন এবং ভবিষ্যতে অধিক উন্নতিরও আশা দেন। কিন্তু ধর্ম যাঁহাকে ডাকিয়াছে, কর্মস্থলের প্রলোভন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি চাকুরি ছাড়িয়া দিলেন।[৬] এই চাকুরির সময়েই তিনি একখানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহার নাম—"হে বঙ্গীয় যুবকগণ, ইহা তোমাদেরই জন্য।" এই পুস্তক তৎকালীন যুবকদের ভিতর যথেষ্ট আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

ইহার পর মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। দিন ধার্য হইল। কেশবচন্দ্র স্থির করিলেন, পত্নীসহ সেদিন তিনি ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া আচার্য পদ গ্রহণ করিবেন; এবং সে কথা আত্মীয়স্বজনকে জানাইতেও তিনি দ্বিধা বোধ করিলেন না। কিন্তু ইহাতে এক নূতন বিভ্রাটের সৃষ্টি হইল। যাত্রার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, বাড়িব কর্তাব হুকুম-মত সদর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আত্মীয়স্বজনেরাও চারিদিক হইতে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া তাঁহাদের বহির্গমনে বাধা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না। পত্নীকে[৭] ডাকিয়া কহিলেন—"এই আমাদের শক্তি-পরীক্ষার সময়। তুমি হয় সকল বাধা পদদলিত করিয়া আমার অনুগমন কর, নতুবা আমাকে ছাড়িয়া ইঁহাদের সঙ্গেই বাস কর। আমাকে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করে এমন কেহই নাই।" ইহার পর তিনি দৃঢ়পদে অর্গল খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যসত্যই কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। পত্নীও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ১৮৬২ অব্দের ১৬ এপ্রিল দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে[৮] অভিষিক্ত করেন।

ইহার পর হইতে কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিবারের সকলের সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমে কিছুদিন দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আশ্রয় লন ;—তাহার পর কলুটোলায় একটি ছোট বাড়িতে উঠিয়া আসেন। এই বাড়িতে তিনি যখন অত্যন্ত অসুস্থ

হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার পরিবারের লোকেরা তাঁহাকে আবার গৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু বাড়িতে ফিরিয়াও তিনি ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। এই বৈষ্ণবের বাড়িতেও তিনি পুত্রের জাতকর্ম ব্রাহ্মধর্মের নিয়ম অনুসারেই সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্র সমগ্র ভারত, এমন কি বিলাত পর্যন্ত, ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা এত হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যাইত। ব্রাহ্মধর্মের ভক্তের সংখ্যা তাঁহার সময়েই সর্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। গভর্নর জেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সর্ব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাঁহাকে সম্মান করিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বাগ্মিতাও বহুলোককে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়াছিল। এই বাগ্মিতার জোরেই তিনি ইংল্যান্ডেও অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মহাপণ্ডিত মোক্ষমূলর,[৯] জন স্টুয়ার্ট মিল,[১০] নিউম্যান,[১১] গ্লাডস্টোন,[১২] ডিন স্টানলী[১৩] প্রভৃতি ইংল্যান্ডের বিরাট পুরুষেরাও তাঁহাকে অন্তরের প্রীতি ও আনন্দ দিয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়াও[১৪] তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। মহারাণী কেশবচন্দ্রকে তাঁহার নিজের একখানি চিত্রপট ও স্বামীর দুইখানি জীবনী উপহার দিয়াছিলেন।

ইংল্যান্ডে কেশবচন্দ্র ধর্মবিষয়ে ত বক্তৃতা দিয়াছিলেনই, তাহা ছাড়া ইংরেজদের মদ্য ব্যবসায়ের দোষ দেখাইয়া ও ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসনের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াও তিনি বক্তৃতা দেন। ইংল্যান্ডে কেশবচন্দ্র যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, আর কোন বাঙালির ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। কেশবচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনের পর বিলাতে একটি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিনি যে সেখানে কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যায়

কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ আচার-পদ্ধতি লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের মতভেদ হওয়ায় তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ইহারই ফলে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে এক নূতন সমাজ স্থাপিত হয়। কিন্তু যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, এইখানেই তাহার শেষ হয় নাই। কুচবিহারের মহারাজার[১৫] সহিত তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার[১৬] বিবাহ প্রদান প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া আরও কতকগুলি মতভেদের সৃষ্টি হওয়াতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারিল না। ইহার পরেই নূতন লোকেরা 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামে একটি স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কেশবচন্দ্রও তাঁহার সমাজের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নাম তুলিয়া দিয়া নূতন নাম রাখিলেন 'নববিধান সমাজ।'

লোকহিতকর বহু ব্যাপারের সহিত কেশবচন্দ্রের অন্তরের সুগভীর যোগ ছিল। তিনি মদ্যপান প্রথা রহিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন, প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সভা সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নারী শিক্ষার জন্যও তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ ছিল। ভিক্টোরিয়া কলেজ[১৭] তাঁহারই উদ্যম ও অধ্যবসায়ে

প্রতিষ্ঠিত। তিনি 'ভারত সংস্কার সভা'[১৮] প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুলভ সাহিত্য-বিভাগ, স্ত্রীবিদ্যালয় বিভাগ, দাতব্য বিভাগ, শ্রমজীবীদের শিক্ষা বিভাগ এবং সুরাপান নিবারণী বিভাগ এই পাঁচভাগে সভার কার্যধারাকে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এ সভা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। কেশবচন্দ্র নীতিধর্ম সম্বন্ধে ছোট ছোট গ্রন্থ লিখিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। তখনকার উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে তাহাতে সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল।

১৮৮৩ অব্দের ৮ জানুয়ারি বহুমূত্ররোগে কেশবচন্দ্রের ধর্মময় ও কর্মময় জীবনের অবসান হয়। কিন্তু এ মৃত্যু তাঁহার লৌকিক মৃত্যু মাত্র। কাজের ভিতর দিয়াই তিনি অমর হইয়া আছেন। কেশবচন্দ্র সমাজের বহুবিধ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাংলাদেশ তাঁহার একটি উপকার কখন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। শিক্ষিত হিন্দু সমাজ তখনকার দিনে খ্রিস্টধর্মের দিকে যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুসমাজের আশঙ্কার কারণ অল্প ছিল না। তিনি খ্রিস্টধর্মের এই প্রভাব হইতে দেশকে মুক্ত করিয়াছিলেন। খ্রিস্টান পাদরিদের সহিত তাঁহার জীবনে বহুবার বহুক্ষেত্রে সংঘর্ষ উপস্থাপিত হইয়াছিল। যুক্তি এবং তর্কে তিনি তাহাদিগকে প্রতিবারই পরাজিত করিয়া তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুদের মন হইতে খ্রিস্টান হইবার মোহ মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। শিক্ষিত-সমাজের ধর্মান্তর গ্রহণের আগ্রহ তাঁহার প্রভাব ও সংস্কারের ফলেই বন্ধ হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র নূতন ধর্মের প্রবর্তন করিলেও হিন্দু সমাজ এই জন্য চিরদিন তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন পূর্বে বাংলাভাষার অবস্থা শোচনীয় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ভাষার একটি উন্নত ধারার সৃষ্টি করেন; প্যারীচাঁদ মিত্র[১] ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর আর একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই দুইটি ধারাকে একত্র স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই দুইটি ধারাকে একত্র মিলাইয়া বাংলা ভাষাকে যিনি তটশালিনী, ঝঙ্কারময়ী, বেগবতী স্রোতস্বিনীতে রূপান্তরিত করেন—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র বলিলে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেই বুঝায়। সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয় না, এই সাহিত্য-সাধক তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা হইলেও বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র, তাহার পালক ও পোষক বঙ্কিমচন্দ্র, তাহাকে ষড়ৈশ্বর্যে সাজাইয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এক কথায় বঙ্কিমচন্দ্রই বর্তমান বঙ্গের সাহিত্যগুরু, মন্ত্রগুরু।

১২৪৫ সালের ১৩ আষাঢ় গঙ্গাতীরবর্তী কাঁটালপাড়ায় তাঁর জন্ম হয়[২]। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[৩] যাদবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ[৪] যাজপুরে চাকুরি করিতেন। তথায় অবস্থানকালে আঠারো বৎসর বয়সে সাংঘাতিক পীড়ায় যাদবচন্দ্র মৃত প্রায় হইলে আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া বৈতরণী-তীরে লইয়া যান। সেখানে এক সন্ন্যাসীর কৃপায় তিনি রোগমুক্ত হন—পুনর্জীবন লাভ করেন[৫]। বঙ্কিমচন্দ্রের যখন জন্ম হয়, তখন এই সন্ন্যাসী আসিয়া শাঁখ বাজাইয়া শিশুর মঙ্গল সূচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

পাঁচ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। কাঁটালপাড়ার রামজয় সরকার গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়[৬] দুই বৎসর শিক্ষালাভের পর ১২৫২ সালে সাত বৎসর বয়সে তিনি মেদিনীপুরে ইংরেজি স্কুলে ভরতি হইয়াছিলেন[৭]। তাঁহার পিতা তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। যাদবচন্দ্র ২৪ পরগনায় বদলি হইলে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে প্রবিষ্ট হন। বঙ্কিমের বয়স তখন এগারো বৎসর। যাদবচন্দ্র সেই বয়সেই বঙ্কিমের বিবাহ দিয়াছিলেন; ৮/৯ বৎসর পরে সে স্ত্রীর[৮] মৃত্যু হইলে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়[৯] দারপরিগ্রহ করেন।

কলেজে পড়িবার কালে পাঠ্য-পুস্তকের পড়া শেষ করিয়া তিনি কলেজ লাইব্রেরি হইতে গোপনে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পড়িতেন। ফলে নানা বিষয়ে তাঁহার এতই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল যে, পরীক্ষাকালে অধ্যাপকগণ তাঁহার উত্তর লিখিবার ধারা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেন। তখনও এনট্রান্স, এল.এ., বি.এ. পরীক্ষার চলন হয় নাই, পরীক্ষার মধ্যে

ছিল জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারশিপ। বঙ্কিম অতি অল্প বয়সেই বেশ কৃতিত্বের সহিত সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের[১০] তখন খুব নাম। তাঁহার সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'[১১] ও 'সাধুরঞ্জনের'[১২] তখন প্রতিপত্তি কত। কাগজ বাহির হইলে কে আগে লইবে তাহার জন্য কলিকাতার বড়লোকদের ভিতর একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। কত রাজা-মহারাজার জুড়ি তাঁহার ছাপাখানার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র,[১৩] কৃষ্ণনগর কলেজেব ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী,[১৪] সে কাগজের লেখক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবির কাগজে কবিতা[১৫] লিখিতে আরম্ভ করেন।

হুগলি কলেজ হইতে বাহির হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। সে বাংলা ১২৬২ সালের কথা। সেই বৎসরই বাংলা দেশে বি.এ. পরীক্ষার প্রথা প্রবর্তিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আইন পড়া ছাড়িয়া বি.এ. পড়িতে লাগিলেন এবং মাত্র দুই মাসের মধ্যেই উচ্চ প্রশংসার সহিত বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।এই পরীক্ষায় তাঁহার সতীর্থ ছিলেন যদুনাথ বসু।[১৬] বাংলার লাট হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমের কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। ডেপুটিগিরি চাকুরি সেকালে একটি পরম গৌরবের বিষয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। এইখানেই স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিমের বয়স তখন কুড়ি বৎসর।

যশোহরে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি বদলির জন্য চেষ্টা করিলেন ; সরকার তাঁহাকে কাঁথিতে স্থানান্তরিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁথিতে অবস্থান কালে[১৭] দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে তিনি খুলনায় এবং খুলনা হইতে ২৪ পরগনার বারুইপুরে বদলি হন। এইখানে অবস্থান সময়ে তাঁহার সর্বপ্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়। ইহার পর তিনি কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী লেখেন। এই সময় তিনি বাংলা গভর্নমেন্টের সেক্রেটেরিয়েটে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির[১৮] পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এ চাকুরি বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, মেকলে সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদেই ফিরিয়া যান এবং কয়েক স্থানে কার্য করার পর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন, সুবিচারক ছিলেন, তিনি রায়বাহাদুর[১৯] হইয়াছিলেন, সি. আই. ই.[২০] হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত তেমন বেশি কথা নহে। সর্বপেক্ষা বড় কথা তাঁহার মনীষা, সাহিত্যে তাঁহার অপূর্ব দান। তাঁহার উপন্যাসসমূহ,[২১] তাঁহার ধর্মতত্ত্ব,[২২] তাঁহার গীতাব্যাখ্যা, তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ,[২৩] তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তর[২৪] বাংলার বহুমূল্য সম্পদ। তিনি শুধু নিজে লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের[২৫] মধ্যস্থতায় তিনি অনেক লেখক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সত্যই তিনি সম্রাটের আসনে সমাসীন ছিলেন। সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা তিনি 'বন্দেমাতরমে'র স্রষ্টা ছিলেন, ঋষি ছিলেন, মন্ত্রদাতা ছিলেন। আর কিছু না লিখিয়া

তিনি যদি ঐ 'বন্দেমাতরম্'[২৬] গানটি মাত্র লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিত।

১৩৩০ সালের ২৬ চৈত্র বঙ্গজননীর এই অমর সন্তান মরজগৎ পরিত্যাগ[২৭] করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত থাকিবে।

কৃষ্ণদাস পাল

কলিকাতা কাঁসারিপাড়ায় ঈশ্বরচন্দ্র পাল নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি জাতিতে তিলি ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেকালের আর দশজন মধ্যবিত্ত লোকের মত সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। তিলি জাতি তখন এবং এখনও ব্যবসায় বাণিজ্যেই নিযুক্ত থাকিতেন। পরের দাসত্ব করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের পূর্বে মোটেই ছিলনা ; এখন কোনো কোনো পরিবারে দাসত্ব বা পরের চাকুরির স্পৃহা দেখা যাইতেছে। তখন তিলি জাতীয় ব্যক্তিরা কেহ কেহ বা বড় রকমের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন; যাঁহার অধিক মূলধন না থাকিত, তিনিও সামান্য মূলধন লইয়া ছোট-খাটো ব্যবসায় আরম্ভ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র পালও এই রকম সামান্য মূলধন লইয়া একটি দোকান খোলেন।

কিন্তু তাঁহার মূলধন অর্থ হিসাবে সামান্য হইলেও আর এক দিকে অসীম ছিল—ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান মূলধন ছিল তাঁহার সাধুতা। তিনি সামান্য দোকানদার ছিলেন বটে, কিন্তু অসামান্য ধর্মপরায়ণতা, সাধুতা ও বিনয়-নম্রতা তাঁহাকে আর একদিকে ধনী করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই পুরস্কারস্বরূপ তিনি এমন পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহার নাম এখনও বাঙালি ভুলিতে পারে নাই। তিনি অসামান্য প্রতিভাশালী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর।

ঈশ্বরচন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রথম পুত্র অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পর ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দ্বিতীয় পুত্রই কৃষ্ণদাস। ঈশ্বরচন্দ্র পাল মহাশয়ের আর কোনো সন্তান হয় নাই।

পিতামাতার স্নেহ ও আদরে একমাত্র পুত্র কৃষ্ণদাস বাল্যকালে কোনো অভাবই অনুভব করেন নাই; গরিব গৃহস্থ ঘরের ছেলে যে ভাবে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, কৃষ্ণদাসও সেইভাবেই বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার যথারীতি হাতেখড়ি হয়। সামান্য দোকানদারের শিক্ষার জন্য সে সময়ে যে ব্যবস্থা ছিল, কৃষ্ণদাসের জন্যও সেই ব্যবস্থা হইয়াছিল ; ঈশ্বরচন্দ্র মনেও করেন নাই যে, তাঁহার পুত্রকে তিনি উচ্চ-শিক্ষিত করিবেন। পাঠশালায় পড়িয়া, হাতের লেখা ভাল করিয়া, হিসাবপত্রে

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কৃষ্ণদাসও পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করিবেন, ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল ; ইহার অধিক কিছু তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তদনুসারে তিনি কৃষ্ণদাসকে পাড়ার একটি পাঠশালায় শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করেন।

কৃষ্ণদাসের মত মেধাবী বালক এই পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া দেড় বৎসরের মধ্যেই গুরুমহাশয়ের সমস্ত বিদ্যা অধিগত করিয়া ফেলেন। তাঁহার এমন স্মরণশক্তি ছিল এবং তিনি পাঠে এমন অভিনিবিষ্ট হইতেন যে, পড়িবার সময় তিনি এমন একমনে পাঠাভ্যাস করিতেন যে, সে সময়ে কেহ তাঁহাকে ডাকিলে বা কোনো কথা বলিলে তাহা তাঁহার কর্ণে পৌঁছিত না। এমনই অধ্যবসায় এবং একাগ্রচিত্তে তিনি পাঠাভ্যাস করিতেন যে, তাঁহার পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন তাঁহার এই একাগ্রতা ও তন্ময়তা দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিতেন। সেই সময়েই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে এই বালক একজন মানুষের মত মানুষ হইবে। এমন মেধাবী, এমন একাগ্রচিত্ত, এমন জ্ঞানপিপাসু বালক যে দেড় বৎসরের মধ্যেই পাঠশালার সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইবে, তাহা আশ্চর্য নহে।

ঈশ্বরচন্দ্র পূর্বে মনে করিয়াছিলেন, এই পাঠশালার বিদ্যাই তাঁহার পুত্রের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, বালকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বিশেষ বলবান্, তখন তাহাকে অন্য উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করাই তিনি কর্তব্য মনে করিলেন।

সে সময় এখনকার মত পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যালয় ছিল না। তখন 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'[১] ই প্রধান বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয় কাঁসারিপাড়া হইতে দূরেও ছিল না। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিকে সে সময় লোকে গৌরমোহন আড্ডির[২] স্কুল বলিত; এখনও অনেকে ঐ বিদ্যালয়কে উক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ধনী ও বিদ্যোৎসাহী গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিদ্যালয়ে ছোট বালকদিগের শিক্ষার জন্য একটু উন্নত ধরনের একটা পাঠশালাও ছিল। কৃষ্ণদাসকে প্রথমে সেই পাঠশালায় ভরতি করিয়া দেওয়া হয়। তখন কৃষ্ণদাসের বয়স সাত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস এই পাঠশালায় তিন বৎসর পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু এই তিন বৎসরেই তিনি পাঠশালার সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। স্কুলের শিক্ষকগণ এই মেধাবী বালকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অধ্যবসায় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহার, তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার আগ্রহ, তাঁহার জ্ঞানানুরাগ তাঁহাকে বিদ্যালয়ে সকলের প্রিয় করিয়াছিল। অত বড় স্কুলের মধ্যে নিম্ন পাঠশালার ছাত্র কৃষ্ণদাসকে সকলেই চিনিত, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। কৃষ্ণদাস প্রত্যেক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। তাহার ফলে এই পাঠশালার শেষ পরীক্ষায় কৃষ্ণদাস বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় একটি পদক পাইলেন। সে সময় এই পদক লাভ সৌভাগ্য বলিয়া লোকে মনে করিত।

এই পাঠশালার পাঠ যখন শেষ হইল, তখন কৃষ্ণদাসের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পুত্রকে নিজের দোকানের কাজে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। গরিব দোকানদারের ছেলের পক্ষে আর অধিক লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিলেন না।

বিশেষত, তাঁহার মত দরিদ্র লোকের ছেলে যতটা লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট এবং তাহাতেই সে সেই অল্প বয়সেই পিতার দোকানের কাজ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে। অধিক বেতন এবং বহুমূল্য পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া দিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না।

কৃষ্ণদাস যখন শুনিলেন যে, এইখানেই তাঁহার পাঠসমাপ্তি, তখন বালকের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিল তাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা সেই দশ বৎসরের বালক কর্তব্য মনে করিল না। বিশেষত, বালক হইলেও কৃষ্ণদাস তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থার কথা বুঝিতেন ; তাঁহার উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা যে তাঁহার দরিদ্র পিতার পক্ষে কষ্টকর, তাহাও তিনি জানিতেন। সুতরাং পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা কৃষ্ণদাস সঙ্গত মনে করিলেন না।

তাঁহার বিদ্যালয়-ত্যাগের কথা যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষগণ জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণদাসের পিতাকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন কৃষ্ণদাসকে এই অল্প বয়সেই কার্যে লিপ্ত না করেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণদাসকে বিনা বেতনে স্কুলে পড়াইতে স্বীকৃত হইলেন এবং দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মেধাবী বালকের পুস্তকাদি কিনিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণদাসের আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে দশ বৎসর বয়সে ইংরেজি শিক্ষালাভ করিবার জন্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ইংরেজি বিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং প্রাণপণে ইংরেজি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার বাংলা ভাষা শিক্ষার সুযোগ হইল না; পাঠশালার যতটুকু বাংলা শিখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র সম্বল হইল। অবশ্য পরে তিনি বাংলা ভাষারও চর্চা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাল ইংরেজি শিখিবার উপরই তাঁহার বেশি ঝোঁক পড়িয়াছিল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে হইতে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। এই পাঁচ বৎসরে তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন, অন্য বালকের পক্ষে দশ বৎসরেও ততদূর শিখিবার সম্ভাবনা ছিল না; তাঁহার একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ই তাঁহাকে এতদূর শিক্ষিত করিয়ছিল।

পাঁচ বৎসর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর কৃষ্ণদাস স্কুলের পড়া ত্যাগ করেন এবং খ্রিস্টান মিশনারি মিল্‌নি সাহেবের গৃহে গমন করিয়া ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে এখানে শিক্ষালাভও তাঁহার হইয়া উঠিল না, কারণ মিশনারি সাহেব সর্বদাই কৃষ্ণদাসকে খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দু দেবদেবীর নিন্দা করিতেন। ধর্মপ্রাণ কৃষ্ণদাসের ইহা অসহ্য হওয়ায় তিনি মিলনি সাহেবের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

তৎপরে তিনি ডভ্‌টন কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড মর্গান[১] সাহেবের নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। কৃষ্ণদাস পরে বলিতেন যে, মর্গান সাহেবের সাহচর্য লাভ না করিলে তিনি এত লেখাপড়া শিখিতে পারিতেন না। মর্গান সাহেব তাঁহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন এবং যাহাতে তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ কৃষ্ণদাস এ কথা সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন।

প্রায় দুই বৎসর মর্গান সাহেবের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কৃষ্ণদাস সেই সময়ে এ দেশের বড়লোকদিগের স্থাপিত 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে'[৪] প্রবিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার প্রবেশের দুই বৎসর পরে প্রসিদ্ধ সিপাহি বিদ্রোহের[৫] পূর্বে এই কলেজটি উঠিয়া গেল, কৃষ্ণদাসের কলেজে পড়াও শেষ হইল। কিন্তু তিনি তখনও পাঠে অবহেলা করিলেন না ; ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি[৬] হইতে নানা বিষয়ের পুস্তকাদি আনিয়া ঘরে বসিয়া পড়িতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনি কয়েকটি বন্ধু লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত করিলেন। এই সমিতিতে নানা বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হইত। ইহার ফলে তিনি ভাল ইংরেজি লিখিতে ও বলিতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে এই সভার এমন উন্নতি হইল যে, তৎকালীন প্রসিদ্ধ বক্তা সুপণ্ডিত মিঃ কার্কপ্যাট্রিক[৭] ও সুবিখ্যাত পণ্ডিত মিঃ কাওয়েল[৮] পর্যন্ত এই সমিতিতে উপস্থিত হইয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা দিতেন এবং প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। ১৮৫৬ অব্দের ১ জুন সুপ্রসিদ্ধ হেয়ার সাহেবের মৃত্যুদিন যে সভা হয়, সেই সভায় কৃষ্ণদাস 'ইয়ং বেঙ্গল' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৪২ অব্দে হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হয়। তাহার পর প্রতি বৎসরই উক্ত মহাত্মার স্মৃতি-সভা হইয়াছে, বক্তৃতাও হইয়াছে ; কিন্তু, ১৮৫৬ অব্দের স্মৃতি-সভায় কৃষ্ণদাস যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ উপলক্ষে সংবাদপত্রে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস বলিয়াছিলেন যে, সর্ব বিষয়ে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িতেছেন, সামাজিক আচার-ব্যবহারে ঘোর অনাচারী হইতেছেন। সেই সময় সাহেবদিগের পরিচালিত 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'র[৯] যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সেই পত্রিকার সম্পাদক মিঃ মেরিডিথ টাউনসেন্ড কৃষ্ণদাসকে অযথা গালি দিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন। কৃষ্ণদাস এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিলেন না, প্রতিবাদ করিলেন তাঁহার অধ্যাপক কাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন[১০]। এই সময় হইতেই কৃষ্ণদাসের নাম শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

কৃষ্ণদাস লেখাপড়া যথেষ্ট করিলেন, শিক্ষিত সমাজে খ্যাতিও লাভ করিলেন, কিন্তু তখনও অর্থোপার্জন হয় নাই। পিতার অবস্থা এমন ভাল নহে যে, তিনি ঘরে বসিয়া সাহিত্য চর্চা করিলে ভরণ পোষণ চলিয়া যাইবে, সুতরাং কৃষ্ণদাসকে চাকুরির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। এত লেখাপড়া শিখিয়া সামান্য দোকানদারি করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। এই সময় (১৮৫৭ অব্দে) আলিপুর জজ আদালতে অনুবাদকের পদ খালি হওয়ায় তিনি ঐ কার্য পাইলেন; কিন্তু অধিক দিন এই চাকুরিতে থাকিতে পারিলেন না।

কলিকাতায় সেই সময়ে বড় বড় জমিদার ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একটি সভা ছিল; তাহার নাম 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'।[১১] সে সভা* এখনও আছে ; এবং তাহা এ দেশের জমিদার ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মুখপাত্র বলিয়া এখনও সম্মান লাভ করিয়া

---

* বর্তমানে লুপ্ত।

থাকে। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা দিগম্বর মিত্র,[১২] প্রসন্নকুমার ঠাকুর[১৩] প্রভৃতি বড় বড় জমিদারগণের চেষ্টায় কৃষ্ণদাস এই সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। এই কার্য তিনি এমন যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, কিছু দিন পরে তিনি ৩৫০্ টাকা বেতনে উক্ত সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। সেই সময় জমিদারগণের পক্ষ হইতে তিনি যে সকল পত্রাদি লিখিতেন এবং অভিমত প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রগাঢ় রাজনীতি-জ্ঞান এবং ভাষায় অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশেষে এমন অবস্থা হইল যে, কৃষ্ণদাসই 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের'র সর্বেসর্বা, বলিতে গেলে, কর্ণধার হইয়া উঠিলেন। ইহা সাধারণ গৌরবের বিষয় নহে।

১৮৫৮ অব্দে কুড়ি বৎসর বয়সে কৃষ্ণদাস 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে' কার্য গ্রহণ করেন। তাহার পর তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণদাসের উপর তৎকালের বাঙালি-পরিচালিত সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়টের'র[১৪] সম্পাদন ভার ন্যস্ত করিলেন। প্রসিদ্ধ দেশ-হিতৈষী মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়[১৫] মহাশয় এই 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার সম্পাদকতায় 'প্যাট্রিয়ট' তখন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনমান্য সংবাদপত্র হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় উহা ক্রয় করেন এবং প্রসিদ্ধ লেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থাতেও উহা ভালরূপে না চলায় কালীপ্রসন্ন[১৬] সিংহ মহাশয় কাগজের সমস্ত ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণদাসকেই সর্বাংশে উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং কিছুদিন পরে এই পত্রিকাখানি একপ্রকার কৃষ্ণদাসেরই হইয়া যায়। এই পত্রিকাখানি হইতে কৃষ্ণদাস বৎসরে অনেক টাকা আয় করিতেন।

কৃষ্ণদাস পালের নাম তখন দেশবিখ্যাত হইল। সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত। ১৮৭২ অব্দে কৃষ্ণদাস বঙ্গের ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন এবং ১৮৮৩ অব্দে তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ইতঃপূর্বেই ১৮৭৭ অব্দে কৃষ্ণদাস 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন এবং পরবর্তী বৎসরে তিনি সি-আই-ই উপাধি ভূষিত হন।

কৃষ্ণদাসের মহত্ত্ব ও অমায়িকতা সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে ; তাহার মধ্যে একটি গল্প বলিয়াই এই মহাত্মার জীবনকথা শেষ করিব।

একদিন কৃষ্ণদাস তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া কার্য করিতেছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সামান্য একখানি আট-হাতি মলিন বস্ত্র পরিধান বাহিরের প্রাঙ্গণের ঘাস পরিষ্কার করিতেছিলেন ; এমন সময় একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কৃষ্ণদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অশ্বারোহণে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং বাহিরের প্রাঙ্গণে বৃদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্রকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া তাঁহাকে ভৃত্য মনে করিয়া আদেশ করিলেন, 'ঘোড়া পাক্ড়াও'।

এই কথা গৃহমধ্য হইতে শুনিবামাত্র কৃষ্ণদাস তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "সাহেব, উনি আমার পিতৃদেব। আপনার ঘোড়ার লাগাম আমি ধরিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া সাহেব বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন এবং কৃষ্ণদাস ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে এরূপ গল্প আছে। কৃষ্ণদাসের পরলোক-গমনের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কলিকাতা হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিটের সঙ্গমস্থলে তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসীগণ তাঁহার একটি মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর তাঁহার পরলোকগমনের দিবসে একটি স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়া থাকে।

হাজি মহম্মদ মহ্‌সীন

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে গঙ্গাতীরবর্তী হুগলি নগরী ব্যবসায় ও বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র এবং শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। সেই সূত্রে দেশ হইতে নানা শ্রেণির বণিকগণ আসিয়া এখানে বাস করিতেন। এইরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষ করিয়াই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আগা ফয়জুল্লা নামক জনৈক পারস্যদেশীয় সম্ভ্রান্ত বণিক হুগলিতে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। আগা ফয়জুল্লার পুত্র হাজি ফয়জুল্লাও পিতার সঙ্গে হুগলিতে আসিয়াছিলেন। এবং পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কারবারে সাহায্য করিতেন। ক্রমে কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে অত্যল্প কালের মধ্যেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া হাজি ফয়জুল্লা একজন ধনশালী বণিকরূপে সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

এই সময়ে ভারতের তদানীন্তন সম্রাট বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের দরবারে আগা মতাহর নামে পারস্য দেশের অন্য একজন সম্ভ্রান্ত বণিক কর্ম করিতেন। চরিত্রগুণে তিনি সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং তাঁহার তুষ্টিসাধন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যশোহর, খুলনা প্রভৃতি বঙ্গদেশের কয়েকটি ভাল ভাল স্থান জায়গির প্রাপ্ত হন। অতঃপর দরবারের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি হুগলিতে আসিয়া উপনীত হন এবং সেইখানে ঘরবাড়ি করিয়া বাস করিতে থাকেন। এইরূপে তিনিও এদেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

আগা মতাহরের একটি মাত্র কন্যা ছিল—তাঁহার নাম মন্নুজান। এই মন্নুজান ভিন্ন মতাহরের ার কোন সন্তান ছিল না। যথাকালে আগা মতাহরের মৃত্যু হইলে এই মন্নুজানই তাঁহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইলেন। স্বামীর মৃত্যুতে আগা মতাহরের পত্নীও আর কন্যার ঐশ্বর্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

হাজি ফয়জুল্লাকে পতিত্বে বরণ করিয়া তিনি ভিন্ন সংসার পাতিয়া বসিলেন। ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে ইঁহাদের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রই কালে হাজি মহম্মদ মহম্মদ মহ্‌সীন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

ঐশ্বর্যশালী জনক জননীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মহ্‌সীন শৈশব হইতেই সুখ-বিলাসের মধ্যে বর্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, সুখ-বিলাসের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল না। পরবর্তীকালে মহ্‌সীনের জীবনে যে ভোগের প্রতি অনাসক্তি, পরোপকারস্পৃহা, দয়া, ধর্মভাব, জ্ঞান-পিপাসা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, অতি শৈশবেই তাহার অঙ্কুর তাঁহার জীবনে এবং প্রতি কার্যে দেখা গিয়াছিল।

বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত বয়স সমাগত হইলে মহ্‌সীনের শিক্ষার ভার সিরাজী নামে জনৈক শিক্ষকের উপর অর্পিত হয়। সিরাজী যেমন অসামান্য পণ্ডিত, তেমনি চরিত্রবান এবং সাংসারিক সর্ববিষয়ে বহুদর্শী ছিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মহ্‌সীনের কাছে সর্বদাই তিন তাঁহার এই সকল ভ্রমণকাহিনির কথা বলিতেন। দেশ বিদেশের সেই সকল গল্প শুনিয়া মহ্‌সীনের মনেও বাল্যকাল হইতেই দেশভ্রমণের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে।

সিরাজীর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মহ্সীন মুর্শিদাবাদ গমন করেন এবং তথাকার মক্তবে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তৎকালে মুর্শিদাবাদের এই মক্তবই মুসলমান বিদ্যার্থীদের উচ্চতম শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। যথাসময়ে এখানকার পাঠও তিনি শেষ করিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার জ্ঞানপিপাসার পরিতৃপ্তি হইল না। আরও অধিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার আকাঙক্ষা তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিল। অনতিকাল পরেই মহ্‌সীন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থান ও আরব, পারস্য, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি বহুদেশে ভ্রমণ করেন। আরবি এবং পারসি ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। সর্বস্থানের লোকের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানচর্চার সঙ্গেসঙ্গে নানাবিধ ব্যায়াম করিয়া মহ্‌সীন শরীরকেও অত্যন্ত সুস্থ এবং সবল করিয়া তুলিয়ছিলেন। দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানলাভ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ; সংসারধর্ম পালন বা ভোগবিলাসের কামনা তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্রও ছিল না।

আগা মতাহরের কন্যা মন্নুজান এবং হাজি ফয়জুল্লার পুত্র মহম্মদ মহ্‌সীন বিভিন্ন পিতার সন্তান হইলেও একই মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে একটি আন্তরিক প্রীতির বন্ধন ছিল। মন্নুজান মহ্‌সীন অপেক্ষা আট বৎসরের বড় ছিলেন এবং তিনিও শৈশবে মহ্‌সীনের শিক্ষাগুরু সিরাজীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অতিশয় বিদুষী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী রমণীরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মন্নুজান পিতার অমিত ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

সুতরাং রূপগুণ, বিদ্যাবুদ্ধি, অতুল বিভব—সব দিক দিয়া এমন গুণশালিনী রমণীকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য বহু যুবক ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আগা মতাহর মৃত্যুর পূর্বে মন্নুজানকে তাঁহার এই ইচ্ছা ও আদেশ জানাইয়া গিয়াছিলেন যে, মন্নুজান যেন পারস্য দেশবাসী তাঁহার ভাগিনেয় সলাউদ্দিনের পাণিগ্রহণ করেন। পিতার এই অভিলাষ অবগত হইবার পর হইতে সলাউদ্দিনকেই তিনি মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পাণিপ্রার্থী প্রত্যেক যুবককেই তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। এইরূপে স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায় তাহারা সকলে একযোগে মন্নুজানের শত্রু হইয়া দাঁড়ায় এবং নানা প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট সাধন এমন কি প্রাণসংহার পর্যন্ত করিতে প্রয়াস পায়। মহ্‌সীন তখন গৃহে থাকিয়া সিরাজীর নিকট অধ্যয়ন করিতেন। ঘটনাক্রমে তিনি দুষ্টগণের চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া ভগিনীকে সতর্ক করিয়া দেন। এইরূপে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়।

অতঃপর সলাউদ্দিন পারস্যদেশে হইতে হুগলিতে আসিয়া মন্নুজানের পাণিগ্রহণ করেন এবং পত্নীর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তাহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মহ্‌সীনও শিক্ষালাভের জন্য বঙ্গদেশে ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই মন্নুজান বিধবা হন এবং স্বামীশোকে কাতর হইয়া পড়েন। বিষয়সম্পত্তি, ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি মন্নুজানের কোনোদিনই বিশেষ আসক্তি ছিল না ; বিশেষত স্বামীর মৃত্যুর পর এ দিকে তাঁহার আর কোনো আকর্ষণই রহিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইল মহ্‌সীনের উপর বিষয়-সম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন। কিন্তু মহ্‌সীন যে তখন কোথায় ছিলেন, তাহা জানিতে না পারায় তাঁহার প্রতীক্ষায় তিনি বহু বৎসর কাটাইলেন।

অবশেষে মন্নুজান যখন বৃদ্ধা হইয়া পড়িলেন এবং বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা রহিল না, সেই সময় অনেক কষ্ট ও অনুসন্ধানে মহ্‌সীনের খোঁজ পাওয়া গেল। মন্নুজান নিজের শরীরের অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া আসিতে বার বার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। ভগিনীর কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া মহ্‌সীন গৃহে ফিরিলেন। মন্নুজান তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত বিষয়বিভবের উত্তরাধিকার প্রদান করিয়া ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

সহসা ভগিনীর এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া মহ্‌সীনের মনে কোনো প্রকার প্রলোভন আসিল না। সংসারে ও তাঁহার আর কোনো বন্ধন ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁহার বিশাল ভূসম্পত্তি দীনদুঃখীর সেবা এবং মানবসমাজের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করিবেন স্থির করিয়া নিজের জীবনও দেশের হিতে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

নানা প্রকারে মহ্‌সীন দীনদুঃখীর সেবা করিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। কোরানের অনেক ভাল ভাল শ্লোক কাগজে নিজ হস্তে লিখিয়া তিনি ভিক্ষুকগণকে বিতরণ করিতেন। বহু ভিক্ষুক ঐ কাগজ বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত। প্রতিদিন

রাত্রে নিয়মিত ভাবে নগরীর পথে পথে ভ্রমণ করা তাঁহার আর একটি অভ্যাস ছিল। এইরূপ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিনি গোপনে লোকের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইতেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতেন। রোগী, দুঃখী যখন যেখানে দেখিয়াছেন, তখনই তাহাদের কাছে যাইয়া, তিনি মধুর বচনে এবং সাহায্য দ্বারা তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিয়াছেন। এইরূপে কত লোকের যে কত উপকার তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাই। তাঁহার এই দান সেবার ব্যাপারে তিনি হিন্দু, মুসলমান, ইতর, ভদ্র ভেদ করেন নাই। যেখানেই দান এবং সেবালাভের যোগ্য পাত্র দেখিতে পাইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার অকৃপণ হস্ত অকুণ্ঠিত ভাবে দান করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই দানের সংবাদ তিনি ঘুণাক্ষরেও কাহাকে জানিতে দিতেন না ; কারণ দুঃখীর দুঃখ-মোচনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—পৃথিবীতে যশঃ বা নাম ক্রয় করার অভিলাষ তাঁহার ছিল না। ধর্মের ঢাক আপনি বাজিয়া উঠে। তাই মহ্‌সীনের এই মহৎ কার্যের কথাও গোপন রহিল না। তাঁহার এই উদারতা গুণে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল এবং তাঁহার বিশেষ অনুগত হইয়া উঠিল।

দয়া, পরোপকার ভিন্ন আরও নানা গুণে মহ্‌সীনের হৃদয় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। দাসদাসী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই তিনি অতিশয় মধুর ও সদয় ব্যবহার করিতেন। কোনো কারণেই কখন কাহার উপরে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইতেন না বা কর্কশ ব্যবহার করিতেন না। মুসলমান হইলেও মহ্‌সীন হিন্দুদের শাস্ত্রের প্রতি কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই ; সকল শাস্ত্রের বাণীই তিনি অমূল্য বলিয়া মনে করিতেন।

নিজে পরম পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মহ্‌সীন শিক্ষার মূল্য বুঝিতেন। দেশের লোক যাহাতে শিক্ষিত হইয়া দেশের উন্নতি সাধন করিতে পারে, এজন্য তিনি হুগলিতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকেই সেই বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভের জন্য পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। এতদ্‌ভিন্ন ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসার উন্নতির জন্যও তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়া মুসলমান ছাত্রগণের শিক্ষালাভের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে ইংরেজি ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে এক উইল করিয়া তিনি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি সমস্তই ধর্মকার্যের জন্য উৎসর্গ করিয়া দেন।

উইলের পর মহ্‌সীন মাত্র ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে এই পরোপকারী, দাতা এবং দয়ার অবতার মহ্‌সীন সংসারের সকলকে কাঁদাইয়া পরলোকগমন করেন।

মহ্‌সীনের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ না থাকায় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, বন্দোবস্ত প্রভৃতি সকল ভার গভর্নমেন্টের হাতে গিয়া পড়িল। এই অর্থের যাহাতে সদ্‌ব্যবহার হয়, গভর্নমেন্ট তাহা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই অর্থেই হুগলিতে প্রকাণ্ড বাটী ক্রয় করিয়া ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজেই অধুনা হুগলি কলেজ নামে প্রসিদ্ধ।

মন্নুজানের পিতা আগা মতাহর হুগলিতে একটি ইমামবাড়ি প্রতিষ্ঠা করিয়া

গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সলাউদ্দিন এই ইমামবাড়ির কিঞ্চিৎ উন্নতি বিধান করেন। কিন্তু সংস্কার অভাবে তাহা প্রায় ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ইমামবাড়ি যাহাতে বঙ্গদেশের মধ্যে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে সুপরিচিত হয়, তাহাই মহ্সীনের একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা তিনি তাঁহার জীবনকালে কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। অবশেষে হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বহু অর্থব্যয়ে ইমামবাড়ির সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আরম্ভ হয় এবং ইং ১৮৬১ অব্দে সেই অট্টালিকার সংস্কার কার্য শেষ হয়।

এই ইমামবাড়ি নানাভাগে বিভক্ত। ইহার কোথাও ভজনালয়, কোথাও অতিথিশালা, কোথাও মুসাফিরখানা, কোথাও বা আতুরাশ্রম স্থাপিত হইয়া দেশবিদেশের কত লোকের ধর্মোপাসনা, আহার, আশ্রয় এবং পরিচর্যা লাভের যে সুবিধা করিয়া দিয়াছে, তাহা বলিয়া বা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এমন সুদৃশ্য, সুন্দর এবং কারুকার্যখচিত সুবৃহৎ অট্টালিকা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। হুগলির ইমামবাড়ি নামে এই অট্টালিকা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত হুগলির সুবৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাসপাতাল তাঁরই অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশবাসীর অসীম উপকার সাধন করিতেছে।

হাজি মহম্মদ মহ্সীন কেবলমাত্র মুসলমান সমাজের নহেন, সমগ্র বঙ্গদেশের পরম গৌরবের স্থল। সামান্য মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নানা গুণের বিকাশে তিনি মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং আজও সমগ্র মানবসমাজের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও পূজার অর্ঘ্য লাভ করিতেছেন। তাঁহার এই অসীম যশ, অক্ষয় কীর্তি ও অমর নাম দেশের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন উনচল্লিশটি বৎসরের সমষ্টিমাত্র। এই ক্ষুদ্র জীবনকালে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, শত বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি তাহা করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার জীবন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের মত। অন্ধকার ঘেরা ভারতের এক প্রান্তে অকস্মাৎ তাঁহার বিকাশ হইয়াছিল; তারপর অভিনব দীপ্তিতে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।

বিবেকানন্দের পিতার নাম ছিল বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ছিল ভুবনেশ্বরী। ইহারা উভয়েই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন; কিন্তু দীর্ঘদিন পুত্র না হওয়ায় তাঁহাদের মনে শান্তি ছিল না। পুত্রের জন্য ভুবনেশ্বরী অনেক দেবতার নিকট আরাধনা করেন। অবশেষে কাশীতে বিশ্বেশ্বরের কাছে মনের কামনা যখন জানাইয়া আসিলেন, তাহার পরেই ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দের জন্ম হয়। এই জন্যই মাতা পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বীরেশ্বর। কিন্তু তাঁহার আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ।

পুত্রের সম্বন্ধে পিতা অতিমাত্রায় উদার ছিলেন। কখনও নরেন্দ্রনাথকে তিনি তিরস্কার বা শাসন করিতেন না। ফলে, জীবনের প্রথমেই স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করেন। এই স্বাধীনতাই তাঁহার মনকে নূতন ভাবে নূতন রূপে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দান করিয়াছিল।

বিবেকানন্দের বাল্যের ধুলা খেলার ভিতরেও অসাধারণত্বের ছাপ ছিল। ছেলেদের লইয়া তিনি চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিয়া খেলা করিতেন। সেই শিশু বয়সেও ধ্যানের খেলা খেলিতে খেলিতে তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। একবার একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। ছাতে যেখানে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীদের লইয়া খেলা খেলিতেছিলেন, সেইখানে আকস্মাৎ একটি সাপের আবির্ভাব হয়। সঙ্গী বালকেরা সাপ দেখিয়া যে যার মত চিৎকার করিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ পলাইলেন না—তখন তিনি ধ্যানে তন্ময়। বাড়ির লোক চিৎকার শুনিয়া ছাতে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহা অপূর্ব। নরেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থের মত বসিয়া আছে এবং সাপটি তাঁহার মাথার উপর ফণা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকের সমাগম হইতেই সাপটি ফণা গুটাইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। এই ঘটনার পর আত্মীয়-স্বজনের আর সন্দেহ রহিল না যে, এই বালক উত্তর জীবনে একজন মহাপুরুষ হইবেন।

নরেন্দ্রনাথের পড়াশুনার দিকেও অসাধারণ ঝোঁক ছিল। শিক্ষক পড়া বলিয়া দিতেন; পাছে অন্য কোন বিষয়ে মন যায়, তাই তিনি চোখ বুজিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। শিক্ষকের কথাগুলি একেবারে তাঁহার হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথিয়া

যাইত। পেটের পীড়ায় দুই বৎসর কাল ভুগিয়াও তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কিন্তু পড়াশুনার দিকে ঝোঁক থাকিলেও নরেন্দ্রনাথ দেহটাকে উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার শরীর রীতিমত শক্তিশালী ছিল। সঙ্গীতবিদ্যাও তিনি ভাল রকমই শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলেজে পড়ার সময় ছাত্রদের সভাসমিতিতে বক্তৃতা করার ফলে বক্তৃতা দিবার ক্ষমতাও তাঁহার ভিতর অদ্ভুতভাবে বিকাশ লাভ করে। নরেন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও সাহস যে কত বেশি ছিল, একটি ব্যাপারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

হার্বার্ট স্পেন্সারের[১] নাম সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নরেন্দ্র তখন এফ-এ ক্লাসের ছাত্র মাত্র। সেই বয়সেই তিনি স্পেন্সারের মত বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতকেও তাঁহার একটি নূতন মতের প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে স্পেন্সার সাহেব মুগ্ধ হইয়া যান। তিনি নরেন্দ্রকে সত্যনির্ণয়ের জন্য উৎসাহ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

এই সময়েই ধর্মের দিকে নরেন্দ্রের মন আকৃষ্ট হয়। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আরম্ভ করেন; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম তাঁহার মনের ক্ষুধা মিটাইতে পারিল না। ইংরেজি দর্শনশাস্ত্র পড়িতে পড়িতে তিনি ক্রমেই নাস্তিক হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের[২] সহিত নরেন্দ্রনাথের পরিচয় হইল। পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে দেখিয়াই বলিলেন—'এ ত নিত্যসিদ্ধ পুরুষ'। পরমহংসদেব প্রথমে কিন্তু নরেন্দ্রকে আকর্ষণ করিতে পারিলেন না।

নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন ২১ বৎসর। তিনি জেনারেল এসেমব্লী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ অ্যাটর্নি ছিলেন। তিনি পুত্রকে আইনের কলেজে ভরতি করিয়া দিলেন। কিন্তু এবার পড়াশুনা নরেন্দ্রনাথকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তখন তাঁহার মন পাগল হইয়া উঠিল। তিনি হঠাৎ একদিন পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা আপনি ত অনেক কথা বলেন ; আপনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?"

রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"হাঁ দেখিয়াছি, তুই যেমন আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছিস্ তোকে যেমন আমি দেখিতেছি, তেমনি তাঁকেও আমি দেখিতে পাই। কেবল যে আমিই তাঁকে দেখিতে পাই তাহা নহে, তোকেও দেখাইতে পারি।" শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এত বড় স্পর্ধার কথা ইতিপূর্বে আর কেহ তাঁহাকে বলিতে পারে নাই।

এই সময় তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাস যাঁহাকে টানিয়াছে, ঘরে তাঁহার মন বসিতে পারে না। নরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিলেন না। কিছুদিন পরে পিতার মৃত্যু হইল; তিনিও আইনবিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণের নিকট চলিয়া গেলেন।

পরমহংসদেবের পাদমূলে বসিয়াই নরেন্দ্রনাথের সাধনা আরম্ভ হয়। রামকৃষ্ণ নিজে

ধর্মের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন, শিষ্যকে তিনি দান করিলেন—কর্মের পথ। 'আপনার মুক্তি অপেক্ষা জগতের কল্যাণ শ্রেষ্ঠ কার্য। একটি মাত্র জীবের কল্যাণের জন্য যদি বারংবার কুক্কুর হইয়া জন্মিতে হয়—আমি তাহাতেই রাজি"—রামকৃষ্ণের এই বাণীই বিবেকানন্দের জীবনের তপস্যা ছিল। তিনি জনহিতে আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। গুরু কর্মত্যাগ করিয়াছিলেন, শিষ্যের দেহত্যাগ পর্যন্ত কর্মের বিরাম ছিল না।

পরমহংসদেবের নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিতেন। দীপ্ত চক্ষু, দিব্যশ্রী এবং গৈরিক বসনে তাঁহাকে অপূর্ব দেখাইত। গুরুর দেহাবসানের পর তিনি ভারতভ্রমণে বাহির হন। ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান স্থানই তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময় ভারতের অনেকগুলি করদ ও মিত্ররাজ্যের রাজাদের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হয়। আলোয়ারের রাজার[৩] সঙ্গে পরিচয় একটু বিচিত্র। এইজন্য এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি যখন আলোয়ারে উপস্থিত হইলেন, তখন ইংরেজি-জানা সন্ন্যাসী বলিয়া চারিদিকে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য আলোয়ারের রাজার কৌতূহল হইল। তিনি বিবেকানন্দের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন—"শুনিয়াছি আপনি খুব বিদ্বান লোক—আপনি অর্থ উপার্জন না করিয়া ভিক্ষা করেন কেন?" বিবেকানন্দ দেখিলেন আচার-ব্যবহারে এই রাজাটি পুরা মাত্রায় বিদেশী। তিনি যে সাহেবসুবার সঙ্গে শিকার করিয়া বেড়ান, সে সংবাদও স্বামীজি লইয়াছিলেন। তাই তিনি বলিলেন—"আপনি রাজকার্য না দেখিয়া কেবল শিকার করিয়া বেড়ান কেন?" উত্তর শুনিয়া রাজা একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন; পরে উত্তর দিলেন—"আমার ভাল লাগে, তাই শিকার করি।" স্বামীজি উত্তর দিলেন—"আমারও ভাল লাগে, তাই ভিক্ষা করি।" তারপর নানা কথা হইল। রাজা কহিলেন, মূর্তি-পূজায় তাঁহার আস্থা নাই। ইট কাঠ পাথরকে পূজা করিয়া কোন লাভ নাই।

এই কথার পর দেওয়াল হইতে রাজার একখানা ফটো নামাইয়া আনিয়া স্বামীজি রাজার পারিষদবর্গকে সেই ছবির উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে অনুরোধ যখন প্রতিপালিত হইল না, তখন রাজাকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন—"মহারাজ! এটা আপনার ছবি, আপনি নহেন ; তবু ইহার গায়ে কেহ যে থুথু ফেলিতে সম্মত হইল না, তাহার কারণ এটাকে কেহই সামান্য এক টুকরা কাগজ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। আপনার এই আলেখ্যকে সকলে আপনার প্রতিমূর্তি বলিয়াই শ্রদ্ধা করিতেছে। হিন্দুরাও যখন মূর্তিপূজা করে, তখন ইট, কাঠ, পাথরের পূজা করে না, তাহারা পূজা করে তাহাদের ইষ্ট দেবতার। দেবতার গুণের এক একটি আদর্শ লইয়া এই মূর্তিগুলি পরিকল্পিত।" স্বামীজির উত্তর শুনিয়া মহারাজ বলিলেন—"আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আমার চোখ খুলিয়া দিলেন।"

এই পরিভ্রমণের সময়েই রাজপুতনার খেতরি রাজ্যের রাজা[৪] তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের সাহস যে কি বিপুল ছিল, তাহার পরিচয় কন্যাকুমারীতে পাওয়া যায়। তাঁহার হাতে অর্থ ছিল না। তাই খেয়ার পয়সা না দিতে পারিয়া তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমুদ্রের খাড়ি পার হইয়া মন্দিরে পৌঁছিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ জীবনে কখন বিপদকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বলিতেন, বিপদকে ভয় করিলেই বিপদ পাইয়া বসে। কিন্তু সাহস করিয়া যে বিপদের সম্মুখে দাঁড়ায়, বিপদ তাহার পদানত হইতে দ্বিধা করে না। এই সময়েই সিঙ্গুরাভেল্লু মুধলিয়রের[৫*] সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় হয়। মুধলিয়র মাদ্রাজের কোন এক কলেজের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। এই খ্রিস্টান পণ্ডিতটির মনে মনে পাণ্ডিত্যের অত্যন্ত গর্ব ছিল; তাই তিনি বিবেকানন্দের সহিত তর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তর্কে বিবেকানন্দকে আঁটিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে ইংরেজি মাসিক-পত্র প্রকাশিত করিয়া স্বামীজির প্রচার-কার্যের সহায় হইয়াছিলেন। মাদ্রাজে বিবেকানন্দের আরও বহু শিষ্য জুটিয়াছিল। সেতুবন্ধ রামেশ্বরের রাজা ভাস্করসেতুও স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এই সময়ে আমেরিকার চিকাগো সহরে "সর্ব-ধর্ম মহাসভা" নামে এক সভার আয়োজন চলিতেছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ধর্মাচার্যগণ সেখানে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। বিবেকানন্দের ভক্তেরা তাঁহাকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে সেখানে পাঠাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। বিবেকানন্দ অস্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু পাথেয় যাত্রাপথের দারুণ অন্তরায় হইয়া উঠিল। অবশেষে এক অদ্ভুত উপায়ে এ সম্বন্ধে সকল ভাবনার শেষ হইয়া গেল।

খেতরির রাজার কোন সন্তান ছিল না। তিনি বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে স্বামীজি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন—'মহারাজ, আপনার পুত্র হইবে'। এ ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইল। নবকুমারকে আশীর্বাদ করিবার জন্য রাজা গুরুকে স্বীয় রাজ্যে আহ্বান করিলেন। আমেরিকা-যাত্রার অর্থ সংগ্রহের জন্য বিবেকানন্দ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। গুরুর এই ব্যস্ততার সংবাদ অবগত হইয়া শিষ্য তাঁহার আমেরিকা-গমনের ব্যয়ভার বহন করিয়া গুরুদেবকে সমস্ত দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্তি দিলেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে বিবেকানন্দ মাদ্রাজ হইতে আমেরিকা যাত্রা করেন। কিন্তু আমেরিকায় পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, যে কার্যভার লইয়া তিনি যেখানে গমন করিয়াছিলেন, তাহা সাধন সহজ নহে। যে কেহ ধর্মসভায় যে বক্তৃতা করিবেন, তাহার উপায় নাই। কেবল তাঁহারাই সেখানে বক্তৃতা করিতে পারিবেন, যাঁহারা কোন ধর্মসমাজ হইতে প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছেন। স্বামীজি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। স্থান সম্পূর্ণ অপরিচিত; বিশেষত তাঁহার অদ্ভুত বেশভূষা সেখানকার লোকদের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিয়া বরং উপহাসের ও কৌতূহলের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। তিনি পথেঘাটে নানা রকমের লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন।

মুদালিয়র পি. সিঙ্গারভেলু এই নামে বেশি পরিচিত।

এই সময়ে বোস্টন শহরে অপ্রত্যাশিত ভাবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক ভাষার অধ্যাপক মিঃ জে. এইচ. রাইট সাহেবের[৬] সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়া গেল। তিনি বিবেকানন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া চিকাগো শহরের মিঃ বনির[৭] নিকট তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিয়া একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন। যাঁহারা ধর্মসভায় বক্তৃতা করিবেন, মিঃ বনি তাঁহাদের নির্বাচন করিবার কর্তা। সুতরাং এদিক দিয়া আর কোন চিন্তা রহিল না। কিন্তু বিপদ অন্য পথে উপস্থিত হইল। মিঃ রাইট স্বামীজির হাতে মিঃ বনির ঠিকানা লেখা যে কাগজখানি দিয়াছিলেন, তাহা তিনি হারাইয়া ফেলিলেন। চিকাগো সহরে আসিয়া তাই তিনি মিঃ বনির গৃহ সহসা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। পথের লোককে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া পথ ত দেখাইয়া দিলই না—বরং উপহাস ও নানা রকম অত্যাচার করিতে লাগিল। সে রাত্রি তাঁহার স্টেশনে একটি খালি প্যাকিং-বাক্সের ভিতরেই দারুণ শীতে কাটিয়া গেল। পরের দিন আবার মিঃ বনির বাড়ি অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। আবার সেই অত্যাচার, উপহাস। অবশেষে তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া একটি অট্টালিকার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। তিনি বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় অট্টালিকার ভিতর হইতে একটি রমণী বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে ওরূপ ভাবে বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে সমস্ত কথা জানাইলে তিনি নিজে সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে মিঃ বনির বাড়িতে রাখিয়া আসিলেন। এইরূপে ভগবানের অনুগ্রহে স্বামীজির সমস্ত ভাবনার অবসান হইল।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর মহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্বামীজি সকলের শেষে বক্তৃতা দিতে উঠিয়াই প্রথমে বলিলেন—"আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ!" তাঁহার এই একটি সম্বোধনেই সভার সবগুলি হৃদয় জয় করা হইয়া গেল। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের এই অপূর্ব আহ্বান শুনিয়া সহস্র লোক করতালি দিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল।

তারপর তিনি ১৫, ১৯, ২০, ২৬ এবং ২৭ তারিখে সভায় বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক দিনই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জয়ের মাল্য ছিনিয়া লইয়াছিলেন। আমেরিকার লোকেরা বিবেকানন্দের অদ্ভুত বাগ্মিতার জন্য তাঁহার নাম দিয়াছিল—"সাইক্লোনিক হিন্দু।" নিউইয়র্কের কোন সুপ্রসিদ্ধ সাময়িকপত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, "হিন্দুর ন্যায় পণ্ডিত জাতির ভিতর খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক পাঠানো যে অত্যন্ত বোকামির কাজ, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার পর তাহা বেশ বুঝিতেছি।"

আমেরিকার বহু নরনারী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহাদের ভিতর একজনের নাম আমরা সকলেই জানি। ইনি কুমারী মার্গারেট নোবল্ অথবা ভগিনী নিবেদিতা[৮]। গুরুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ইনি স্বদেশ ছাড়িয়া আসিতেও দ্বিধা করেন নাই। আমেরিকা হইতে বিবেকানন্দ ইংল্যান্ডে গমন করিয়াছিলেন। সেখানেও তিনি অসাধারণ সম্মানের সহিত অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মোক্ষমূলার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াই রামকৃষ্ণের জীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের এই সময়কার

বক্তৃতাগুলিই রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে কোনো জাতির পক্ষে এগুলি দুর্লভ সম্পত্তি।

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর আমেরিকা ও ইউরোপে বেদান্তধর্মের মত প্রচার করিয়া ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সঙ্গে কাপ্তেন সেভিয়ার[৯] এবং তাহার পত্নী ও মিঃ গুডউইনও[১০] আগমন করেন। ইঁহারা স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন সেভিয়ারের অর্থেই আলমোড়ার নিকটবর্তী মায়াবতী নামক স্থানে "অদ্বৈত আশ্রম"[১১] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দেশে ফিরিয়া বিবেকানন্দ আবার ভারতবর্ষ ভ্রমণে বাহির হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে লোক-হিতকর কাজেরও সাড়া পড়িয়া গেল। এই সকল কাজের লোক গড়িয়া তুলিবার জন্য বেলুড় ও হিমালয়ে দুইটি মঠ স্থাপিত হইল। বর্তমানের রামকৃষ্ণ মিশন সেই সময়েরই সৃষ্টি। স্বামীজির তখনকার কর্মশক্তি অদ্ভুত ছিল। দেশের দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য তিনি সাহায্যসমিতি স্থাপন করিলেন; প্লেগরোগাক্রান্তদের জন্য সেবাসমিতি স্থাপিত হইল; মাদ্রাজে মঠ গড়িয়া উঠিল; ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারক প্রেরিত হইল; অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যান্ডে, ও লঙ্কায় প্রচার-কার্য আরম্ভ হইয়া গেল। লোকশিক্ষার জন্য 'ব্রহ্মবাদিন্', 'প্রবুদ্ধ ভারত',[১৩] 'উদ্বোধন'[১৪] নামক তিনখানা পত্রিকা প্রকাশিত হইল। বিবেকানন্দ কর্মস্রোতে ভাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু দেহেরও সহ্য করিবার একটা সীমা আছে। এই সীমার দিকে স্বামীজির লক্ষ্য ছিল না; তাই অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িল। ডাক্তারেরা অবশেষে এখানে শরীর সুস্থ হওয়া অসম্ভব দেখিয়া তাঁহাকে আবার ইউরোপ আমেরিকা ঘুরিয়া আসিতে উপদেশ দিলেন। বিবেকানন্দকে লইয়া জাহাজ আবার সমুদ্রে ভাসিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে একটি ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হয়। এবার সেই মহাসভায় তিনি ফরাসি ভাষায় হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য গিয়াছিলেন। কিন্তু কাজ সমানভাবে চলিতে থাকে, তবে স্বাস্থ্য ভাল হইবে কি প্রকারে? বিবেকানন্দের শরীর সারিল না। অবশেষে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দেশে কার্যের চাপে তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য আরও ভাঙিয়া পড়িল—তথাপি তাঁহার কার্যের বিরাম ছিল না।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই বিবেকানন্দের আত্মা দেহমুক্ত হয়। সেদিনও তিনি ছাত্রদিগকে পাণিনি ব্যাকরণ[১৫] ও বেদ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার পর সন্ধ্যার সময় ধ্যানস্থ হন তাঁহার সে ধ্যান আর ভাঙে নাই। সেই ধ্যানস্থ অবস্থাতেই রাত্রি ৯টার সময় তাঁহার অমর আত্মা দেহত্যাগ করিয়া অনন্তে মিলাইয়া গেল। বিবেকানন্দ ৩৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন; কিন্তু তিনি অদ্ভুত মনীষা, অবিচলিত কর্ম ও একাগ্র সাধনার দ্বারা নব্যভারতের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অদম্য কর্মশক্তিই তাঁহাকে ভারতবাসী, শুধু ভারতবাসী কেন, বিশ্ববাসীর নিকট বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাংলা ভাষায় গদ্যসাহিত্য যেমন একেবারে ছিল না, তেমনি পদ্য সাহিত্যের কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। চণ্ডীদাস,[১] কৃত্তিবাস,[২] কাশীদাস[৩] হইতে ভারতচন্দ্র,[৪] ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত সকলেই এই সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন, এবং পদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তবু যেন কিছুর অভাব ছিল; এমন যে সমৃদ্ধ সাহিত্য তাহারও যেন অসম্পূর্ণতা ছিল। বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছিল না। ভারতচন্দ্র নূতন নূতন ছন্দের প্রবর্তন করিয়া ভাব প্রকাশের গণ্ডিকে অনেকটা প্রসারিত করিয়াছিলেন। পদ্মিনীর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়[৫] বাঁধ ভাঙিব ভাঙিব করিয়াও ভাঙিতে পারেন নাই। যিনি সেই গণ্ডি কাটিয়া, সেই বাঁধ ভাঙিয়া, বাংলা কবিতায় উদাত্ত ধ্বনি ও দর্পিত ভঙ্গি দান করিয়াছিলেন, কবিতার স্রোতকে এক বিপুল ক্ষেত্রে আনিয়া প্রসার-বিপুল ও বেগ-দুর্বার করিয়া তুলিয়াছিলেন, তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যশোহরের কপোতাক্ষী (মতান্তরে কপোতাক্ষ) তীরবর্তী সাগরদাঁড়ী তাঁহার জন্মস্থান। পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মাতার নাম জাহ্নবী দাসী। ১২৩০ সালের ১২ মাঘ মধুসূদনের জন্ম হয়। বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা কলিকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের বড় উকিল ছিলেন। তিনি খুব শৌখিন, বিলাসী, কবি, ভাবুক এবং আমোদপ্রমোদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। পুত্র মধুসূদনের চরিত্রেও সেই সমস্ত প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল।

হাতেখড়ির পর মধুসূদন পাঠশালায় গেলেন। গুরুমহাশয় পারসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি পারসি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করিয়া মধুকে শিখাইতেন। বাড়িতে মধুসূদন রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিতেন; এবং যাত্রা, কবি, আগমনি, বিজয়া গান শুনিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন। এইরূপে চারিদিক দিয়া তাঁহার কবিমনের উপকরণ সংগ্রহ হইতে লাগিল। পাঠশালার পড়া ছাড়াইয়া পিতা তাঁহাকে ইংরেজি পড়াইবার জন্য খিদিরপুরে লইয়া আসিলেন এবং সেখানকার ইংরেজি স্কুলে ভরতি করিয়া দিলেন। অতঃপর ইংরেজি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজে ভরতি হন। মধুসূদনের বয়স তখন ১৩ বৎসর।

কলেজে তখন দুইটি বিভাগ ছিল—জুনিয়র ও সিনিয়ার। তিনি জুনিয়ার শ্রেণিতে ভরতি হইয়া ডবল প্রমোশন লইয়া তিন বৎসরের মধ্যে সিনিয়ার শ্রেণির প্রথম বিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন এবং একটা বৃত্তি পরীক্ষায় অপর ছাত্রদিগকে পরাস্ত করিয়া একেবারে প্রথম স্থান অধিকারপূর্বক সেই বৃত্তি লাভ করিলেন। এই সময় তাঁহার কবি হইবার সাধ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। লিখিবার ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু পত্রিকা কোথায়! তিনি

কয়েক জন সঙ্গীর সাহায্যে হাতে-লেখা একখানি কাগজ বাহির করিলেন। সে সময় হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্রের একখানি কাগজ ছিল—'জ্ঞানান্বেষণ'।[৬] মিত্র মহাশয় এই হাতেলেখা পত্রিকায় মধুসূদনের রচনা পাঠে প্রীত হইয়া বাছা বাছা কতকগুলি কবিতা লইয়া 'জ্ঞানান্বেষণে' ছাপিতে আরম্ভ করিলেন। মধুসূদন এইরূপে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তখন কলিকাতায় সাহেবদের বিশেষ প্রতিপত্তি। তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শৌখিন মধুসূদন সাহেব হইবার ঝোঁকে মাতিয়া উঠিলেন। বিলাত যাইব, ইংরেজিতে কবিতা লিখিয়া বড় কবি বলিয়া নাম কিনিব, মেম বিবাহ করিব, ইহাই তখন তাঁহার জীবনের চরম কাম্য হইয়া উঠিল। তাহার ফলে তিনি একদিন পাদরিদের শরণাপন্ন হইয়া খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সাহেব সাজিবার ইচ্ছা খুব প্রবল ছিল, সুতরাং তিনি হিন্দু কলেজ[৭] ছাড়িয়া বিশপ কলেজে[৮] গেলেন এবং সাহেবদের ছাত্রাবাসে থাকিয়া লেখাপড়া ও সাহেবিয়ানা দুই-ই শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এ সময় তাঁহার পিতা তাঁহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন।

লেখাপড়া শেষ হইল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করিতে বলায় মধুসূদন সম্মত হইলেন না, কাজেই পিতা খরচপত্র বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে আত্মীয়স্বজনগণ বিমুখ হইলেন। খ্রিস্টান করিবার সময় যাঁহারা নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, সেই পাদরির দলও সরিয়া পড়িলেন। মধুসূদনের তখন উভয় সঙ্কট! শেষে নিজের পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া এক বন্ধুর পরামর্শে তিনি মাদ্রাজে যান। সেখানে সাহেবের অরফ্যান স্কুলের মাস্টারি ও একখানি পত্রিকার সহকারি সম্পাদকের কাজ লইয়া তিনি জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিলেন। মাদ্রাজে রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস্[৯] নাম্নী এক মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

মাদ্রাজে যাওয়ার এক বৎসর পরে তিনি 'ক্যাপটিভ্ লেডি'[১০] নামে একখানি ইংরেজি কাব্য লিখিয়া প্রকাশ করেন। বই লিখিয়া সুখ্যাতি মিলিল, কিন্তু অর্থাগম হইল না। একে ত ইংরেজ পত্নীকে লইয়া সংসার খরচই চলে না, তাহার উপর ছাপাখানার দেনা; নানা কারণে বিরক্ত হইয়া তিনি পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন। কিছুদিন পরে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহার একটি চাকুরি হয়। সেখানে মাহিনা কিছু বেশি ছিল, এতদ্‌ভিন্ন তিনি 'স্পেকটেটর'[১১] পত্রের বেতনভোগী সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় মধুসূদন হেন্‌রিয়েটা[১২] নাম্নী আর একটি মহিলাকে বিবাহ করেন।

তাঁহার ইংরেজি কাব্যের বিলাতে খুব নাম হইয়াছিল; কাব্যখানি তিনি আরও অনেকের নিকট সমালোচনার জন্য পাঠাইয়া দেন। বিখ্যাত বেথুন সাহেব তাঁহাকে লেখেন, 'মাতৃভাষায় না লিখিলে কোন লেখক প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারেন না'। বেথুনের এই অভিমতে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়। তিনি মাতৃভাষায় লিখিবার জন্য গ্রিক, লাতিন, তেলুগু ও সংস্কৃত ভাষা শিখিতে এবং ঐ সমস্ত ভাষা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন।

মাদ্রাজে যাওয়ার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং সাত বৎসর পরে তাঁহার পিতা স্বর্গারোহণ করেন। তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার পিতার বিষয় জ্ঞাতি-শত্রুরা লুঠিয়া খাইতে লাগিল। অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময় কোন বন্ধুর অনুরোধে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। সে বোধ হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের কথা।

মাইকেল দেশে ফিরিলেন বটে, কিন্তু জ্ঞাতিরা তাঁহাকে সম্পত্তি দখল দিল না। তিনি প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাকের যত্নে পুলিশ আদালতে একটি কেরানিগিরি চাকুরি লাভ করিলেন। কিছুদিন পরে ঐ আদালতেই দোভাষীর কার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি কলিকাতায় থাকিয়া পৈতৃক বিষয় উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র[১৩] ও রাজভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ[১৪] জোড়াসাঁকোর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর[১৫] মহাভারত-অনুবাদক বিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ[১৬] প্রভৃতি মিলিয়া সিংহরাজাদের বেলগেছিয়ার বাগানে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া রত্নাবলী নাটক অভিনয় করেন। নাটক সংস্কৃতে লেখা; সকলে বুঝিতে পারিলেন না। তাই মাইকেলকে দিয়া তাঁহারা রত্নাবলীর একটি ইংরেজি অনুবাদ করাইয়া লন। এই অনুবাদ এত সুন্দর হইয়াছিল যে, প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র আনন্দিত হইয়া মাইকেলকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দান করেন। ইহার পর বাংলা নাটক অভিনয়ের কথা উঠিলে তাঁহারা মধুসূদনকেই নাটক লিখিবার ভার দেন। মাইকেল 'শর্মিষ্ঠা'[১৭] নাটক লিখিয়া দেন। বাংলায় তখন প্রহসন ছিল না, মাইকেল 'একেই কি বলে সভ্যতা'[১৮] ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'[১৯] নামে দুই খানি প্রহসন লিখিয়া বাংলা ভাষায় প্রহসন রচনার সূত্রপাত করিয়া দেন। তাঁহার রচিত অপর নাটক 'পদ্মাবতী'[২০] ও বেলগেছিয়ায় অভিনয়ের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব'[২১] ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এবং তাঁহার অমর কাব্য 'মেঘনাদবধ' ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক',[২২] 'ব্রজাঙ্গনা',[২৩] 'বীরাঙ্গনা'[২৪] তাহার পরের লেখা। এই সমস্ত নাটক ও কাব্য তাঁহাকে বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে মহাকবি রূপে পরিচিত করিয়াছে।

পুস্তকের আয় হইতে তাঁহার সমস্ত দেনা শোধ হইয়া যায়। মোকদ্দমা করিয়া তিনি পিতৃ-সম্পত্তিও ফিরিয়া পান। এই সময়ে তাঁহার একটি ছেলে ও মেয়ে হইয়াছিল, বলিতে গেলে এই সময়ের তাঁহার জীবনে তিনি সমধিক সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু হইলে কি হয় ; আশৈশব বিলাসের কোলে লালিত হইয়া আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাঁহার লোপ পাইয়াছিল। প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল, খরচের হিসাব-নিকাশ নাই, সুতরাং অর্থকষ্ট তাঁহার লাগিয়াই ছিল, তিনি তিলার্ধের জন্যও শান্তি পাইতেন না। সেইজন্য অধিক অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশায় মাইকেল বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসিবার সংকল্প করিলেন। সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব ঘটিল না। বিষয় সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া, পুত্র কন্যা ও স্ত্রীকে এদেশে রাখিয়া, ইংরেজি ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন।

এই বিলাত গমনই তাঁহার কাল হইল। যাঁহার উপর সম্পত্তির ভার দিয়া গিয়াছিলেন, সেই মহাদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। বিলাতে

টাকা পাঠান ত দূরের কথা চট্টোপাধ্যায় মাইকেলের পত্নীকেও একটি পয়সা দিতেন না। ওদিকে বিলাতে যখন মাইকেলের আপাদমস্তক দেনায় ডুবিয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার নিরুপায় পত্নী পুত্রকন্যা লইয়া বিলাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাঁহার নিজের খরচ চলে না, তাঁহার এতগুলি পোষ্য! কিন্তু আর ত ধার পাওয়া যায় না! মাইকেল আবার বিপদে পড়িলেন। শেষে অবস্থা এমনি দাঁড়াইল যে, তাঁহাকে বা জেলে যাইতে হয়। দুর্দশা যখন এমনই চরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই সময় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে সব কথা জানাইয়া চিঠি লেখায় তিনি মাইকেলকে দেড় হাজার টাকা পাঠাইয়া দেন। পরে বিদ্যাসাগর আবার টাকা পাঠাইয়াছিলেন। ইং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মাইকেল ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

কবি দেশে ফিরিলেন, দেশের লোক খুব ঘটা করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। এদিকে কবির দেশে ফিরিবার পূর্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার ব্যারিস্টারির সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়ছিলেন। সুতরাং কবির পসার জমিতে বিলম্ব হইল না। কিছুদিন বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিল। তাহার পর আবার শনির দশা আরম্ভ হইল; ভাগ্য পরিবর্তন হইল। আয় কমিল, খরচ সমানই রহিয়া গেল; শেষে দেনা বাড়িতে বাড়িতে এমন দাঁড়াইল যে, অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। কবি পাওনাদারদের জ্বালায় অস্থির হইয়া মদের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন, দিনরাত্রি মদে ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগলেন। এই সময় তিনি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পড়েন। এই অবস্থাতেও কিছু টাকা পাইয়া তিনি 'বেঙ্গল থিয়েটারকে'[২৫] 'মায়াকানন'[২৬] লিখিয়া দিয়াছিলেন। এদিকে তাঁহার এই পীড়া, ওদিকে তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটাও মরণাপন্না। বন্ধু-বান্ধবেরা হেন্‌রিয়েটাকে তাঁহার মেয়ের বাড়িতে এবং কবিকে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিয়া কর্তব্য শেষ করিলেন। পত্নীর মৃত্যুর তিনদিন পরে ইংরাজি ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন রবিবার বেলা দুইটার সময় ঐ দাতব্য চিকিৎসালয়েই তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। মাইকেলের এই দুর্দশার জন্য তিনি নিজে এবং তাঁহার দেশবাসী কে কতটুকু অপরাধী তাহার বিচার অন্তর্যামী করিবেন। কিন্তু বাঙালির এ কলঙ্ক কখনও ঘুচিবে না যে, তাহাদের কবি দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

মাইকেল শুধু নূতন ছন্দের প্রবর্তক নহেন, বাংলা কাব্য রচনায় তিনি নূতন ভাব ও নূতন ভাষারও প্রবর্তন করিয়াছেন। নাট্যকার এবং প্রহসন রচয়িতা বলিয়াও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। মানুষ যে ইচ্ছা করিলে স্বর্গের দেবতা হইতে পারে, আবার উচ্ছৃঙ্খলতার পথও সুগম করিতে পারে, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন কলিকাতার মলঙ্গা লেনের একটি বাড়িতে বাংলার গর্ব ও গৌরব আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার ছিলেন। বি. এ পাশ করিয়া তিনি ডাক্তারি পড়িতে যান। তখনকার দিনে বি-এ পাশের পক্ষে ভাল চাকুরি মেলা কঠিন ছিল না। কিন্তু চাকুরির পরাধীনতা তাঁহার ধাতে সহিবে না বলিয়াই তিনি চাকুরির চেষ্টা না করিয় ডাক্তারি পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পিতার এই স্বাধীনতার স্পৃহা আশুতোষেও বিদ্যমান ছিল। আশুতোষ জীবনে কখন কাহারও কাছে মস্তক অবনত করেন নাই। মাতা জগত্তারিণী দেবীর* প্রভাবও পুত্রের উপর কম ছিল না। তাঁহার আদর্শও পুত্রকে বহুগুণে গুণান্বিত করিয়া তুলিয়ছিল। তিনি বাজে কথা বলিয়া ছেলের সময় নষ্ট না করিয়া চোখের সম্মুখে ভাল ভাল আদর্শ স্থাপিত করিতেন। তাঁহাকে যে বড় হইতে হইবে, মহৎ হইতে হইবে, জননীর একাগ্রতার ভিতর দিয়াই তাহার ছাপ তাঁহার মনে মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

আশুতোষকে সর্বপ্রথমে চক্রবেড়িয়া শিশু-বিদ্যালয়ে ভরতি করিয়া দেওয়া হয়। দুই বৎসরের ভিতরেই তাঁহার এখানকার শিক্ষা হইয়া গেল, সাধারণ ছাত্রের পক্ষে এ শিক্ষা শেষ করিতে অন্যূন পাঁচ বৎসরের প্রয়োজন হইত। আশুতোষের অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি শিক্ষা-ক্ষেত্রে সর্বত্র এইরূপ অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

চক্রবেড়িয়ার শিশু-বিদ্যালয় ত্যাগের পর আশুতোষ কিছুদিন অন্য কোন বিদ্যালয়ে ভরতি না হইয়া গৃহেই লেখাপড়া শিখিতে থাকেন। গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইল। পিতাও পুত্রকে অবসর সময়ে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তাড়না না করিয়া লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা এবং শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত করিয়া তোলাই ছিল এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, গঙ্গাপ্রসাদের এ উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় সফল হইয়াছিল। বালকের পাঠের অনুরাগ এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, দিবারাত্রি সে পুস্তককে কাছ-ছাড়া করিত না। ইহার ফল আশুতোষের মনের পক্ষে যতই শুভ হউক কেন, তাঁহার দেহের পক্ষে শুভ হইল না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ১২৮১ সালে তাঁহার হৃদ্‌স্পন্দন রোগের সৃষ্টি হইল। শঙ্কিত পিতা পুত্রের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাঁহাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য মথুরায় পাঠাইয়া দিলেন। মথুরার বাতাসে আশুতোষ অতি অল্পকালের মধ্যে রোগমুক্ত হইলেন।

---

* মৃত্যু ১৯১৪

মথুরা হইতে ফিরিবার পথে মোগলসরাই স্টেশনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আশুতোষের পরিচয় হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বালকের কথাবার্তায় এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সেই পথের দেখা তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পরে যখন থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির পুস্তকের দোকানে আবার দুইজনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানা 'রবিন্‌সন্ ক্রুশো'[১] কিনিয়া আশুতোষকে উপহার দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই উপহারের বইখানি এখনও আশুতোষের পুস্তকাগারে শোভা পাইতেছে।

মথুরা হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহাকে ভবানীপুর সাউথ সুবারবন্ স্কুলে ভরতি করিয়া দেওয়া হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী[২] তখন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বাংলার এই মনীষীর কাছে আশুতোষের শিক্ষা আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। শিক্ষক এবং ছাত্র পরস্পর পরস্পরকে লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। পুত্রকে পড়াশুনায় উৎসাহ দিবার জন্য গঙ্গাপ্রসাদ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—ক্লাসে আশুতোষ যতদিন প্রথম থাকিবেন, প্রতিদিন এক টাকা করিয়া এবং যতদিন দ্বিতীয় থাকিবেন প্রতিদিন আট আনা করিয়া পুরস্কার পাইবেন। আশুতোষ ছাত্র-জীবনে কোন দিন এই আট আনার পুরস্কার লাভ করেন নাই,—তিনি প্রথম স্থানে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া প্রত্যহই এক টাকা পুরস্কার পাইতেন।

আশুতোষের ছাত্র-জীবন অদ্ভুত। তিনি যখন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র, তখন তাঁহার মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট'[৩] প্রথম খণ্ড, লর্ড মেকলের 'হেস্টিংস'[৪] ও 'ক্লাইবের'[৫] জীবনী পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়িবার সময় 'বার্কের প্রবন্ধাবলি'[৬] তিনি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন। জ্যামিতির চারি খণ্ড ত চতুর্থ শ্রেণিতেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় আশুতোষ দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

কলেজে প্রবেশ করিয়া আশুতোষের লেখাপড়ার ঝোঁক আরও বাড়িয়া যায়। এক মুহূর্তও তিনি সময়ের অপব্যয় করিতেন না। লাইব্রেরিতেই তাঁহার অবসর সময় কাটিয়া যাইত। প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতেই তাঁহার এম. এ ক্লাসের গণিত মোটামুটি পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছিল। কলেজের অধ্যাপকেরা তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতেন। তিনি যখন স্কুলের ছাত্র, তখনই ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ভাগের পঁচিশের প্রতিজ্ঞাটি নূতন ধরণের প্রমাণ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কলেজে ভরতি হইয়া সেই প্রবন্ধটি তিনি কেম্ব্রিজের ''ম্যাসেঞ্জার অব্ ম্যাথেম্যাটিকস্'' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ষোলো বৎসরের বালকের সেই রচনার ভিতর মনীষার এমন পরিচয় ছিল যে, অত বড় বৈজ্ঞানিক কাগজের সম্পাদক তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রবন্ধটি তিনি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-চালনার ফলে আশুতোষ এই সময়ে আবার অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার মাথায় এত বেশি যন্ত্রণা হইত যে, তিনি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। পিতা চিন্তিত হইয়া এবার তাঁহাকে গাজিপুরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এখানকার জলবায়ুতে তাঁহার ব্যাধি কিঞ্চিৎ কমিল বটে, কিন্তু তিনি একেবারে সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিলেন না। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল। আশুতোষ স্নান করিতেছিলেন,

হঠাৎ একটি বালক নিকটস্থ ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়ায় ভীমরুলগুলি উত্তেজিত হইয়া আশুতোষকে দংশন করিল। অসহ্য যন্ত্রণায় আশুতোষ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। এ মূর্ছা তাঁহার প্রায় দেড়দিন স্থায়ী ছিল। কিন্তু এই কঠিন পীড়া তাঁহার জীবনে শুভ ফলদায়ক হইয়াছিল। এই ব্যাপারের পর তাঁহার মাথার অসুখ সারিয়া গেল; আর তাঁহাকে মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতে হয় নাই।

ছয় মাস পরে সুস্থ হইয়া আশুতোষ গৃহে ফিরিলেন এবং ফিরিয়াই আবার টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। এইরূপে একটি বৎসর তাঁহার না পড়িয়াই কাটিয়া গেল। এই সময়ে এফ-এ পরীক্ষার দিনও ঘনাইয়া আসিল। বাড়ির সকলেই তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু আশুতোষ সে নিষেধ মানিলেন না। সকলেই মনে করিলেন হয় ত পাশ করাই তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে। কিন্তু ফল বাহির হইলে দেখা গেল, তিনি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

আশুতোষ এই সকল পরাজয়ের গ্লানি বি. এ পরীক্ষায় সুদে-আসলে উঠাইয়া লইয়ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের বি. এ পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ের ভিতর তিনটিতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দর্শনে তিনি নম্বর পান একশতের ভিতর ছিয়ানব্বই। তাঁহার পূর্বে এত নম্বর আর কেহ পায় নাই।

বি. এ পাশ করার পর আশুতোষ গণিতে এম. এ পরীক্ষা দেন। তাহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানে তিনি এম. এ ও রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা একসঙ্গে দিয়াছিলেন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। গণিতে তিনি পূর্ণ নম্বর পান, বিজ্ঞানে পান একশতের ভিতর ছিয়ানব্বই।

রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় তিনি দশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। এই সমস্ত অর্থই তিনি গ্রন্থ ক্রয়ে ব্যয় করেন। আশুতোষের লাইব্রেরি একটা দেখিবার মত জিনিষ। এই পুস্তকাগারে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকার পুস্তক আছে। আইনের পরীক্ষাতেও আশুতোষের যশ অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের[৭] প্রস্তাবে আশুতোষ এশিয়াটিক সোসাইটির[৮] সদস্য হন। সমিতির পত্রিকায় গণিত সম্বন্ধে আশুতোষের যে সকল প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার দুইটি প্রবন্ধ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্বাচিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলির মৌলিকত্বের পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যায়। ইহার পর কেম্ব্রিজের "ম্যাসেঞ্জার অব্ ম্যাথেম্যাটিক্সের" সম্পাদক মিঃ গ্লেসায়ারের চেষ্টায় আশুতোষ বিলাতের 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'র সভ্য হইয়া এফ-আর-এ-এস্ এবং তাহার পর বৎসর 'এডিনবরা রয়াল সোসাইটির'র সদস্য হইয়া এফ-আর-এস-ই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় পাশ করার পরের বৎসরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্বে আর কোনো বাঙালি এ সম্মান লাভ করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি পাশ করার পর শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর স্যার আল্‌ফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া আড়াই শত টাকা বেতনের একটি অধ্যাপকের

পদ দিতে চাহিয়ছিলেন। কিন্তু আশুতোষ বলিলেন, এ কাজে বিলাত-ফেরত অধ্যাপকেরা যে বেতন পান তাঁহাকেও যদি সেই বেতন দেওয়া হয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইবে না এই প্রতিশ্রুতি যদি গবর্নমেন্ট দেন, তবেই তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য অতঃপর তাঁহার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করা হয় নাই।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়া আশুতোষ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার* মৃত্যুতে মুখোপাধ্যায়-পরিবার শোকে একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। পুত্রের মৃত্যুর পর গঙ্গাপ্রসাদ দুই বৎসর কোনো রকমে বাঁচিয়া ছিলেন, তারপর তিনিও পরলোক গমন করেন। পিতার স্মৃতি-রক্ষার জন্য আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে আড়াই হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এই টাকার আয় হইতে একটি স্বর্ণপদক তৈয়ারি করিয়া বি.এস-সি অনারে যিনি পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নে প্রথম হইবেন, তাঁহাকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

হাইকোর্টে ওকালতি করিবার সময় আশুতোষ কিছুদিন ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের 'আর্টিকেল ক্লার্ক' ছিলেন। এই সময় আইন সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা তন্নতন্ন করিয়া জানিয়া লইয়াছিলেন। এই জানার ফলে মৌলিক প্রবন্ধ রচনার দ্বারা ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আশুতোষ ডক্টর-অব্-ল উপাধি লাভ করেন। অল্প দিনের ভিতরেই আইনের সুগভীর জ্ঞান ও অনন্যসাধারণ প্রতিভার জন্য তাঁহার সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহার আয় মাসিক প্রায় দশ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। এই সময়ে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে হাইকোর্টের জজিয়তি গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। মাতার অনুমতি লইয়া আশুতোষ অর্থের পরিবর্তে সম্মানকেই বরণ করিয়া লইলেন; সে সম্মান তিনি পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন। জজ হিসাবে আশুতোষ যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, কলিকাতা হাইকোর্টের কোন জজের ভাগ্যে সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আশুতোষের সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার নিজের হাতেগড়া প্রতিষ্ঠান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ২৪ বৎসর বয়সে ইহার সদস্য হইয়াছিলেন। তৎপর আমরণ তিনি কখন সদস্যরূপে, কখন বা ভাইস্-চ্যান্সেলার রূপে ইহাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁহার কাটিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণের চিন্তায় তিনি বিশ্রামের কথা ভুলিয়াছিলেন, স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রাখেন নাই। বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উন্নতি যে তাঁহার চেষ্টার ফল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'পোস্ট-গ্রাজুয়েট' বিভাগের সৃষ্টি, বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনা, স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা এ সমস্তই তাঁহারই চেষ্টা ও উদ্যমের ফল। তাঁহার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কতকটা পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্রের মত ছিল। তিনিই ইহাকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইতেছে।

* হেমন্তকুমার, তিনি বি.এ. পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে মারা যান।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর হন। তারপর ক্রমাগত আট বৎসর কাল তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। আরও একবার দুই বৎসরের জন্য তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া আশুতোষ গভর্নমেন্টের সহিত যুদ্ধ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আশুতোষই পুনঃপুন জয়ী হইয়াছেন।

আশুতোষের চলাফেরা বাহুল্যবর্জিত ছিল। বিলাস তাঁহাকে কখন স্পর্শও করিতে পারে নাই। ধুতি এবং জিনের কোটই ছিল তাঁহার সাধারণ পরিচ্ছদ। এই পরিচ্ছদেই সজ্জিত হইয়া তিনি বড় বড় সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন। কিন্তু এই বাহুল্য-বর্জিত দেহটার ভিতর দুর্জয় সাহস ছিল, অসাধারণ আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল। তাঁহার আত্মসম্মানের একটা উদাহরণ দিতেছি।

কিছুদিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচনা করিবার জন্য 'স্যাড্‌লার কমিশন'[৯] নামে একটি বৈঠক বসিয়াছিল। আশুতোষ এই বৈঠকের একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সদস্যেরা মহীশূরের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য যখন মহীশূর গমন করিয়াছিলেন, তখন সেখানকার মহারাজা একটি সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেন। সন্ধ্যার একটু আগে সাদা ধুতির উপর সাদা জিনের কোট পরিধান করিয়া আশুতোষ ভোজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মোটর থামিতেই মহীশূর রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন—"খালি মাথায় মহারাজের সম্মুখে যাইবার নিয়ম নাই। তাই আপনার জন্য একটি পাগড়ি আনিয়াছি, মহারাজের কাছে যাইবার সময় এইটি মাথায় পরিয়া যাইবেন।"

প্রাইভেট সেক্রেটারির ধৃষ্টতায় আশুতোষের মন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি মোটর-চালককে মোটর ফিরাইতে আদেশ দিয়া বলিলেন—"পাগড়ি আমি জীবনে কখনও পরি নাই, এখানেও পরিতে পারিব না। সুতরাং আপনাদের নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

মহারাজ ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া যুবরাজকে পাঠাইয়া দিয়া আশুতোষকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। দুর্বিনীত প্রাইভেট সেক্রেটারিকেও বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

আশুতোষের তেজস্বিতার বহু প্রমাণ আছে। সম্রাট্ এড্‌ওয়ার্ডের[১০] অভিষেকের সময় বড়লাট কার্জন[১১] সাহেব আশুতোষকে বিলাত যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণ পাইয়া আশুতোষ বড়লাটকে জানাইলেন যে, তাঁহার মাতার ইচ্ছা নয় যে তিনি বিলাত যান। নিমন্ত্রণ এই ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে দেখিয়া বড়লাট রুষ্ট হইলেন। তিনি উগ্রভাবে লিখিলেন—"আপনার মাকে বলিবেন ভারতের রাজপ্রতিনিধি কার্জন সাহেবের হুকুম, তাঁহার পুত্রকে অভিষেকে যোগ দিবার জন্য বিলাত যাইতেই হইবে।"

এরূপ ব্যবহার সহ্য করা আশুতোষের স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি তৎক্ষণাৎ লাট সাহেবকে জানাইলেন—"এ কথার উত্তরে আমার মা কি উত্তর দিবেন তাহা আমি জানি। তিনি বলিবেন—'লাট সাহেবই হোন্ আর রাজ-প্রতিনিধিই হোন্, আমার ছেলেকে আমার বা

তাহার নিজের মতের বিরুদ্ধে জোর করিয়া হুকুম দিয়া কাজ করাইবেন—এত বড় ক্ষমতা কাহারও নাই।" তাঁহার এই নির্ভীকতার জন্যই তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে 'বেঙ্গল টাইগার' উপাধি দান করিয়াছিলেন।

মাতার প্রতি আশুতোষের অসাধারণ ভক্তি ছিল। তাঁহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তিনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদিগকে প্রতি বৎসর একটি করিয়া স্বর্ণ-পদক দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কেবল মায়ের প্রতি নহে, মাতৃভাষার প্রতিও তাঁহার অনুরাগ যে কত গভীর, এই ব্যাপারটির ভিতর দিয়া তাহা স্পষ্ট ধরা পড়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অনাদর দেখিয়া আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রচলনের চেষ্টা করেন এবং তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল।

আশুতোষ যে কত দীন দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ছেলেদের কাছে তাঁহার দ্বার সর্বদা মুক্ত ছিল। অত বড় বিরাট পুরুষ হইয়াও তিনি ছাত্রদিগের সহিত একেবারে আপনার জনের মতই মিশিতেন। তাহাদের অভাব অভিযোগও ছিল সমস্তই তাঁহার কাছে। স্নেহ দিয়া, ভালোবাসা দিয়া, তিনি হাজার হাজার ছাত্রের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। এ স্নেহ, এ ভালবাসার মধ্যে কোনোখানেই এতটুকু খাদ ছিল না।

আশুতোষের মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক ব্যাপার! হাইকোর্টের বিচারপতি পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি আবার ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। পাটনা হাইকোর্টে ডুমরাওঁ রাজার একটি মামলা চলিতেছিল। এই মামলায় উকিল নিযুক্ত হইয়া তিনি পাটনায় যান। পাটনা হইতে আর তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন না। সেইখানেই হঠাৎ পাকস্থলির পীড়ায় কাতর হইয়া তাঁহার আত্মা দেহমুক্ত হয়। এই অদ্ভুত কর্মীর শোক দেশ আজিও ভুলিতে পারে নাই, কখনও যে পারিবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। যতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন স্বাধীন গবেষণার আদর থাকিবে, যতদিন একাগ্র কর্মনিষ্ঠার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা থাকিবে, ততদিন আশুতোষের নাম বাংলার কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। আশুতোষের সেই অগ্নিময়ী বাণী—"Freedom first, freedom second, freedom always."—'স্বাধীনতা প্রথম, স্বাধীনতা দ্বিতীয়, স্বাধীনতা চিরকাল'—ভারতবাসী কোনো দিন ভুলিতে পারিবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের নাম আজ সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাব্যে এবং সাহিত্যে তিনি যে নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার ফলে বাংলা ভাষাকে আজ আর উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। বাংলা ভাষা আজ সমগ্র বিশ্বে গৌরব ও সম্মানের আসন লাভ করিয়াছে।

কলকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন স্বনামধন্য মহাপুরুষ ছিলেন। পিতার জীবনের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ পুত্রের জীবনে বিশেষ ছায়াপাত করিয়াছিল। তাই তাঁহার সাহিত্য রচনার ভিতর কেবলমাত্র কলা-সৌন্দর্যের অপূর্বতাই পরিলক্ষিত হয় না, সেগুলির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যও অপূর্ব।

অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্কুলে ভরতি করিয়া দেওয়া হয় ; কিন্তু স্কুলের পড়া তাঁহার ভাল লাগিত না, প্রায়ই তিনি স্কুল হইতে পলাইয়া বাড়ি চলিয়া আসিতেন। গল্প শোনা যায়, ছেলেবেলায় অনেক সময়ে তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া পায়ের জুতা জলে ভিজাইতেন---মনে করিতেন এই ভাবে যদি অসুখ ডাকিয়া আনা যায়, তবে আর স্কুলে যাওয়ার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার প্রতি তাঁহার বিরাগ থাকিলেও পড়াশুনা করাকে তিনি অপছন্দ করিতেন না বরং অতি অল্প বয়সেই নিজে বাড়িতে পড়িয়া এত অধিক শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, স্কুলে পড়িয়া তাহা শিখিবার আশাও করা যায় না। জীবনে তিনি কখনও কলেজে পড়েন নাই, কিন্তু আজীবন জ্ঞানার্জনের জন্য যে সাধনা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

অতি অল্প বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই অল্প বয়সের রচনার ভিতরেও এমন কতকগুলি কবিতা আছে, যাহা ভাবে, ভাষার সৌন্দর্যে, ছন্দের নূতনত্বে অপূর্ব। এই সময় আইন অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে বিলাত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আইন পড়ায় তিনি মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। বিলাতে কিছুদিন থাকিয়াই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়ছিলেন।

দেশে ফিরিয়াই রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনায় গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ইহাতে তাঁহার প্রতিভা অদ্ভুত ভাবে খুলিয়া যায় এবং অল্প দিনের ভিতরেই তাঁহার নাম সুবিদিত ও জনপ্রিয় হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের রচনার বিশেষ গুণ এই যে, তাঁহার ভাষা যেমন সহজ, তেমনই সুন্দর ও শ্রুতিমধুর। তিনি সাজাইয়া গুছাইয়া এমন পরিষ্কার করিয়া লেখেন যে, তাঁহার

কলানৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মার্জিত রুচি এবং অপরূপ সৌন্দর্য-জ্ঞানের পরিচয় তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যাঁহারা বাংলা রচনায় খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ এবং সমাস-সম্বন্ধ পদ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথ তাঁহার পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের পথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন সহজ সাদা ভাষায় আমরা কথা বলিয়া থাকি, লেখাতেও তিনি সেই ভাষার প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহাতে ভাষার প্রকাশ-শক্তি যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে।

কেবল যে ভাষার ভিতরেই রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন তাহা নহে, নূতন নূতন নানা ভাবে তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। তাহা ছাড়া মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, করুণা, প্রেম, সহানুভূতি প্রভৃতি চিরন্তন ভাবগুলি নিজের মন দিয়া এমন গভীর ভাবে তিনি অনুভব করিয়াছেন এবং এত সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতা পড়িয়া প্রত্যেকেরই মনে হয়, কবি ঠিক তাঁহার মনের ছবিটাই ভাষার তুলিতে আঁকিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়া সকলের এত ভালো লাগে এবং তিনি বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এমন সুন্দর জিনিস আমাদের ভিতর পরিবেশন করিয়াছেন বলিয়া যেমন আমাদের আনন্দ বোধ হয়, তেমনই আবার কবিকে আপনার জন ভাবিয়া শ্রদ্ধা করিতে ও ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল কবিতাই লিখিয়াছেন তাহা নহে। গান, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভ্রমণকাহিনি প্রভৃতি কত বিভিন্ন রকমের রচনা যে তাঁহার হাত দিয়া বাহির হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এ পর্যন্ত তাঁহার যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কেবল মাত্র সেইগুলি দিয়াই ছোটখাট একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়। এত বেশি ও এত বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ আর কেহ কখনও লিখিয়াছেন কি না সন্দেহ। তিনি একাধারে বিশ্ববিশ্রুত কবি, যশস্বী গল্পলেখক, প্রথিতনামা ঔপন্যাসিক, প্রসিদ্ধ নাট্যকার, নিপুণ প্রবন্ধ লেখক এবং সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক।

রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়িয়া মনে হইতে পারে যে, তিনি কেবলমাত্র কল্পনালোকেই বিচরণ করেন, বাস্তবের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার জীবনের সঙ্গে পরিচিত তাঁহারা জানেন তাঁহার মত কর্মীও সচরাচর দেখা যায় না। দেশের নানা রকমের কর্মের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কলিকাতা হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানে প্রায় দুই শত ছাত্র লেখাপড়া শিক্ষা করে। উন্মুক্ত ময়দানে, ছেলেদের সুখসুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষার আয়োজন বিপুল হইয়া বালকদের মনকে শিক্ষার প্রতি যাহাতে বিতৃষ্ণ করিয়া না তোলে, সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। শৈশবে এই বোঝার ভয়েই তিনি স্কুলে যাইতে চাহিতেন না। এখনকার ছাত্রদের মন হইতে সেই ভয় দূর করিবার জন্যই হয়ত এই নূতন ধরনের বিদ্যালয় এবং নূতন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে।

দেশপ্রেমেও এই মহাকবির মন একেবারে ভরপুর। বহু স্বদেশি শিল্পের সহিত তাঁহার

যোগ আছে। নিজে অর্থ দিয়া অনেক দেশি শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় দেশাত্মবোধের যে প্লাবন আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের যোগ অল্প ছিল না। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ রচনা করিয়া, গানের পর গান লিখিয়া তিনি তখন কর্মীদের কর্মে উৎসাহ দিয়াছিলেন; দেশের লোকের মনে দেশের প্রতি, দেশের জিনিসের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার করিয়াছিলেন। বাংলার নেতাদের ভিতর কর্মধারা লইয়া যখন মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং সেই মতান্তর যখন মনান্তরে পরিণত হইয়া বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রটাকে আবর্জনায় ঢাকিয়া দিয়াছিল, সেই দুর্দিনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মিলনের সভাপতির আসন প্রদান করিবার জন্য সকল দলের উর্ধ্বে অবস্থিত এই কবিকেই আহ্বান করা হয়। পাবনায় রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের সভাপতিরূপে তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতেই বিভিন্ন দলের ভিতর বিবাদ বিদূরিত হইয়া মিলনের সেতু গড়িয়া উঠে। দেশের নেতাদের শ্রদ্ধাও যে রবীন্দ্রনাথের উপর কত বেশি, এই ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসাধনায় মগ্ন থাকেন বলিয়া দেশের প্রতি খুঁটিনাটি কাজে আর সকলের মত দৃষ্টি দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁহার নির্জন সাধনার কুঞ্জটি পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে রাজনীতির কলকোলাহলের ভিতরেও নামিয়া আসিতে পারেন তাহার পরিচয়ও তিনি অনেকবার প্রদান করিয়াছেন। ভারত অনুরাগিণী মিসেস্ বেশান্তকে[১] যখন গভর্নমেন্ট রাজবন্দীরূপে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া একটি আন্দোলন জাগিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর সেই আন্দোলনে অতি তীব্র ভাবেই বাজিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সে আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। পাঞ্জাবের জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডেও তিনি অপূর্ব তেজস্বিতার পরিচয় দান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি যে পত্রখানি লিখিয়া গভর্নমেন্টের প্রদত্ত 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাহা চিরদিনের অক্ষয় সম্পদরূপে রক্ষিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা ভাষাকে আয়ত্ত করিয়াছেন, ইংরেজি ভাষাতেও তেমনি তাঁহার অসাধারণ অধিকার। এমন সুন্দর ইংরেজি লিখিত পারেন যে, অনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকও তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার কতকগুলি ভাল বাংলা কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া 'গীতাঞ্জলি' নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের জন্যই ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে 'নোবেল' পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এই পুরস্কারের পরিমাণ ১, ২০,০০০ টাকা। পুরস্কারের সমস্ত টাকাই তিনি বোলপুরের শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন।

'নোবেল' পুরস্কার লাভের পর রবীন্দ্রনাথের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ তাঁহার রচনা পড়িবার জন্য ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। নানা ভাষায় তাঁহার গ্রন্থ অনূদিত হইতেছে। প্রাচ্যের ভাব-ধারায় এমনি তিনি প্রতীচ্যকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর-অব-লিটারেচার উপাধি দিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে।

বাংলাভাষা আরও একটা দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। আজ মাসিক পত্রিকায় বাংলাদেশ ঢাকিয়া গিয়াছে। তাহাদের আদর্শও আজ অনেক উন্নত। কিন্তু এই আদর্শকে এতটা উন্নত করিয়া তোলার মূলেও রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাধনা। রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন'[২] প্রভৃতি নানা পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছেন; এবং তিনি যখনই যে পত্রিকার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই দেশের ভিতর সর্বোৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা হইয়া উঠিয়াছে। আজিও বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকাগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখা বক্ষে ধারণ করিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে।

দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রেম অতি সুগভীর হইলেও বিদেশকেও তিনি ঘৃণা করেন না। বিদেশের যাহা ভাল তাহা আমরা গ্রহণ করিয়া এবং আমাদের যাহা ভাল বিদেশকে দান করিয়া আমরা সার্থক হইব, এই তাঁহার বিশ্বাস। জাতীয়তার মোহে পড়িয়া বিদেশের ভালকে আমরা যাহাতে উপেক্ষা না করি, সেজন্য তাঁহার চেষ্টা ও যত্নের অন্ত নাই। এইরূপ আদানপ্রদানের ভিতর দিয়াই সমগ্র মানবজাতি মিলিত হইবে—এ কথা তিনি বহুবার বহুরকমে বলিয়াছেন এবং এই মিলনের মন্ত্র উচ্চারণ করাই আজ তাঁহার জীবনের সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই বিশ্ব-প্রেম এবং এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের বাণী লইয়া এ পর্যন্ত বহুবার বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। আমেরিকা, ইউরোপ, চীন, জাপান—যেখানেই তিনি গমন করিয়াছেন, সেইখানেই লোকে সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে, তাঁহাকে বিশ্বকবির উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়াছে, তাঁহার বাণী সাগ্রহে শুনিয়াছে। যে 'বিশ্বভারতী'র নাম আজ বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এই মিলনের উদ্দেশ্যেই তাহার প্রতিষ্ঠা। নানা দেশের ছাত্র একত্রে মিশিয়া এখানে শিক্ষালাভ করিতেছে। দেশবিদেশের বিভিন্ন ভাষা শিখাইবার জন্য, বিদেশের মনীষীদের ভাবধারার সহিত ছাত্রদের পরিচয় সাধনের জন্য বিদেশের বহু পণ্ডিতও এখানে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। এইরূপে যে মিলন কেবলমাত্র কবির স্বপ্নে ছিল, তাহাই তিনি বাস্তব জগতে কাজের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতির আসন দুইবার রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। তাঁহাব প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যে কি বিপুল, ইহাতেই তাহা বোঝা যায়। বিদেশেও তাঁহার যশ মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতই উজ্জ্বল। জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও আজ তাঁহাব প্রতিভার পূজা করিতে দ্বিধা করিতেছেন না। মানুষের মনের সুখ দুঃখের এমন সকল জিনিষ লইয়া তিনি কারবার করেন, যাহা সর্বদেশের সর্বদেশের সর্বকালের সকল মানুষকে আনন্দ দিবার ক্ষমতা রাখে। তাই তিনি সাধারণ কবির মত কোনো বিশেষ যুগ বা বিশেষ দেশের কবি নহেন, তিনি সর্বদেশের সর্বকালের কবি—তিনি বিশ্ব-কবি। সুতরাং বিশ্বমানবের মিলনের বাণী ঘোষণা করিবার যে তিনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিশ্ব-কবির সাধনা জয়যুক্ত হোক্!

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুল্য ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার তালতলায় এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। শৈশব হইতেই সুরেন্দ্রনাথের বুদ্ধির প্রখরতা পরিলক্ষিত হইত। কলেজের পরীক্ষায় প্রতি বৎসর কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে পনেরো বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বি-এ উপাধি লাভ করেন। কলেজে পড়ার সময় কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ সাইম্ সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা দর্শনে তাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আগ্রহেই দুর্গাচরণ পুত্রকে বিলাতে আই. সি. এস্ পড়িবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

বিলাতে গিয়া সুরেন্দ্রনাথ যথাসময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু আর এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। যে বয়সের মধ্যে এই পরীক্ষায় পাশ করিবার নিয়ম সুরেন্দ্রনাথের বয়স তাহা অতিক্রম করিয়াছে, এই আপত্তি করিয়া পরীক্ষকগণ তাঁহার কৃতকার্যতা নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। এই ব্যাপার লইয়া তিনি মহারানির দরবারে আর্জি পেশ করিলেন। অবশেষে পরীক্ষকগণকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল; তাঁহার নাম উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকাভুক্ত করিয়া কৈফিয়তের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

দেশে ফিরিয়া সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। দুই বৎসর মাত্র তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে একটি বিশেষ ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি ভিন্ন পথে ধাবিত হয়। কোনো একটি মামলার বিচার সুরেন্দ্রনাথ অন্যায় ভাবে পরিচালিত করিয়াছেন—গভর্নমেন্ট তাঁহার বিরুদ্ধে এই ধরনের একটি অভিযোগ আনয়ন করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করা সত্ত্বেও কোনো ফল হইল না—তিনি কর্মচ্যুত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। সিভিল সার্ভিসে থাকিলে সুবেন্দ্রনাথ যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পদচ্যুতি কল্যাণেরই কারণ হইয়াছিল। তিনি সরকারি কার্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণভাবে দেশের কাজে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের এই দুঃসময়ে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্য করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশেই সুরেন্দ্রনাথ দুই শত টাকা বেতনে

মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকের[১] পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে আরও কয়েকটি কলেজে অধ্যাপকতা করিয়া অবশেষে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বহুবাজারে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের কর্মভার গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়টিই সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টা, অধ্যবসায় এবং যত্নে পরে রিপন কলেজে পরিণত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের এই রিপন কলেজ এখনও বিদ্যমান আছে। অধ্যাপক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি অসাধারণ ছিল। তিনি যখনই যে কলেজে গমন করিয়াছেন, শত শত ছাত্র তাঁহার অনুসরণ করিয়া সেই কলেজে যোগদান করিয়াছে।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের[২] প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার সহিত সুরেন্দ্রনাথের জীবনের একটি গভীর দুঃখ ও শোকের কাহিনি জড়িত। অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোক্তাদের ভিতর সুরেন্দ্রনাথ একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সমিতির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনার দিন সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়।[৩] কিন্তু এত বড় একটা শোকও তাঁহাকে কর্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। অপরাহ্নে যথাসময়ে তিনি সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং সমিতি-সম্পর্কীয় অন্যান্য ব্যাপার নির্বাহ করিয়াছিলেন।

এই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার দ্বারা সুরেন্দ্রনাথ দেশের যে অপরিসীম উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার জন্য ভারতবাসী চিরকাল তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে। সমগ্র ভারতকে মিলনের সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহার কর্মধারাকে একই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিবার জন্য এই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা ভারতের বহু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠার ফলেই জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) সম্ভব হয়।

ভারতবর্ষের সর্ববিষয়ে উন্নতিসাধন করাই ছিল সুরেন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা। ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন যখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ, বিদেশি বস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, সুরেন্দ্রনাথ নির্ভীকভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। ফলে লর্ড লিটন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের দেশব্যাপী আন্দোলনের অসীম ক্ষমতা দেখা গিয়াছিল। তাঁহার চেষ্টা ও তুমুল আন্দোলনের ফলেই কার্জন সাহেবের বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বাংলা দেশের 'মুকুটহীন রাজা' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের সভ্য নিযুক্ত হন। ইহার কিছু দিন পরেই বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাকে সভাপতির আসনে বরণ করে। এই উভয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তিনি জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান এত গভীর ছিল যে, কলকাতা কর্পোরেশনের তখনকার চেয়ারম্যান স্যার হেনরি হ্যারিসন্[৪] তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।

সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই হ্যারিসন্ সাহেবের অকাল-মৃত্যুর পর তাঁহার নামেই হ্যারিসন্ রোডের নামকরণ হইয়াছিল। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের মিউনিসিপ্যাল বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার মিউনিসিপ্যাল আইন সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার যুক্তি যেমন তীব্র ও সারবান ছিল, তেমনি নানা তথ্যে পরিপূর্ণ ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির বহু সদস্য এই আন্দোলনে তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিলটি পাশ হওয়ায় তিনি কর্পোরেশনের সদস্যের পদ পরিত্যাগ করেন।

সংবাদপত্র সম্পাদনায় সুরেন্দ্রনাথ যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইবার সৌভাগ্য খুব অল্প বাঙালির ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। স্বনামধন্য ডব্লিউ-সি-ব্যানার্জি 'বেঙ্গলি'[৫] নামে একখানা ইংরেজি কাগজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কাগজখানির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এই কাগজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া অল্প দিনের ভিতরেই ইহার এত উৎকর্ষ সাধন করেন যে, তখনকার দিনে 'বেঙ্গলিই' বাংলার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ছিল। ইহার সম্পাদকীয় মন্তব্যকে রাজপুরুষেরাও রীতিমত ভয় করিয়া চলিতেন। এই পত্রের আন্দোলনের দ্বারা সুরেন্দ্রনাথ গভর্নমেন্টের অনেক অন্যায়ের প্রতিকার করিয়াছিলেন এবং দেশের অশেষ হিতসাধন করিয়াছিলেন।

একবার একটি প্রবন্ধের জন্য তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারক মিঃ নরিস্ কোনো একটি মামলায় কোনো এক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দেব-বিগ্রহ প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এরূপ আদেশের দ্বারা হিন্দুর মনে অত্যন্ত আঘাত দেওয়া হইয়াছে এবং বিচারক অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন, ইহাই ছিল প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রবন্ধের ভাষা অত্যন্ত তীব্র ছিল। বিচারপতি নরিস্ ক্রুদ্ধ হইয়া সুরেন্দ্রনাথের নামে মামলা আনয়ন করেন। বিচারে তাঁহার প্রতি বিনা শ্রমে দুই মাসের জন্য কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হয়। এই কারাদণ্ড সুরেন্দ্রনাথকে অধিকতর জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। পরে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি মিঃ নরিসের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধুগণ সহ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার জন্য যখন ব্রিস্টলে গিয়াছিলেন, তখন মিঃ নরিস্ অযাচিত ভাবে তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

জাতীয় মহাসমিতির সৃষ্টির প্রথম হইতেই এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত সুরেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। এই সভার তিনি একজন শক্তিমান সভ্য ছিলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। বস্তুত সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টা, উদ্যম, অধ্যবসায় ও অসাধারণ বাগ্মিতা গুণেই কংগ্রেসের শক্তি বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছিল। তিনি দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

বঙ্গভঙ্গের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ যে তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও কর্মতৎপরতা দেখাইছিলেন, তাহা অতুলনীয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে তিনি অক্লান্তভাবে সভাসমিতি করিয়াছিলেন, সমগ্র বঙ্গদেশে পরিভ্রমণ করিয়া

জনসাধারণকে ইহার প্রতিবাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, বিদেশি বর্জনের মন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে বিদেশি শাসকদের অনেকেই সুরেন্দ্রনাথকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ইমার্সনের উদ্যত রোষ প্রকাশ্যেই তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি আহূত হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথকে অপমানিত করিলেন, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন, অবশেষে সমিতির অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে দেশসেবা করিতে গিয়া সুরেন্দ্রনাথ কতবার যে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

সুরেন্দ্রনাথ দেশকে ভালবাসিতেন, বিদেশি শাসকদের উপরেও তাঁহাদের যথেচ্ছাচারের জন্য তাঁহার যথেষ্ট বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু তিনি চরমপন্থী ছিলেন না—সংস্কারের ভিতর দিয়াই তিনি স্বাধীনতা কামনা করিতেন। সেইজন্য ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে যখন ভারতবর্ষে শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয়, তখন ভারতীয় অন্যান্য নেতার মত তিনি সে সংস্কারকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই জন্যই এই সংস্কারকে ধ্বংস করিবার জন্য যে অসহযোগ আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সহিত তাঁহার যোগ ছিল না বরং তিনি শাসনসংস্কার যাহাতে সার্থক হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট যখন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

পথ লইয়া মতভেদ থাকিলেও সুরেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম যে অকৃত্রিম ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। দেশের কল্যাণের জন্য তিনি কোনো দুঃখকেই দুঃখ বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার মত বাগ্মী ক্বচিৎ জন্মে। এই বাগ্মিতার দ্বারা তিনি দেশের জনসাধারণকে যেমন উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তেমনি বিলাতে যাইয়াও ভারতের ভাগ্যবিধাতাদিগকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া ভারত সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে দেশাত্মবোধ ভারতের জনসাধারণের মনে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, সুরেন্দ্রনাথের অদম্য অধ্যবসায়ের উপরেই তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। গত ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সুরেন্দ্রনাথই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত, প্রধান যাজ্ঞিক ছিলেন। এখন যে বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশে কেন, ভারতবর্ষে যে জাতীয়তার স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে, যে কর্মপ্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে, সুরেন্দ্রনাথই তাহার স্রষ্টা। তাঁহারই জ্বালাময়ী বাণী, তাঁহারই প্রাণোন্মাদিনী বাগ্‌বিভূতি কেবল বাংলাদেশ বলিয়া নহে, সমস্ত ভারতবর্ষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ কালের জননেতৃবৃন্দ সে পথকে কল্যাণের অন্তরায় বলিয়া মনে করিলেও কেহই সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রাপ্য শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করিতে বিরত হয় নাই। বাঙালি চিরদিন সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহাদেরই একজন বলিয়া গৌরব অনুভব করিবে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি কলিকাতার নারিকেলডাঙায় মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রামচন্দ্র একজন সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন। 'কার ঠাকুর' নামক একটি কোম্পানিতে মাত্র ৫০্ টাকা বেতন তিনি কর্ম করিতেন। এই অর্থেই তাঁহাকে সমগ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিতে হইত। গুরুদাসের বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসর দশ মাস, সেই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। যে সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া একটি ক্ষুদ্র পরিবারের কায়ক্লেশে দিনাতিপাত হইতেছিল, রামচন্দ্রের মৃত্যুতে সে আয়ের পথটুকুও অন্তর্হিত হইল। কিন্তু রামচন্দ্রের পত্নী সোনামণি দেবী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ও সরলমনা রমণী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুতে শিশু পুত্রকে লইয়া একান্ত নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেও তিনি বিচলিত হইলেন না, এবং গুরুদাসের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের যাহাতে কোনো প্রকার আঘাত উপস্থিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এইরূপে শৈশবে পিতৃহীন এবং নিঃসহায় হইয়াও একমাত্র জননীর যত্ন ও চেষ্টায় গুরুদাস মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

প্রথমে একটি ক্ষুদ্র পাঠশালায় গুরুদাসের শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। নয় বৎসর বয়সে তাঁহাকে কলকাতার জেনারেল এসেম্‌ব্লি ইন্‌স্টিটিউসনে[১] ভরতি করিয়া দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয় বর্তমানে স্কটিশ চার্চেস্ কলেজ[২] নামে পরিচিত। তখনকার দিনে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইত। গুরুদাসকে এই জন্যই উহাতে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জেনারেল এসেম্‌ব্লিতে কিছুকাল অধ্যয়ন করিবার পর গুরুদাস ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে প্রবিষ্ট হন এবং মামার বাড়িতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে থাকেন। গুরুদাসের মামা খুব বড়লোক ছিলেন। বড়লোকের বাড়িতে নানা শ্রেণির লোকের সংসর্গে পুত্রের ভবিষ্যৎ পাছে নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় সোনামণি পুত্রকে পুনর্বার নিজ গৃহে লইয়া আসেন এবং হেয়ার স্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে ভরতি করিয়া দেন। হেয়ার স্কুলে ভরতি হওয়ার পর অষ্টম শ্রেণি হইতে তিনি একেবারে পঞ্চম শ্রেণিতে এবং পঞ্চম শ্রেণি হইতে ডবল প্রমোশন পাইয়া তৃতীয় শ্রেণিতে উঠেন। এইরূপে আট বৎসরের পড়া পাঁচ বৎসরে সমাপ্ত করিয়া ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে পনেরো বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হেয়ার স্কুলের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। গুরুদাসের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। বাড়িতে তিনি যখন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন, সেই সময়েই 'অমরকোষ'[৩] নামক সংস্কৃত অভিধানখানি সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গুরুদাস এফ. এ পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। গুরুদাস খুব ভাল ইংরেজি লিখিতে পারিতেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইংরেজির ন্যায় বাংলাতেও গুরুদাসের অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন তাঁহার নূতন ছন্দে 'মেঘনাদবধ' রচনা করেন, গুরুদাস তখন বি. এ ক্লাসের ছাত্র। দেশে তখন এই কাব্য লইয়া নানা তীব্র সমালোচনা এবং নিন্দাবাদ চলিতেছিল। কিন্তু এ সকল সমালোচনায় কর্ণপাত না করিয়া গুরুদাস নিজের বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া কাব্যখানি পাঠ করেন। মাইকেলের ভাষার গাম্ভীর্য, ছন্দের নূতনত্ব এবং বর্ণনা-ভঙ্গি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই গ্রন্থের একটি সমালোচনা লিখিয়া ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তিনি সেই সমালোচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য-নির্বাহক সভার সদস্য ডক্ সাহেবের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে 'মেঘনাদবধ' বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য শ্রেণিভুক্ত হইয়াছিল।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া গুরুদাস বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এম. এ পরীক্ষাতেও গণিত শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং একটি একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। বি. এল পরীক্ষাতেও তাঁহার যশ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এম. এ. পরীক্ষাতেও তাঁহার স্থান প্রথম হইয়াছিল এবং তিনিই স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন।

বি. এ পাশ করার পর গুরুদাস প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন; এম. এ পাশ করার পর তিনি উক্ত কলেজের অধ্যাপকের পদে স্থায়ী হন। এই চাকুরি গ্রহণ ব্যাপার লইয়া বেশ একটা কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছিল। অধ্যাপকের পদের জন্য গুরুদাসকে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের সহিত দেখা করিতে হয়। গুরুদাসের বেশভূষা নিতান্তই সাদাসিধা ধরনের ছিল। একখানি সাধারণ রকমের রংএর বনাত গায়ে দিয়া তিনি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। সাহেব তাঁহাকে টোলের পণ্ডিত মনে করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিয়া বসিলেন। 'এখানে টোলের পণ্ডিতের কোন কাজ খালি নাই।' কিন্তু গুরুদাস যখন বিনীতভাবে তাঁহাকে নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন, তখন সাহেবের সংকোচ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অনাড়ম্বর অথচ উজ্জ্বলতম রত্নকে সাহেব সেই মুহূর্তেই অধ্যাপক পদের নিয়োগপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

গুরুদাস বেশীদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু সেই অল্প কালের মধ্যেই সদয় ব্যবহারে ও চরিত্রগুণে তিনি ছাত্রদের নিকট অতি প্রিয় অধ্যাপকরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। কাহাকেও তিনি কখন কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করিতেন না। কেহ কোনো অন্যায় করিলে মৃদু অনুযোগ করিতেন মাত্র। তাহাতেই আশাতিরিক্ত ফল হইত। এই অধ্যাপনার কালেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত[৪] এবং প্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন[৫] তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বি. এল পরীক্ষা পাশ করিবার পর গুরুদাস তিনশত টাকা বেতনে

আইন অধ্যাপকের পদ লইয়া বহরমপুর কলেজে চলিয়া যান। বহরমপুর কলেজে তাঁহাকে দুই ঘণ্টা অধ্যাপনার কাজ করিতে হইত। সুতরাং অবশিষ্ট সময় আলস্য বিলাসে না কাটাইয়া তিনি সেখানকার আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ব্যবসায়ে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। আইন কলেজেও তাঁহার এই যশ অক্ষুণ্ণ ছিল। কলেজে যখন তিনি আইন পড়াইতেন, তখন তাঁহার বক্তৃতা এত ভাল হইতে যে কলেজের ছাত্র ছাড়াও বাহিরের বহু লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইত। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ক্যাম্পবেল্ এবং নীলদর্পণের অনুবাদককে মিঃ লং সাহেবকেও[৬] মাঝে মাঝে তাঁহার আইনের ক্লাসে দেখা যাইত।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া হাইকোর্টে যোগদান করেন। তাঁহার জ্ঞানার্জন-স্পৃহা এত বলবতী ছিল যে, ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াও তিনি শিক্ষার্থী ছাত্রের মতই পড়াশুনা করিতেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আইনের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি ডি. এল্ উপাধি পাইয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ঠাকুর-ল-লেক্‌চারার' রূপে তাঁহাকে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।

গুরুদাস নির্লোভ ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। একবার হাইকোর্টের একটি মোকদ্দমায় তাঁহার কোনো মক্কেল দৈনিক ৫০ টাকা পারিশ্রমিক দিয়া তাঁহাকে উকিল নিযুক্ত করেন। নিযুক্ত হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বহরমপুরের কোনো মোকদ্দমার ভার গ্রহণের জন্য তাঁহার আহ্বান আসিল—পারিশ্রমিক দেড়হাজার টাকা। ৫০ টাকা পারিশ্রমিকের মামলাটি তিনি পূর্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া দেড়হাজার টাকার প্রলোভন তিনি সংবরণ করিয়াছিলেন। পরদিন হাইকোর্টে গিয়া গুরুদাস শুনিতে পাইলেন, বহরমপুরের জজ গুরুদাসের অসুবিধার জন্য সেখানকার মামলাটি স্থগিত রাখিয়াছেন এবং সেখানে যাইয়া তাঁহার মামলা পরিচালনার সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত উহা স্থগিতই থাকিবে। গুরুদাসের দায়িত্বজ্ঞান ও লোভশূন্যতা যে কত অধিক ছিল, তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায়। ন্যায়নিষ্ঠা যে পরিণামে পুরস্কৃত হয়, এই ঘটনার ভিতর দিয়া তাহারও পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে গুরুদাস বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। তারপর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন। গুরুদাস ষোলো বৎসর কাল এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ, কর্তব্যনিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা বিচারক অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি নিজে যাহা সত্য বুঝিতেন, তাহা ব্যক্ত করিতে কখন ভীত বা বিচলিত হইতেন না। গুরুদাসের বিচার-বুদ্ধির উপর সে সময়কার প্রধান বিচারপতি স্যার ফ্রান্সিস্ ম্যাক্‌লিনের এত গভীর শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁহাকে সহযোগী না করিয়া তিনি কোনো জটিল মামলারই বিচার করিতেন না।

গুরুদাসের জীবনে এবং চরিত্রে কর্ম-ভীরুতা এবং আলস্য কখন স্থান পায় নাই। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত প্রতি কার্যে তাঁহার অদম্য উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা এত প্রবল ছিল যে, পুত্র যতীন্দ্রচন্দ্র যেদিন বিসূচিকা রোগে মরণাপন্ন কাতর

সেদিনও তিনি যথারীতি হাইকোর্টে যাইয়া অন্যান্য দিনের মত ধীর, স্থির এবং নিরুৎকুণ্ঠভাবে কার্য করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি তাঁহার পুত্রের অবস্থা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বাধ্য করিয়া বাড়িতে পাঠাইয়া দেন। গুরুদাস ফিরিবার কিছুক্ষণ পরেই যতীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। যতীন্দ্র হেয়ার স্কুলে পড়িত। গুরুদাস তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ হেয়ার স্কুলে 'যতীন্দ্রচন্দ্র পদক ও পুরস্কার' নামে একটি পদক ও পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে ঐ পুরস্কার তাহাকেই দেওয়া হয়।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। তিনি চারি বৎসর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই চারি বৎসরের কাজের ভিতরেও তাঁহার কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে বাংলা ভাষার কোনো আদর বা সম্মান ছিলনা। গুরুদাসই প্রথম সে চেষ্টা করেন এবং তাহার অনেক দিন পরে স্যার আশুতোষের প্রাধান্য সময়ে গুরুদাসের আরব্ধ চেষ্টা ফলবতী হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির আসন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সেই বৎসরেই গভর্নমেন্ট হইতে তাঁহাকে 'নাইট' বা 'স্যার' উপাধি দেওয়া হয়।

দেশের লোকে যাহাতে সুশিক্ষা পায়, এজন্য গুরুদাস আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও এ কথা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা বা আদর্শের ফল তাদৃশ শুভ হইবে না। এইজন্য তাঁহারই উৎসাহ এবং উদ্যম এবং আরও কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা দেশে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় বক্তৃতা দিতে উঠিয়া গুরুদাস বলেন—"শিক্ষার্থীদের মনে স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সঞ্চার করা এবং দেশের লোকের তত্ত্বাবধানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, টেক্‌নিক্যাল ও কার্যকরী বহুবিধ বিষয় শিক্ষা দান করাই শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা যাহাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তজ্জন্য ইহার ভিতরে প্রাচ্য আদর্শ অনুযায়ী ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের শিক্ষা ও সভ্যতার যতটুকু গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর তাহাও শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।"

শিক্ষা সম্বন্ধে গুরুদাস অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেগুলি একত্র করিয়া "A few thoughts on Education"[৭] নামক ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 'জ্ঞান ও কর্ম'[৮] নামক তিনি একখানা সুন্দর বাংলা গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত শিশুদের উপযোগী কয়েকখানি পাটীগণিতও আছে।

গুরুদাস দেশের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন এরূপ অতি কম লোককেই করিতে দেখা যায়। রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি একদিনও অলস ভাবে কাটান নাই। যখন যে কাজে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে, তিনি তাহাতেই যোগদান করিয়াছেন। সভাসমিতিতে যোগদানে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। ছাত্রদের সঙ্গে

যখন মিশিতেন, তখন বয়সের কথা যেন তাঁহার মনেই থাকিত না; শিশুর ন্যায় সরল ভাবে তিনি তাহাদের সহিত হাস্যালাপ করিতেন।

গুরুদাস নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সামাজিক সকল ব্যাপারে তাঁহার আচার-ব্যবহার ছিল খাঁটি হিন্দু ব্রাহ্মণের ন্যায়। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মনে সঙ্কীর্ণতার স্থান ছিল না। সকল ধর্মের প্রতিই তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ছিল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর স্যার গুরুদাস আমাশয় রোগে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

স্যার গুরুদাস দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় বহু কষ্ট ও অভাবের ভিতর দিয়া তাঁহাকে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও নিজের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে তিনি জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোন কাজ আরম্ভ করিলে তাহা যে কখনও অসম্পন্ন থাকে না, ভবিষ্যৎ উন্নতি ও যশ অর্জনের পথে দারিদ্র্য যে অনতিক্রম্য বাধা নহে, গুরুদাসের জীবন ও কার্যাবলিই তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অরবিন্দ ঘোষ

ইংরেজি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট কলিকাতা নগরীতে অরবিন্দ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ তখনকার দিনে কলকাতার একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। বাংলার অন্যতম মনীষী রাজনারায়ণ বসুর[১] এক কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। ডাক্তারি ব্যবসায়ে যথেষ্ট উপার্জন সত্ত্বেও উচ্চতর চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য তিনি বিলাত গমন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রতিযোগিতামূলক আই-এম-এস পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তাহার পর বিলাত হইতে যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি একেবারে পুরাদস্তুর সাহেব, ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রকাণ্ড পৃষ্ঠপোষক।

এই ইউরোপীয় ভাবের ফলে কৃষ্ণধন বাবু অরবিন্দকে এবং অরবিন্দের অপর দুই জ্যেষ্ঠ সহোদরকে[২] সম্পূর্ণ ইউরোপীয়ভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। অতি অল্প বয়সেই অরবিন্দকে দার্জিলিং এর সেন্ট পল্‌স্‌ স্কুলে ভরতি করিয়া দেওয়া হয়। এখানে অরবিন্দকে ইউরোপীয় ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে হইত। পিতা দেশেও পুত্রের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াটা বিদেশি করিয়া দিয়া তাহাকে সাহেব করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সেই শিশুবয়সেও যাঁহারা অরবিন্দকে দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন, তাঁহার চোখের ভিতর

এমন একটা দীপ্তি ছিল যে, এই বালক যে কালে অসাধারণ ব্যক্তি হইবে তাহা বুঝিতে পারা যাইত। অরবিন্দের চরিত্রের ভিতরও একটি স্নিগ্ধ মধুর ভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁহার শিক্ষক এবং সহপাঠীগণ সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন।

দার্জিলিং-এ দুই বৎসর পড়িবার পর অরবিন্দের পিতা ছেলেদের লইয়া বিলাত গমন করেন এবং সেখানে তাহারা যাহাতে সুশিক্ষা পায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে অরবিন্দের বয়স সাত বৎসর মাত্র।

অরবিন্দ বারো বৎসর বিলাতে ছিলেন। শিশুকাল হইতেই এইরূপে ভারতবর্ষের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকায় এবং বিদেশি শিক্ষা ও সভ্যতার ভিতর বাড়িয়া উঠাব ফলে নিজের দেশ সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞানই ছিল না ; এমন কি, নিজের মাতৃভাষা সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য পরে আই.সি.এস পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাঁহাকে বাংলাভাষা শিখিতে হইয়াছিল।

অরবিন্দ কিছুকাল ম্যাঞ্চেস্টারে এবং পরে লন্ডনের সেন্ট পল্স্ স্কুলে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু অরবিন্দের জীবন এ সময়ে খুব সচ্ছল অবস্থার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয় নাই। পিতা কৃষ্ণধন বাবু যদিও প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন, বংশগত বদান্যতাগুণে তাঁহার খরচও আবার তেমনি অধিক ছিল। অনেক সময়ে তিনি এমন ভাবে অর্থদান করিয়া ফেলিতেন যে, তাহার ফলে পুত্রদিগকে দারুণ অভাবে পড়িতে হইত। কিন্তু অরবিন্দকে এই অভাবের তাড়না খুব বেশি সহ্য করতে হয় নাই। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি পরীক্ষায় পাশ করিয়া যে বৃত্তি পাইতেন, তাঁহার নিজের খরচ তাহাতেই প্রায় চলিয়া যাইত।

অরবিন্দের বয়স যখন মাত্র আঠারো, সেই সময় অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আই-সি.এস্ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়েই তিনি পাশ করিয়াছিলেন, কেবল অশ্বারোহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার আই-সি-এস্ হওয়া ঘটে নাই। ইহার পর তিনি ক্লাসিক্স্ সাহিত্যে উচ্চতম পরীক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং কিংস্ কলেজে বৃত্তিধারী ছাত্র হিসাবে পড়িতে থাকেন। এই সময়ে অরবিন্দের পিতার মৃত্যু হয় এবং অরবিন্দ তখন সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে বাধ্য হন।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ক্লাসিক্সের পরীক্ষায় অরবিন্দ প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার পরেই অর্থোপার্জনের জন্য তাঁহার চাকুরি গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে বরোদার গাইকোয়াড়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। তিনি অরবিন্দকে নিজের কন্‌ফিডেন্সিয়্যাল্ সেক্রেটারিরূপে গ্রহণ করিয়া বরোদায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অরবিন্দের বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র।

পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ইউরোপীয় আবেষ্টনের ভিতর বাড়িয়া উঠার ফলে অরবিন্দ ইউরোপীয় ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন এবং ইংরেজি ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে

তাঁহার জ্ঞান খুব সামান্যই ছিল। তাহা হইলেও তাঁহার হৃদয় ভারতের মাটির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। ইউরোপীয় সভ্যতার ভিতর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপীয় জীবন তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই ; মনেপ্রাণে তিনি এমন একটা জিনিষ চাহিতেন যাহা কেবল ভারতবর্ষই দিতে পারে।

বরোদায় তাঁহার ক্রমশ পদোন্নতি হইতে লাগিল। কন্‌ফিডেন্সিয়্যাল্ সেক্রেটারি হইতে তিনি দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং সেখান হইতে স্টেট্ কলেজে বদলি হইলেন। এখানে কিছুদিন অধ্যাপকের কার্য করার পর তিনি গায়কোয়াড়ের প্রাইভেট্ সেক্রেটারির পদ লাভ করেন এবং অবশেষে স্টেট্ কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল হন। এইরূপে বরোদায় অরবিন্দ চৌদ্দ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন।

বরোদায় অরবিন্দ নানাদিক দিয়া আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন এবং সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরও অধিক দিন সেখানে থাকিলে কোনো সম্মান বা কোনো পুরস্কার লাভ করাই হয়ত তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের মনে একটা পরিবর্তনের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। জাতির পরাধীনতার দুঃখ দিন দিন তিনি নিজের অন্তরে গভীর হইতে গভীরতর ভাবে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে জাতির স্বাধীনতার সঙ্গীতে তাঁহার মনপ্রাণ মুখরিত হইয়া উঠিল এবং জাতির স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার দুর্দমনীয় বাসনায় তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য এবং সমস্ত সম্মানের সম্ভাবনাকে পদদলিত করিয়া কর্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দেশের চিন্তায়, দেশের হিতে, দেশের কাজে তিনি আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

বাংলার আকাশে বাতাসে এই সময় একটা নূতন ভাব প্রবাহিত হইতেছিল। একটা নূতন ধরনের জাতীয়তার অনুপ্রেরণায় বাঙালির চিত্ত তখন ভরপুর। সুতরাং মহৎ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত এবং দেশসেবার অদম্য আকাঙক্ষা লইয়া অরবিন্দ যখন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমগ্র বাঙালি জাতি কায়মনোবাক্যে তখন তাঁহাকে আপনাদের ভিতর সাগ্রহে বরণ করিয়া লইল।

এই সময় গভর্নমেন্ট এক বিধি নির্দেশ করিয়া ছাত্রগণের রাজনীতির আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া দেন ; তাহার জন্য দেশময় একটা প্রবল অসন্তোষের ভাব জাগিয়া উঠে। তাহার ফলে পুরাতন স্কুল কলেজের প্রতিও লোকের বিরাগ জন্মে এবং বহু সংখ্যক জাতীয় বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। অরবিন্দ এই সময়ে দেশে ফিরিয়া আসায় তিনিই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ মনোনীত হন। অরবিন্দের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং দক্ষতা হয় ত জাতীয় শিক্ষায়তনগুলিকে ঈপ্সিত আদর্শে উত্তীর্ণ করিয়া দিত ; কিন্তু পরিষদের পুরাতন-পন্থী কতকগুলি সভ্যের সঙ্গে মতদ্বৈধ সৃষ্টি হওয়ায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভালোবাসা এবং ভক্তি অরবিন্দ এরূপ গভীর ভাবেই লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র অশ্রু-সজল নেত্রে তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন করিয়াছিল।

ইহার পর অরবিন্দের উপর 'বন্দেমাতরম্'[৩] কাগজের সম্পাদন ভার অর্পিত হয়। এই কাগজের সম্পাদনায় তিনি অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। দেশের লোককে শিক্ষিত ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি প্রতিদিন ইহাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অরবিন্দ হিংসা ও আইন অমান্যের ভাব লইয়া দেশসেবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। নানা প্রবন্ধের ভিতর দিয়া তিনি এ কথা ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু দেশসেবকদের উপর এবং স্বদেশি আন্দোলনের উপর সরকারের পক্ষ হইতে এই সময় যে ব্যবস্থা চলিতে থাকে, তাহার ফলে বাঙালি 'বন্দেমাতরম্' এর মন্ত্র ভুলিয়া 'যুগান্তরে'র সৃষ্টি করে এবং এই ভাবে বাংলায় বিপ্লবের আন্দোলন জাগিয়া উঠে। অরবিন্দ এ ভাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

অরবিন্দ দেশসেবার কাজকে ভগবানের নির্দেশ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। দেশসেবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসও তাঁহার বাড়িয়া চলিতেছিল। এই সময় তাঁর স্ত্রীকে তিনি যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সব পত্র হইতেও তাঁহার দেশপ্রীতি ও ভগবৎ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই সহরে জাতীয়তা সম্বন্ধে তিনি একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—"মুখে জাতীয়তার কথা বলিলেই দেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া হয় না। ফলের কথা চিন্তা না করিয়া ভগবানে অখণ্ড বিশ্বাস রাখিয়া, নিজেকে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ মনে করিয়া যিনি দেশের কাজ করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাকেই সত্যকার দেশপ্রেমিক বলা যায়। দেশসেবার কার্যে নেতার কোনো প্রয়োজন নাই, নেতার আদেশ বা পরিচালনার কোন আবশ্যক নাই। নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী যতটুকু পারা যায় তাহাই যদি আমরা করিয়া যাইতে পারি, তবে আমরা ভগবানের অনুগ্রহ নিশ্চয় লাভ করিব।" ইহা হইতেই অরবিন্দের জাতীয়তার আদর্শ যে কত উচ্চ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

অরবিন্দের দেশ-সেবার আদর্শ এবং তাঁহার অহিংস-নীতি বিপ্লববাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি তিনি রাজরোষ হইতে মুক্তি পান নাই। একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে তারিখে গভীর রাত্রিতে তাঁহার কলিকাতার গৃহে পুলিশ-কর্মচারীরা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—তিনি নানারকমের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দিয়া বিপ্লববাদীদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। অরবিন্দের মামলা এক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষে এই মামলার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুক্তি, তর্ক, সাক্ষ্য, প্রমাণ দিয়া তিনি স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অলীক। তাঁহার চেষ্টায় অরবিন্দ নির্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তিলাভ করেন।

এই মোকদ্দমার ফলে অরবিন্দের ধর্মবিশ্বাস আরও গভীর হইয়া উঠে। ইহার পরবর্তী সমস্ত কাজেই তাঁহার এই ধর্মের ভাবটাই প্রধান ও সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে। বরিশাল ঝালকাঠিতে যে রাষ্ট্রীয় সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন,—"ভগবানের হাতুড়ির নীচে আমরা লোহার মত।

তিনি আমাদিগকে যে আঘাত করেন, সে আঘাত আমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য নহে, আমাদিগকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য। নিপীড়নের ভিতর দিয়াই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হইব।"

এই সময়ে 'কর্মযোগিন্'[৪] নাম দিয়া তিনি একখানা নূতন কাগজ বাহির করেন। এই 'কর্মযোগিন্' কাগজেরই একটি প্রবন্ধের জন্য তাঁহার নামে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে আবার অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। কিন্তু এবারেও সরকার তাঁহাকে দণ্ড দিতে পারিলেন না। ইহার পরেই তিনি পণ্ডিচেরিতে চলিয়া যান এবং এখনও সেইখানেই বাস করিতেছেন।*

পণ্ডিচেরিতে গিয়া তিনি পার্থিব সমস্ত ভাবনা ভুলিয়া নির্জনে যোগ-সাধনায় রত আছেন। তাঁহার এই যোগসাধনার উদ্দেশ্য নিজের মুক্তি নহে—মানবতা বা মানব সমাজের মুক্তি।

অরবিন্দের সম্পাদকতায় 'আর্য্য'[৫] নামে আরও একখানা পত্রিকা বাহির হইয়াছে। পত্রিকাখানি দার্শনিক প্রবন্ধে পূর্ণ থাকে। প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই অরবিন্দ লিখিতেছেন। অরবিন্দের সাহিত্যিক শক্তিও[৬] অতিশয় অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। তাঁহার রচনার ভিতর এমন একটা সরলতা, গাম্ভীর্য, মধুরতা এবং আবেগ আছে, যাহা অনেক বড় বড় লেখার ভিতরেও একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় না।

অরবিন্দ ঘোষের জীবন ঘটনা-বহুল নহে। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে বাংলায় আসিয়া তিনি দেশের কাজ আরম্ভ করেন। এই দেশসেবাও দীর্ঘ দিন করিবার তাঁহার অবকাশ হয় নাই। কিন্তু এই অল্প সময়ের ভিতরেই দেশসেবার যে অনুপ্রেরণায় তিনি দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার কর্ম-প্রণালীর আদর্শ, তাঁহার ধর্মপ্রাণতা তাঁহাকে বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

* পরলোকগমন ৫.১২.১৯৫০

জগদীশচন্দ্র বসু

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুরের সাব্-ডিভিশনাল অফিসার ছিলেন। অতি শৈশব হইতেই জগদীশচন্দ্রের মনে একটা নূতন কিছু আবিষ্কারের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। জগদীশচন্দ্রের পিতা শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কতকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই জগদীশচন্দ্রের মনে আবিষ্কারের প্রথম স্পৃহা জাগ্রত হয়। ভগবানচন্দ্র পুত্রের এই মনের গতি লক্ষ্য করিয়া সেই ভাবেই তাঁহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন।

এই সময়ে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতির কেবল সূচনা হইয়াছে। ফলে সব দিক দিয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণ দেশে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং ভগবানচন্দ্র পুত্রের প্রথম শিক্ষা ইংরেজি বিদ্যালয়ে না দিয়া গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহাকে ভরতি করিয়া দেন এবং গ্রামের কৃষক, তাঁতি, কামার, কুমার প্রভৃতি সকল শ্রেণির ছেলেদের সঙ্গে তিনি সমান ভাবে শিক্ষিত হইয়া উঠিতে থাকেন। ইহার একটি চমৎকার সুফল ফলিয়াছিল। জগদীশচন্দ্র নিজেকে সকলের সমান মনে করিতে শিখিয়াছিলেন এবং কোনো কারণেই আপনাকে বড় বলিয়া ভাবিবার অবসর পান নাই।

বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ লোকদের বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সাধারণত হিন্দুস্থানি দারোয়ানদের উপরেই অর্পিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যাহার কোলে শৈশবে লালিত হইয়াছিলেন, সে ছিল দস্যুদলের একজন নামজাদা সর্দার। কথিত আছে, ভগবানচন্দ্র যখন ফরিদপুরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এই ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। বিচারে দস্যুর বহু বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কারামুক্ত হইয়া সে ভগবানচন্দ্রের কাছেই ফিরিয়া আসে এবং একটা কিছু চাকুরির প্রার্থী হয়। ভগবানচন্দ্র লোকটাকে সৎভাবে জীবন যাপনের সুযোগ দিবার জন্য তাহাকে বাড়ির চাকরের পদে বহাল করেন এবং তাহার উপর জগদীশচন্দ্রকে কোলে করিয়া স্কুলে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ভার অর্পণ করেন। এই সময়ে জগদীশচন্দ্র চারি বৎসরের শিশু মাত্র। সুতরাং ইচ্ছা করিলে দস্যু ভৃত্য তাহাকে গ্রেপ্তার করার প্রতিশোধ সহজেই লইতে পারিত। কিন্তু তাহার উপর যে গুরুতর বিশ্বাসের কাজ অর্পিত হইয়াছিল, সে জীবনে কোনদিন তাহার অবমাননা করে নাই ; বরং বিপদে আপদে চিরদিন সে এই পরিবারের অনুগত ছিল।

জগদীশচন্দ্রের লেখাপড়ার উন্নতির দিকে ভগবানচন্দ্রের প্রখর দৃষ্টি ছিল। জগদীশচন্দ্র

কলিকাতা সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়া বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথমে অভিলাষী হন। কিন্তু তাঁহার পিতা এ শিক্ষালাভের জন্য তাঁহার বিলাত গমনের পক্ষপাতী ছিলেন না। জগদীশচন্দ্র জ্ঞানী হোন, বিদ্বান হোন, যশস্বী হোন্ ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং সিভিল সার্ভিসের পরিবর্তে ডাক্তারি বা বিজ্ঞান পড়িবার জন্য তিনি পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া দিলেন। জগদীশচন্দ্র প্রথমে লন্ডনে গিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ডাক্তারি পড়া তাঁহার সহ্য হইল না। কিছুকাল পরে তিনি তাহা ছাড়িয়া দিয়া বিজ্ঞান পড়ায় মনোনিবেশ করিলেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রাইস্ট কলেজ হইতে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন এবং পর বৎসর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এসসি. উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়েই তিনি সেখানকার পণ্ডিতদের নিকট হইতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার এক নতুন অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এই অনুপ্রেরণার তুলনায় তাঁহার পরীক্ষায় পাশ করাটা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দেশে ফিরিয়া জগদীশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন ভাল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ছিল না ; সুতরাং জগদীশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া প্রথম হইতে নিজের পরীক্ষাগার গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল। ইহার দশ বৎসর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি ছোট পরীক্ষাগার স্থাপনের ব্যবস্থা হয়।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং সাময়িক পত্রে তাহা প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া 'রয়েল সোসাইটি'র নিকট প্রেরণ করেন। প্রবন্ধের মৌলিকতার জন্য তাহা রয়েল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সোসাইটি বৈজ্ঞানিক কাজ চালাইবার জন্য তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যও করিয়াছিল। রয়েল সোসাইটির কাগজে প্রবন্ধ বাহির হওয়া তখনকার দিনে অতিশয় গৌরবের বিষয় ছিল। ইহার দুই বৎসর পরে বাংলা গভর্নমেন্টও জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার কার্য পরিচালনার জন্য গভর্নমেন্ট তাঁহাকে তখন কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও প্রদান করিয়াছিলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ও এই সময়ে এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের গুণাবলিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডি. এস্-সি উপাধিতে ভূষিত করে।

তারের সাহায্য ব্যতিরেকে তাড়িত-বার্তার আদান-প্রদান করা সম্ভব কিনা জগদীশচন্দ্র তাহা লইয়া গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে পৃথিবীর আরও দুজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপার লইয়া গবেষণা করিতেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একই সময়ে পৃথিবীর তিন জন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মনে একই বিষয়ে গবেষণার কথা উদিত হইয়াছিল। কিন্তু জগদীশচন্দ্রই সর্বপ্রথমে এই গবেষণায় কৃতকার্য হন এবং পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়া দেন যে, বিনা তারেও তাড়িত-বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব। এই অত্যদ্ভুত আবিষ্কারের ফলে জগদীশচন্দ্রের নাম দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

ইহার পর জগদীশচন্দ্র রয়েল ইন্‌স্টিটিউসনে তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা করার জন্য আহূত হন। কোন বৈজ্ঞানিককে এইরূপ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা তাঁহার পক্ষে খুব সম্মানের কথা। জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা প্রদান করার জন্য তিন বার আহূত হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। তৎপর ১৯০১ এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি যথাক্রমে তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে এক বিজ্ঞান মহাসভার অধিবেশন হয়। বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্নর স্যার জন উডবার্ন জগদীশচন্দ্রকেই ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া সেই সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি তাঁহার কার্য সম্পাদনে এরূপ দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রশংসায় ফ্রান্স মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ এরূপ এক ব্যক্তিকে তাহার প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে পারে, সে দেশ যে গৌরবের পাত্র, সম্মিলিত পণ্ডিতমণ্ডলী শত মুখে সে কথা কীর্তন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহাব নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে প্যারিসে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে ফ্রান্সের পদার্থ-বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করা হয়।

অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ও জগদীশচন্দ্রকে তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। নানারূপ পরীক্ষা এবং চিত্রের সাহায্যে তিনি ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসমূহ দেখিয়া শুনিয়া বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত নিঃসংকোচে স্বীকার করেন যে, জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কার দ্বারা যে সম্পদ দান করিয়া গেলেন, তজ্জন্য সমগ্র ইউরোপ ভারতবর্ষের নিকট ঋণী থাকিবে।

ইহার পর জগদীশচন্দ্র আমেরিকা ভ্রমণে বাহির হন এবং সেখানকার বহু স্থান পরিদর্শন করেন। নিউইয়র্ক, হার্ভার্ড, কলোম্বিয়া, চিকাগো প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে তিনি গিয়াছিলেন, সর্বত্রই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আনন্দের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং নানারূপে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়ছিলেন।

এই পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করিয়া জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডক্টর অব সায়েন্স" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করে। তাহার পর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পারিশ্রমিক স্বরূপ তাঁহাকে ১২০০্ টাকা দিতে চাহে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র আপনার স্বাভাবিক উদারতা গুণে সে টাকা গ্রহণ করেন নাই। তিনি টাকাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ফিরাইয়া দিয়া উহা হইতে কোন উপযুক্ত ছাত্রকে গবেষণা কার্যের সাহায্যের জন্য মাসিক ১০০্ টাকা হিসাবে একটি বৃত্তি দানের অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু জগদীশচন্দ্রের যে সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কথা এখনও বলা হয় নাই। জগদীশচন্দ্র নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া

দেখাইয়াছেন যে. গাছপালা এবং জীবজন্তুর জীবনে কোনো প্রভেদ নাই। গাছপালাকে আমরা সাধারণত প্রাণহীন বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু তাহারাও মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় সুখ দুঃখ, হর্ষ ও বেদনা অনুভব করে। এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণ করিবার জন্য জগদীশচন্দ্রকে প্রথমে একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। ইহার ভিতরের কাজ এত জটিল সূক্ষ্ম যে শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। জগদীশচন্দ্র নিজের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় শিল্পী দ্বারা এই যন্ত্রগুলি নির্মাণ করাইয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কার পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ায় এই ভারতীয় যন্ত্রগুলিও আজ নানা দেশবিদেশের লোক কিনিয়া লইয়া যাইতেছে।

জগদীশচন্দ্রের আর একটি আবিষ্কার এই যে, জীবজন্তুর ন্যায় গাছপালারাও রাত্রিতে নিদ্রা যায় এবং সকালবেলা তাহাদের ঘুম ভাঙে। পরীক্ষা দ্বারা এই মত প্রতিপন্ন করার জন্য জগদীশচন্দ্রকে অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মতবাদ খণ্ডন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু বিখ্যাত মনীষীর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ খণ্ডন করিয়া নূতন নূতন মতবাদ প্রচার করার চেষ্টায় জগদীশচন্দ্রকে যে কত উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু যাহা সত্য তাহা কখনও অনাদৃত থাকে না। জগদীশচন্দ্রও অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে অবশেষে স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিয়া আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া সর্বত্র আদৃত হইতেছেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র "উদ্ভিদের স্পন্দন"[১] নামে একখানি ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির অন্যতম। ইহাতে তাঁহার কয়েকটি অদ্ভুত আবিষ্কারের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে "Electro-Physiology"[২] নামে তিনি আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে জগদীশচন্দ্রের বয়স পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কার্য হইতে তাঁহার অবসর গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রেসিডেন্সি কলেজের কার্যাবলির প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া এবং ছাত্রদের উপর তাঁহার অসীম প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া বাংলা সরকার তাঁহার কর্মকাল আরও দুই বৎসর বাড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং বিগত ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ নিয়মানুসারে পেন্সন না দিয়া পূর্ণ বেতনে তাঁহাকে কার্য হইতে অবসর দেওয়া হইয়াছে।

ভারত গভর্নমেন্ট আরও অনেক দিক দিয়া জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার প্রতি সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. এবং ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের সময় সি. এস্. আই. উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহাকে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেষোক্ত উপাধি প্রদান উপলক্ষে কলিকাতায় এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে প্রফুল্লচন্দ্র রায় জগদীশচন্দ্রকে বৈজ্ঞানিক জগতের যুগপ্রবর্তক বলিয়া বর্ণনা করেন এবং তাঁহার নিঃস্বার্থপরতা ও অন্তরের উদারতার সবিশেষ প্রশংসা করেন। প্রফুল্লচন্দ্র বলেন যে, জগদীশচন্দ্র ইচ্ছা করিলে তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির দ্বারা ব্যবসায়

চালাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু মনে প্রাণে খাঁটি বৈজ্ঞানিক বলিয়াই তিনি দিনের পর দিন কেবল কাজ করিয়া চলিয়াছেন—অর্থোপার্জনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। অথচ তাঁহারই গবেষণার ফল নিজেদের কাজে লাগাইয়া অনেক লোক ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিতেছে।

জগদীশচন্দ্র তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কলিকাতায় যে 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির'[৩] প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ কীর্তি। বিজ্ঞানের উন্নতি এবং জ্ঞানের বিস্তৃতি সাধনই ইহার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। ভাল পরীক্ষাগার এবং যন্ত্রপাতির অভাবে জগদীশচন্দ্রকে প্রথম জীবনে বহু কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসুদের পথ হইতে সে অসুবিধা অনেকটা দূর হইয়াছে।

জগদীশচন্দ্র এ পর্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার সমস্তগুলির পরিচয় প্রদান এত অল্প পরিসরের মধ্যে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সম্প্রতি তিনি আরও অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কার যে বৈজ্ঞানিক জগতে সত্য সত্যই একটা নূতন যুগ আনিয়া দিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের ফলে ভারত আজ জগতের কাছে নূতন সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়ছে। ভারতবর্ষই একদিন সমস্ত জগতের জ্ঞানের সাধনা-ক্ষেত্র ছিল। কিছুদিন পূর্বে তাহার সে গৌরব নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল মনীষীর জ্ঞান-সাধনা দেখিয়া মনে হয়, আবার সেদিন ফিরিয়া আসা অসম্ভব নয়, যখন ভারতের পদতলে বিপুল বিশ্ব জ্ঞানার্জনের জন্য সম্মিলিত হইবে।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

খুলনা জেলায় অন্তর্গত রাড়ুলী কাটিপাড়া নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত এবং বিখ্যাত হিন্দু পরিবারে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র রায় একজন জ্ঞানী, বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। সামাজিক বহু ব্যাপারে তাঁহার মত অত্যন্ত উদার ছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে খুলনায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি সমসাময়িক বহু মনীষীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি স্বগ্রামে একটি মডেল বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আজীবন নিজ ব্যয়ে তাহার পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এই স্কুলটি এক্ষণে মডেল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার পিতৃপিতামহের প্রাচীন বাসভবন এই স্কুলের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহাকে প্রতি বৎসর বহু অর্থও ব্যয় করিতে হয়। অট্টালিকাটি এখন বহু স্থানে জীর্ণ। তথাপি উহা এখনও খুলনা জেলার শ্রেষ্ঠ অট্টালিকাগুলির অন্যতম।

প্রফুল্লচন্দ্র প্রথমে এই গ্রাম্য বিদ্যালয়েই শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু সুশিক্ষার সুবিধার জন্য হরিশচন্দ্র শীঘ্রই কলিকাতায় বাসা করিলেন। ইহার পর তাঁহাকে হেয়ার স্কুলে ভরতি করিয়া দেওয়া হয়। এই স্কুলে চারি বৎসর অধ্যয়ন করার পর রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রফুল্লচন্দ্র প্রায় দুই বৎসর শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার স্কুলে যাওয়া ইহাতে বন্ধ হইল বটে, কিন্তু পড়াশুনা বন্ধ হইল না। রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি পিতার লাইব্রেরির বহু বই পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রোগমুক্ত হওয়ার পর তাঁহাকে এলবার্ট স্কুলে ভরতি করিয়া দেওয়া হয়।

এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের মনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ জাগিয়া উঠে। তারপর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু,[১] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বক্তৃতা এই সময়ে তাঁহার মনে স্বদেশপ্রেমের বীজও বপন করিয়াছিল।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসনে ভরতি হন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইতিমধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের পৈতৃক সম্পত্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া হরিশচন্দ্র যে সুশিক্ষা দিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনাও রহিল না। কিন্তু পুত্র নিজের বিলাতের খরচ নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইলেন।১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে গিলক্রীস্ট বৃত্তি লাভ করায় তাঁহার বিলাতযাত্রার আর কোনো অসুবিধা হইল না।

প্রফুল্লচন্দ্র ছয় বৎসর বিলাতে অধ্যয়ন করেন। সাহিত্য এবং ইতিহাসের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানে উন্নতি ব্যতীত ভারতবর্ষের উন্নতি যে সম্ভব নহে, এ সত্য কলেজে অধ্যয়নের সময়ই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই বিলাত গিয়া সাহিত্য বা ইতিহাসের দিকে না ঝুঁকিয়া তিনি বিজ্ঞানের চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে ডি. এস্-সি উপাধি দেওয়া হয়। এখানে তিনি দুইজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষাগুণেই তাঁহার মন বিশেষভাবে রসায়ন শাস্ত্রের দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

রসায়নশাস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অধ্যয়নের বিষয় হইলেও, বিলাতে ঘরে বসিয়া তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজনীতি ও ভারতের অর্থনীতিশাস্ত্র বেশ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফলে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস্-সি পরীক্ষা দেওয়ার অব্যবহিত পূর্বে "বিদ্রোহের পূর্বে এবং পরে ভারতের অবস্থা"[২] নাম দিয়া তাঁহার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সে সময়ে তাঁহার এই রচনার যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। বিলাতের বহু মনীষী রচনাটির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। তাহার পরেই তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাঁহার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠে। এই কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রায় দশ বৎসর সাধনা করিয়া তিনি যে সমস্ত ফললাভ করিয়াছিলেন, "প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক গবেষণা"[৩] নাম দিয়া তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হয়। ইহাই তাঁহার বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে ভারতের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁহার যশ দেশবিদেশে ঘোষিত হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা গভর্নমেন্ট প্রফুল্লচন্দ্রকে ইউরোপের রাসায়নিক পরীক্ষাগারসমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সেখানকার রাসায়নিক ও বিদ্বজ্জন-সমাজে তিনি বিশেষ সমাদরে অভিনন্দিত ও অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে'র[৪] প্রতিষ্ঠা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। বাঙালির নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিও বিদেশ হইতে আমদানি হয় এবং তাহার ফলে বহু অর্থ দেশের বাহিরে চলিয়া যায়। এই অর্থশোষণ প্রফুল্লচন্দ্রের মনে যে আঘাত করিয়াছিল, তাহাতেই এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব। মাত্র আট শত টাকা মূলধন লইয়া কারখানাটি স্থাপিত হইয়াছিল; আর আজ ইহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে। প্রথম বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। কিন্তু ইহা যখন বিস্তার লাভ করিয়া বিপুল লাভের বিষয় হইয়া পড়িল, তখন ইহার উপর হইতে তিনি নিজের অধিকার তুলিয়া লইয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল আজ যৌথ-কারবার। দেশের বহুলোকে ইহার লভ্যাংশ ভোগ করিতেছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল ব্যতীত আরও অনেক শিল্প-অনুষ্ঠানের সহিত প্রফুল্লচন্দ্রের নাম আজ সংযুক্ত। প্রফুল্লচন্দ্র বাংলার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই স্থাপনা করিয়াছেন তাহা নহে, বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার প্রচুর অনুরাগ আছে। এই জন্যই কুড়ি বৎসর পূর্বে প্রাদেশিক সাহিত্য সভার এক অধিবেশনে তাঁহাকে সভাপতি পদে বরণ করা হইয়াছিল। বাংলা সাময়িক পত্রাদিতেও তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছেন এবং এখনও লিখিতেছেন।*

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে রসায়ন সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত আবিষ্কার দ্বারা প্রফুল্লচন্দ্র বিশেষ যশ অর্জন করেন এবং বৈজ্ঞানিক জগতের নিকট সুপরিচিত হন। ইউরোপের বহু বিখ্যাত রাসায়নিক এই আবিষ্কারের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রফুল্লচন্দ্র আরও অনেকগুলি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র রসায়ন এবং অন্যান্য বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস"[৫] তাঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই পুস্তকে তিনি সংস্কৃত গ্রন্থাদির সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রসায়ন শাস্ত্র অতি পূর্বকালেও ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে এ সম্বন্ধে ইউরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষ অনেক বেশি অগ্রসর হইয়াছিল। দেশবিদেশে এই গ্রন্থখানি যথেষ্ট সমাদর এবং প্রশংসা লাভ করিয়াছে। গ্রন্থখানি তাঁহার পনেরো বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফল।

প্রফুল্লচন্দ্রের গুণের পুরস্কার স্বরূপ ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে ডি. এস-সি উপাধি প্রদান করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ভারত গভর্নমেন্টও তাঁহাকে স্যার বা নাইট উপাধির দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র পঁচিশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল অধ্যাপকের কাজ করিয়া বহু সংখ্যক ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে যে পূজা ও সম্মান তিনি লাভ করিয়াছেন, সচরাচর কোন শিক্ষকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটিতে দেখা যায় না। ছাত্রদের লইয়াই তাঁহার জীবনের বেশির ভাগ কাটিয়া গিয়াছে। ছাত্রে এবং পুত্রে তাঁহার কাছে কোন ভেদ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে যে তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

ছাত্রের শক্তি বা গুণ কখনও প্রফুল্লচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। যে ছাত্রের ভিতর যখনই তিনি শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন, তখনই তাহাকে তিনি গবেষণা কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আপনার কাছে টানিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার মত শক্তিশালী বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে অনেক ছাত্রের প্রতিভা অদ্ভুত ভাবে খুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার শিষ্যদের লইয়া বর্তমানে এদেশে যে রাসায়নিক সঙ্ঘটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার শক্তিও আজ কম নহে।

বিজ্ঞানচর্চা এবং সাহিত্যসেবা ছাড়া প্রফুল্লচন্দ্র সমাজ সংস্কারেও বিশেষ মনোনিবেশ করিতেছেন। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদ প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কারগুলি দূর করিবার জন্য কথায়

* প্রয়াণ-১৬.৬.১৯৪৪

এবং কাজে তিনি অনেক চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সমাজ সংস্কারের আগ্রহ দেখিয়া ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় "ভারতের জাতীয় সামাজিক সভা"র অধিবেশনে তাঁহাকেই সভাপতি মনোনীত করা হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতে প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে রাসায়নিক গবেষণার কার্য করিয়া আসিতেছেন। বৈজ্ঞানিক, সাহিত্য-সেবী এবং সমাজসংস্কারক হিসাবে তাঁহার ক্ষমতার কথা আমরা জানি। কিন্তু তিনি যে একজন একনিষ্ঠ দেশসেবক, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তাহার পরিচয়ও তিনি প্রদান করিয়াছেন। মহাত্মার আহ্বানে তিনি তাঁহার চিরপ্রিয় রাসায়নিক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে চরকা ও খদ্দর ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও দেশে চরকা ও খদ্দরের প্রসারের জন্য তিনি যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছেন তাহার তুলনা হয় না।

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইয়াও প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার আচার-ব্যবহার বা পোশাক-পরিচ্ছদে জাতীয়তা বিসর্জন দেন নাই এবং চিরদিনই খাঁটি ভারতীয়ের মত সহজ সরল জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন। তিনি আজীবন কৌমার্যব্রতাবলম্বী। তাঁহার উপার্জিত অর্থের প্রায় সমগ্র অংশই দরিদ্র ছাত্র, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, এবং দেশের দুঃস্থ ও নিপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থ ব্যয় হইতেছে। দেশের দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, ঝড়ে বা যে কোন দৈবদুর্বিপাকে যেখানেই যখন সাহায্যের আবশ্যক হইয়াছে, নিজের সঞ্চিত অর্থ ত তিনি মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছেনই, দেশের লোকের নিকট নিপীড়িতদের সাহায্যের জন্য ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া বেড়াইতেও দ্বিধা করেন নাই। প্রফুল্লচন্দ্রের মত এমন একজন মহাপ্রাণ দেশসেবক এবং ত্যাগী কর্মবীরকে পাইয়া বাংলাদেশ যে ধন্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

অশ্বিনীকুমার দত্ত স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের পুত্র। বরিশাল জেলার বাটাজোড় দত্তবংশের বাসভূমি। অশ্বিনীকুমার ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি পটুয়াখালীতে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতা ব্রজমোহন তখন ঐ স্থানে মুনসেফ ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের মাতা প্রসন্নময়ী সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ[১] ও লালমোহন ঘোষের[২] ভাগিনেয়ী।

ব্রজমোহন প্রগাঢ় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন; বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি বড়ই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। পিতার এই ধর্মপ্রাণতা অশ্বিনীকুমার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। সচ্চরিত্র, ধর্মপরায়ণ পিতা ও জননীর সুশিক্ষার গুণেই অশ্বিনীকুমার দেশবরেণ্য হইয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার স্বভাবতই ধর্মানুরাগী ছিলেন। অতি বাল্যকালে তাঁহার এই অনুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অন্য ছেলেরা যখন নানা প্রকার খেলা করিত, অশ্বিনীকুমারের তখন খেলা ছিল ঠাকুর প্রস্তুত করিয়া তাহার পূজা করা। বাল্যকালে তিনি কাগজের ঢোলক বাজাইয়া হরিনাম গান করিতেন। পরিণত বয়সে এই হরিনাম কীর্তনে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় নানা স্থানে মুনসেফি করিয়া অবশেষে অনেক দিন কৃষ্ণনগরে সদরআলার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং অশ্বিনীকুমারের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম কয়েক বৎসর কৃষ্ণনগরেই অতিবাহিত হয়। তিনি কৃষ্ণনগর স্কুল ও কলেজ হইতেই প্রবেশিকা, এফ.এ ও বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ব্রজমোহন আদর্শ পিতা ছিলেন। তিনি পুত্রগণের সহিত আমোদ-আহ্লাদ, খেলাধূলা করিতেন। সেইজন্য অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে কখনও অন্যের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে লিপ্ত হইতে হইত না। অশ্বিনীকুমার পিতার সহিত কেমন নিঃসংকোচে কথা বলিতেন, সে সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। অশ্বিনীকুমার কাপড়চোপড় ও নানা প্রকারে যে অর্থব্যয় করিতেন, ব্রজমোহন তাহা একটু অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিতেন। ঐ ব্যয় কম করিবার জন্য তিনি একদিন অশ্বিনীকুমারকে বলিলেন "দেখ, এখনও আমি নিজের জন্য অত টাকা খরচ করি না।" এই কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমার হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—"তাহা ত হইবেই।" ব্রজমোহন বলিলেন, "কেন?" অশ্বিনী বলিলেন, "আপনি বা কে, আর আমি বা কে। আপনি বাটাজোড়ের কোন্ এক নন্দকিশোর দত্তের ছেলে, আর আমি সদরআলা ব্রজমোহন দত্তের ছেলে।"

অশ্বিনীকুমারের ছাত্রজীবনের একটি কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সত্যের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, মিথ্যাকে যে তিনি মহাপাপ মনে করিতেন, নিম্নলিখিত ঘটনাটি দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অশ্বিনীকুমার যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর ছিল। সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, কোন ছাত্র ষোল বৎসরের কম বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না। এ ক্ষেত্রে উক্ত অবস্থাপন্ন ছাত্রেরা যাহা করে, অশ্বিনীকুমারের বেলায়ও তাহাই হইয়াছিল—তাঁহার বয়স ষোলো বৎসর হইয়াছে লিখাইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা দেওয়ান হয়। এফ-এ পাশ করিবার পর অশ্বিনীকুমারের মনে হইল যে, তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। যুবক অশ্বিনীকুমার তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; এই অসত্য ব্যবহার তাঁহাকে দিবানিশি যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তিনি তখন কলেজের অধ্যক্ষের নিকট সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় যুবক অশ্বিনীকুমারের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন ; কিন্তু এতদিন পরে আর আর কোন প্রতিবিধান সম্ভব নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। অশ্বিনীকুমার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন করিলেন। রেজিস্ট্রার বলিলেন যে, এখন এই বিষয়টি সংশোধনের বাহিরে গিয়াছে, তাঁহার আর কিছু করিবার সাধ্য নাই। কিন্তু, সত্যপরায়ণ অশ্বিনীকুমার কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না ; এমন মিথ্যাচরণ দ্বারা তাঁহার জীবনকে কলঙ্কিত করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়া কৃষ্ণনগর হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার অভিভাবকেরা সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে বর্ধমান হইতে ধরিয়া আনিলেন। তখন তিনি বলিলেন যে, এই মিথ্যাচরণের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি দুই বৎসর কলেজে পড়িবেন না। তাহাই হইল ; অশ্বিনীকুমার দুই বৎসর কাল পড়া ত্যাগ করিয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন। এমন সত্যনিষ্ঠ যুবক যে পরে দেশবিখ্যাত অশ্বিনীকুমার হইবেন, বাংলাদেশেব উজ্জ্বল রত্ন হইবেন, এই ব্যাপারেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

অশ্বিনীকুমার কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি. এ পাশ করিবার পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এ পাশ করেন। তাহার পর কিছুদিন কৃষ্ণনগরে ও চাতরায় শিক্ষকতা করেন। তাহার পর বি.এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অশ্বিনীকুমার বরিশালে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং তিন বৎসর ওকালতি করিবার পরই আইনব্যবসায় ত্যাগ করেন। এই তিন বৎসরেই অশ্বিনীকুমার বরিশালের প্রধান উকিল বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে উকিল হইবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই ; বরিশাল জেলার সর্ববিষয়ে কল্যাণ সাধন করিবার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সামান্য ওকালতি কি তাঁহার ন্যায় মহাত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব পরলোকগত মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু[৩] মহাশয় একদিন একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "অশ্বিনীকুমার

অনন্যচিত্ত হইয়া আইনের ব্যবসায় করিলে স্যার রাসবিহারী ঘোষের সমকক্ষ হইতে পারিতেন।" ইহা কম প্রশংসার কথা নহে ; স্যার রাসবিহারী ঘোষের[৪] ন্যায় উকিল বাংলাদেশে কেন, ভারতবর্ষেও দ্বিতীয় ছিল না। কিন্তু সত্যের অবতার অশ্বিনীকুমার অর্থের প্রলোভনে আকৃষ্ট হন নাই। এত বড় পসার ত্যাগ করিয়া তিনি দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

অশ্বিনীকুমার ওকালতি ত্যাগ করিয়া প্রথমেই তাঁহার পিতৃদেবের নামে স্থাপিত ব্রজমোহন বিদ্যা নিকেতনের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায়, তাঁহার অধ্যাপনার গুণে এবং সহকর্মী অধ্যাপকগণের একাগ্র অধ্যবসায়ে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ বাংলা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিল। অশ্বিনীকুমারের আদর্শ চরিত্র, তাঁহার অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার দেশ-সেবার পবিত্র সৌরভ, তাঁহার ধর্মপরায়ণতা বরিশালের যুবক ছাত্রগণকে সর্বাংশে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিয়া তুলিল। বরিশাল সর্ববিষয়ে বাংলার শীর্ষস্থানীয় হইল। অশ্বিনীকুমারকে কেন্দ্র করিয়া নানা সদনুষ্ঠান শুধু বরিশাল নহে, সমস্ত পূর্ববঙ্গকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলিল।

ইহার কিছুদিন পরেই তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের আদেশে বাংলা দেশ দ্বিধা-বিভক্ত হইল ; পূর্ববঙ্গের জন্য নূতন লাট নিযুক্ত হইল। এই বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বাংলা দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, অশ্বিনীকুমার তাহাতে যোগদান করেন। তাঁহার তখন এমন প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যে, বরিশালের আবাল-বৃদ্ধ তাঁহার আদেশ নতমস্তকে প্রতিপালন করিত। তিনি সে সময়ে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। গভর্নমেন্ট তখন এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য বাংলাদেশের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে অন্তরিনে আবদ্ধ করিলেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের অন্যতম। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর অশ্বিনীকুমার নির্বাসিত হন। সুদূর লক্ষ্ণৌয়ের কারাগারে তিনি আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে চৌদ্দমাস কাল এই নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে অশ্বিনীকুমারের প্রধান দান তাঁহার 'ভক্তিযোগ'।[৫] এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাংলা ভাষায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র[৬] অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ' পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস যে, এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আমি বাংলা ভাষায় সম্প্রতি দেখি নাই, অথবা বাংলা ভাষায় অল্পই দেখিয়াছি।" অশ্বিনীকুমার যে কেমন ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত একটি গানের একটি চরণেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "লুকান মানিক তুল্‌বি যদি ডুব দে প্রেম সাগরের জলে।"[৭] ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও সেই কথাই বলিয়াছেন—"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন পাবার আশে।"[৮]

অনেকদিন হইতেই অশ্বিনীকুমার বহুমুত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। অবশেষে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর ৬৭ বৎসর বয়সে ভক্ত ও কর্মী, ভারতের সুসন্তান, দেশের গৌরব-রবি, বরিশালের বীরকেশরী অশ্বিনীকুমার সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। বাংলা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাহাকার ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। অশ্বিনীকুমার অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাঙালি এই ভক্ত ও কর্মীর কীর্তিকাহিনি চিরদিন স্মরণ রাখিবে। তাঁহার অবদান বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

চিত্তরঞ্জন দাশ

বাংলার পল্লিমায়ের শ্যামাঞ্চলচ্ছায়ায়, নদনদীবিধৌত প্রকৃতির রম্যলীলাভূমি, বাংলার এক সময়ের গৌরবময় রাজধানী, বঙ্গবিক্রমাধার সার্থকনামা বিক্রমপুর। সেই বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলীরবাগ গ্রাম সুবিখ্যাত দাশ বংশের পিতৃভূমি। বৈদ্য জাতীয় এই দাশেরা ইদানীং কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বংশের ভুবনমোহন দাশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্তরঞ্জন ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন, এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে সেখান হইতে বি. এ উপাধি লাভ করেন। কলেজে অধ্যয়ন-কাল হইতেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ ও বক্তৃতাশক্তির উন্মেষ হইতে আরম্ভ হয়। বি. এ পাশের পর চিত্তরঞ্জন বিলাত যাত্রা করেন, এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সরকারি চাকুরি করা বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেও শিক্ষানবিশ রূপে গৃহীত হইলেন না। অগত্যা চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারি পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং যথাসময়ে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করলেন।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাশ মহাশয় অ্যাটর্নি ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" নামক একখানি সংবাদপত্রেরও সম্পাদক ছিলেন। দাশ বংশ যেরূপ সম্ভ্রান্ত, ভুবনমোহন বাবুর প্রকৃতিও তদ্রূপ উন্নত ছিল। হাইকোর্টে অ্যাটর্নিগিরি করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। তাঁহার দান-ধ্যান বিলক্ষণ ছিল। প্রার্থীরা কখনও তাঁহার কাছে নিরাশ হইত না। এইরূপ অপরিমিত দানশীলতার ফলে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন

করিয়া ভুবনমোহন বাবু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ঋণদায়ে বিব্রত হইয়া অবশেষে দেউলিয়া হন। এই ঘটনা উপলক্ষে চিত্তরঞ্জনের মহৎ চরিত্র মহত্তর ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কর্মজীবনে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থোপার্জন করিয়া চিত্তরঞ্জন পিতৃঋণ স্বীকার করিয়া সেই ঋণ কড়ায় গন্ডায় পরিশোধ করেন। দেউলিয়া পিতার ঋণের জন্য চিত্তরঞ্জন আইনের কাছে একটুও দায়ী ছিলেন না। কিন্তু ধর্মের কাছে তিনি নিজেকে কিছুতেই দায়িত্বহীন মনে করিতে পারেন নাই। পিতার উপযুক্ত পুত্রের কর্তব্য তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া চিত্তরঞ্জন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু প্রথম প্রথম জুনিয়ার ব্যারিস্টারদের যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, চিত্তরঞ্জনও তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। চিত্তরঞ্জনের সম্বলের মধ্যে ছিল তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা, অনন্যসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠা ও অসাধারণ আইনজ্ঞান। এই তিনটি মূলধন অবলম্বন করিয়া তিনি কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। কয়েক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার পর ভাগ্য তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আলিপুরের বোমার মামলা উপস্থিত হইল। এই মামলায় চিত্তরঞ্জন আসামি পক্ষ সমর্থন করিতে নিযুক্ত হইলেন। এই মামলায় অসামান্য আইনজ্ঞানের পরিচয় দিয়া, মামলাটিকে সুপরিচালিত করিয়া তিনি পরিণামে জয়যুক্ত হইলেন। এই মামলার অন্যতম আসামি সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ চিত্তরঞ্জনের অনন্যসাধারণ প্রতিভাগুণে মুক্তিলাভ করিলেন। এই মামলা পরিচালন করিতে চিত্তরঞ্জনকে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তদনুপাতে প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মামলায় জয়লাভ করার পর তাঁহার যশে দেশ পূর্ণ হইল। সেই সময় হইতে ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে তাঁহার জলের মত অর্থাগম হইতে লাগিল।

এই সময়ে হইতে বড় বড় জটিল মোকদ্দমায় চিত্তরঞ্জন কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া রাজনীতিক মামলায় আসামীগণের পক্ষ সমর্থন করিবার ভার তাঁহার উপর পড়িতে লাগিল, এবং তিনিও প্রায়ই তাহাদের রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তিনি প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা উপার্জন করিতেন।

চিত্তরঞ্জন বাংলার যে কি ছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। চিত্তরঞ্জন ছিলেন বাংলার চিত্তের আনন্দ, অন্তরের অন্তর্গূঢ় বেদনা ; চিত্তরঞ্জন ছিলেন ভারতের অতীতের মূর্ত বিগ্রহ এবং ভবিষ্যতের আশার অপর্যাপ্ত উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি।

দরিদ্রের হাহাকার যেখানে ক্ষুধার তাড়নায় ধনসমুদ্রের পাষাণবেলায় আঘাত করিয়া প্রহত হইয়াছে, সেখানে আমরা দেশবন্ধুকে দীনবন্ধুর মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রথম জীবনে দুঃখ কষ্টের সহিত অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে জয়লাভ করিতে হইয়াছিল। পরিণত জীবনের প্রাচুর্যের ভিতর তাই তাঁহার দ্বার হইতে প্রার্থী কখন রিক্ত-হস্তে

প্রত্যাবর্তন করে নাই ; তাঁহার দ্বার দীনদরিদ্রের জন্য অহর্নিশ মুক্ত ছিল। দরিদ্রের বন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশসেবা ও দরিদ্রনারায়ণের সেবাই একমাত্র কার্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্যই কৃতজ্ঞ ভারতবাসী তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' নামে অভিহিত করিয়াছিল।

ভারতবর্ষের কল্যাণের সময়ে দেশবন্ধুর পাঞ্চজন্য দেশবাসীকে কেবল আহ্বানই করে নাই, জাগরণের অপূর্ব উন্মাদনায় তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। দেশাত্মবোধ ছিল চিত্তরঞ্জনের চিত্তের সহজ স্বাভাবিক ধর্ম। তাই, দেশের আহ্বান কানে আসিয়া পৌঁছিতেই ঘর ছাড়িয়া তিনি পথের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধা করেন নাই। নিষ্ঠার দ্বারা বাধাকে, ত্যাগের দ্বারা ভোগকে তিনি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বস্ব ত্যাগের গৌরব দেশের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই কতকাল পূর্বে একদিন নরনারীর মুক্তির পথ খুঁজিবার জন্য এক রাজপুত্র সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইয়াছিলেন; আজও সেই মহাপুরুষ সিদ্ধার্থের অবদান সমগ্র বিশ্বের সসম্ভ্রম প্রণতি লাভ করিতেছে। আর এতকাল পরে মহাবিত্তশালী চিত্তরঞ্জনের, দেশের নরনারীর কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ সেই অতীতের পবিত্র স্মৃতিই পুনরাবৃত্তি করিতেছে। বিশ্ববাসী এই সর্বস্বত্যাগী, বিজয়ী বীরকে সসম্ভ্রমে, ভক্তি-নম্রশিরে অভিবাদন করিতেছে।

পুরাকালে ভগীরথের সাধনা ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে সগরবংশের উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিয়াছিল; আর বর্তমান কালে দেশবন্ধুর সাধনা জড়, নিস্পন্দ জাতির ভিতর হইতে মাতৃপূজার সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ঋত্বিক দলের সৃষ্টি করিয়াছে।

বাঙালির বৈশিষ্ট্য বিদেশি কু-শিক্ষার মোহ ভেদ করিয়া পুরাতনের সহিত চিত্তরঞ্জনের নিবিড় সংযোগ-সাধন করিয়াছিল। তাই ঐশ্বর্যের মোহ এই ত্যাগের অবতারকে একটুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই ; তাই, ত্যাগের প্রয়োজনের সময় ঐশ্বর্যের নাগপাশ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত তাঁহার মনের চারিপার্শ্ব হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমস্ত দান করিয়া ভোলানাথের মত তিনি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সে ভিক্ষাও নিজের উদরান্ন সংগ্রহের জন্য নহে ; দেশের দীনদরিদ্র, অনাথআতুর, ক্ষুধার্ত নরনারীর জন্য; লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, ঘৃণিত, বিড়ম্বিত অসংখ্য নরনারীর জন্য। চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি, ধর্মনীতি সমস্তই এই অবদানে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের স্বদেশপ্রীতি মহান ও উদার ছিল। তাহার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা, কোনো বিদ্বেষের ভাব ছিল না। দেশের যাহাতে সর্ববিধ কল্যাণ হয়, তাহারই জন্য তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট বাক্যে কতবার কতস্থানে বলিয়াছেন যে, বিপ্লববাদ বা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের দ্বারা কখনো দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে না, যতদিন ভারতবাসী ধর্ম ও নীতিবলে বলীয়ান না হইতেছে, ততদিন এ দেশ স্বরাজ্য লাভের উপযুক্ত হইবে না। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ময়মনসিংহে একটি বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন যে কথা

বলিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার প্রধান কথা ; তাঁহার রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, সমস্তই ঐ কয়েকটি কথার মধ্যে নিবদ্ধ। নিজে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেশের কাজ আমার ধর্মের অঙ্গীভূত। দেশসেবা আমার জীবনের সকল আদর্শের একটা অংশ। আমার দেশই আমার ঈশ্বর। দেশের কাজ, জাতির কাজই আমার কাছে মনুষ্যত্ব। নরনারায়ণের সেবাই আমার ভগবানের সেবা।"

বাংলা সাহিত্যও চিত্তরঞ্জনের নিকট কম ঋণী নহে। ১৮৯৪ কি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'মালঞ্চ'[১] নামক একখানি গীতিকাব্য লইয়া তিনি সর্বপ্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 'মালঞ্চের' কবি যেমন তেজস্বী, তাহার কবিতাগুলিও তদ্রূপ প্রাণময়। তাহার পর 'মালা',[২] 'অন্তর্য্যামী',[৩] 'কিশোর-কিশোরী'[৪] ও 'সাগরসঙ্গীত'[৫] নামে তাঁহার চারিখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনি কিছুদিন 'নারায়ণ'[৬] নামক একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করেন। বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের[৭] যে অধিবেশন হয়, তাহাতে চিত্তরঞ্জন সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তাহার বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল ; পরিণত বয়সে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমত অতি উদার ছিল। তিনি সর্বদাই বলিতেন, "নরনারায়ণের সেবাই একমাত্র ধর্ম।"

যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া চিত্তরঞ্জন সত্য সত্যই পথের ফকির হইলেন; দেশের সেবার জন্য তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। একবার প্রচলিত আইন লঙঘনের জন্য তাঁহাকে ছয়মাসের জন্য কারাদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। ক্রমে অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িল। যিনি আজীবন সুখের ও বিলাসের ক্রোড়ে পালিত ও বর্ধিত হইয়াছিলেন, সহসা তাঁহার এই সম্পূর্ণ পরিবর্তন শরীরে সহিল না। চিত্তরঞ্জন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তবুও তিনি দেশসেবা ছাড়িলেন না। অবশেষে দেশবাসীর সকাতর অনুরোধে চিত্তরঞ্জন স্বাস্থ্য লাভের জন্য দার্জিলিং গমন করিলেন। সেইখানে হঠাৎ একদিন হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোকগত হইলেন। ১৩৩২ সালের ২ আষাঢ় এই দুর্ঘটনা ঘটিল। তাহার দুইদিন পরে চিত্তরঞ্জনের শবদেহ যেদিন কলিকাতায় আনীত হয়, সেদিন সেই দেবদেহ দর্শন করিবার জন্য কলিকাতায় এমন জনতা হইয়াছিল, যাহার তুলনা হয় না।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্তরঞ্জনের পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া যে চারি পঙ্‌ক্তি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই চিত্তরঞ্জনের জীবনব্যাপী সাধনার কথা অতি সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই দেশবন্ধুর অসাধারণ জীবনকাহিনি শেষ করিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
ক'রে গেলে দান।"[৮]

বঙ্গ-গৌরব

২য় খণ্ড

লর্ড সিংহ

(সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ)

মোগল বাদশাহ্‌দিগের আমলে মহারাজা মানসিংহ[১] রাজা টোডরমল[২] প্রভৃতি কয়েকজন ভারতবাসী হিন্দু প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেকালে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ লাভ হিন্দুর পক্ষে বড়ই দুর্লভ ছিল। তাহার পর ইংরেজের আমলে সর্বপ্রথম যে ভারতবাসী প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বাংলার ও বাঙালির বড় আদরের রায়পুর নিবাসী লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। বিলাতি অভিজাত-শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হইয়া সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের লর্ড উপাধি লাভ, বাংলার তথা ভারতের সামাজিক ইতিহাসে সামান্য ঘটনা নহে।

বীরভূম জেলায় রায়পুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামখানি পূর্বে নগণ্য ছিল ; এক্ষণে যাঁহার কৃতিত্বে ইহা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করিয়াছে, সেই সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সন ১২৬৯ সালের ১২ চৈত্র (ইংরেজি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ) সেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল তাঁহার গ্রামেই অতিবাহিত হইয়াছিল। উপযুক্ত বয়সে তিনি বীরভূম জেলা স্কুলে প্রবেশ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সেই স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। দুই বৎসর পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর আর তাঁহার কলিকাতায় পড়া হয় নাই ; তিনি ভ্রাতা নরেন্দ্রপ্রসন্নের সহিত বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে তিনি আইন অধ্যয়নের জন্য Lincoln's Inn-এ ভরতি হন। আইন অধ্যয়নে কৃতিত্বের জন্য তিনি বহু পুরস্কার লাভ করেন এবং অধ্যয়ন-শেষে ৫৫০ গিনি উপহার প্রাপ্ত হন। প্রশংসার সহিত ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার ভ্রাতা মেজর নরেন্দ্রপ্রসন্নও সেই বৎসর আই. এম্. এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারি কর্মে নিযুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পর, অন্যান্য জুনিয়ার ব্যারিস্টারের ন্যায় সত্যেন্দ্রপ্রসন্নেরও প্রথম প্রথম পসার জমে নাই। সেইজন্য কিছুদিন তাঁহাকে বিষয়ান্তরে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি সিটি কলেজে আইন শ্রেণিতে অধ্যাপকতা এবং পাইকপাড়ায় রাজবংশের আইনের পরামর্শ দাতার কার্য করিতেন।

কিন্তু প্রতিভা কখনও অনাদৃত থাকে না। কিছুকাল সামান্যসামান্য দুই চারিটা মোকদ্দমায় কার্য করিবার পর ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল—তাঁহার গভীর আইন জ্ঞান এবং মোকদ্দমা-পরিচালনের ক্ষমতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মিঃ ফার নামক একজন ইউরোপিয়ান অ্যাটর্নী একটি মামলার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন,

এবং সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ছিলেন অপর পক্ষের ব্যারিস্টার। মিঃ ফার আইনজ্ঞ ব্যক্তি। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন এরূপ ব্যক্তিকে এমন দক্ষতা সহকারে জেরা করেন যে, অন্যান্য আইনব্যবসায়ীরা এবং জনসাধারণ সকলেই বিস্ময়াভিভূত হন। এই এক মোকদ্দমাতেই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ইহার পর বড় বড় মামলায় লোকে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে এবং তাঁহার ব্যবসায় প্রসারতা লাভ করে। ক্রমে তাঁহার পসার-প্রতিপত্তি এরূপ বৃদ্ধি পায় যে গভর্নমেন্ট ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে Standing Counsel-এর পদে নিযুক্ত করেন। দুই বৎসর এই কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার পর ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত সাত মাসের জন্য তিনি অস্থায়ীভাবে Advocate General-এর পদে নিযুক্ত হন। পর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি দ্বিতীয় বার ঐ পদে নিযুক্ত হন এবং তিন মাস পরেই তাঁহাকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়।

গভর্নমেন্ট তাঁহার কার্যদক্ষতায় এতই সন্তোষ লাভ করেন যে, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে ভারত গভর্নমেন্টের Executive Council-এর ব্যবস্থা-সচিবের আসন শূন্য হইলে তৎকালী-; বড়লাট লর্ড মিন্টো সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং ভারত-সচিব লর্ড মর্লে তাহাতে সম্মত হন। ভারত-সম্রাটও ইহার অনুমোদন করেন। তদনুসারে ১৯০৯ সালের ২৩ মার্চ এই নিয়োগের সংবাদ সরকারি গেজেটে ঘোষিত হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রপ্রসন্নই সর্বপ্রথম এই পদ লাভ করেন। ১৭ এপ্রিল তিনি যখন নূতন কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন তোপধ্বনি করিয়া এই সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল। এক বৎসর এই পদে কার্য করিবার পর তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

ইহার পর তিনি আবার কলিকাতা হাইকোর্টে পূর্ববৎ ব্যারিস্টারি কার্য করিতে থাকেন। অর্থ ও সম্মান প্রচুর পরিমাণেই তাঁহার অধিগত হইতে থাকে। ইহার উপর রাজসম্মানও তাঁহার লাভ হইতে লাগিল—১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি নববর্ষের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে তিনি 'নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হয়। যুদ্ধকার্য পরিচালনের জন্য যে যুদ্ধ পরিষদ (War Council) গঠিত হয়, ভারতবর্ষ হইতে তাহাতে কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। তদনুসারে ভারত গভর্নমেন্ট স্যার জেম্‌স্ মেস্টন ও বিকানীরের মহারাজার সহিত স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে বিলাতে প্রেরণ করেন।

কিছুদিন পরে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট তাঁহাকে বাংলা গভর্নমেন্টের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য পদে নিযুক্ত করেন।

ইউরোপীয় মহাসমর শেষ হইলে সন্ধির কথাবার্তা আরম্ভ হয়। এই সন্ধি-সভায় (Peace Conference) যোগ দিবার জন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রতিনিধির সহিত স্যার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্নও সদস্যরূপে পুনরায় ইউরোপে গমন করেন।

সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে স্যার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন যখন বিলাতে গমন করেন, তখন তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে লর্ড উপাধি দিয়া বিলাতি অভিজাত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করিয়া চূড়ান্তরূপে

সম্মানিত করা হয়। এই সময় তিনি ভারত-সচিবের অফিসে অন্যতম সহকারীর পদে নিযুক্ত হন এবং পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি রূপে লর্ড সভায় আসন গ্রহণ করেন। এই উপাধিও এই পদও ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম প্রাপ্ত হন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের জন্য শাসন-ব্যবস্থা প্রণীত হয়। ভারত-সচিব মিঃ মন্টেগু[৩] এবং ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টো[৪] একত্র হইয়া এই শাসনবিধি প্রণয়ন করেন বলিয়া উহা 'মন্টফোর্ড স্কীম' নামে পরিচিত। এই আইন বিলাতের পার্লামেন্টে বিধিবদ্ধ হইলে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে উহার কার্য আরম্ভ হয়, এবং লর্ড সিংহ বিহার ও উড়িষ্যার গভর্নর নিযুক্ত হন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই পদ প্রাপ্ত হন।

কিন্তু লর্ড সিংহ দীর্ঘকাল এই সম্মান উপভোগ করিতে পারেন নাই। অচিরকাল মধ্যে তিনি শিরোঘূর্ণন রোগে আক্রান্ত হইয়া পর-বৎসর অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর হইতে শারীরিক অসুস্থতাবশত তিনি সাধারণের কার্যে আর বেশি যোগ দিতে পারিতেন না। সন ১৩৩৪ সালের ২০ ফাল্গুন (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ) তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের কর্মস্থান বহরমপুরে অকস্মাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহাবসান হয়। তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনয়নপূর্বক সৎকার করা হয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত

বাংলা গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের স্থান অতি উচ্চে। সেইজন্য প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় তাঁহাকেও "বাংলা গদ্যসাহিত্যের পিতা" বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল এবং এই সকল বিষয়ে তিনি যে-সকল মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বাংলা রচনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া প্রায় এক শতাব্দীকাল প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে।

নবদ্বীপের দুই ক্রোশ উত্তরে চুপী নামক গ্রামে এক প্রধান ও সম্ভ্রান্ত বংশে ১২২৭ সালের ১ শ্রাবণ, ইংরেজি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জুলাই, অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পীতাম্বর অতি অমায়িকস্বভাব, পরোপকারী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খিদিরপুরের পুলিশে কাজ করিতেন। অক্ষয়কুমারের জননী যথার্থই দয়াময়ী ছিলেন। অক্ষয়কুমার তাঁহার মাতাপিতার সকল সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

পঞ্চম বর্ষে অক্ষয়কুমারের 'হাতে খড়ি' হয়। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত চুপীর পাঠশালায় অক্ষয়কুমার মাতৃভাষার প্রথম শিক্ষা লাভ করেন এবং জনৈক মুনসির নিকট ফারসি ভাষা ও একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

অতঃপর তিনি খিদিরপুরে নীত হন এবং জনৈক শিক্ষকের নিকট ইংরেজি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। রীতিমত ইংরেজি শিখিবার জন্য তিনি এই সময়ে ব্যগ্র হন এবং ভবানীপুরে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক পরিচালিত 'ইউনিয়ন স্কুলে' প্রবিষ্ট হন। সেকালে এইরূপ বিদ্যালয়ে বেতন দিতে হইত না, এমন কি পাঠ্যপুস্তকও বিনামূল্যে পাওয়া যাইত। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুগণ পাছে পুত্রগণ নানা প্রলোভনে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয় এই ভয়ে এই সকল বিদ্যালয়ে তাহাদের প্রেরণ করিতে শঙ্কিত হইত। সুতরাং কিছুদিন পরে অক্ষয়কুমারকে গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে য়ুরোপীয় শিক্ষকগণের দ্বারা ইংরেজি শিক্ষা প্রদত্ত হইত বটে, কিন্তু ছাত্রগণের চরিত্র, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হইত। হার্ম্যান জেফ্রয় নামক একজন সুপণ্ডিত য়ুরোপীয় ব্যারিস্টার এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার ছাত্রগণ অনেকেই উত্তরকালে যশস্বী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শম্ভুনাথ পণ্ডিত,[১] কৃষ্ণদাস পাল, সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ[২] প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে যখন অক্ষয়কুমার প্রবিষ্ট হন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোলো বৎসর। তিনি তখনও ইংরেজি ব্যাকরণ নিয়মিত ভাবে পাঠ করেন নাই, তাঁহার ইংরেজি উচ্চারণও বিশুদ্ধ ছিল না। সেইজন্য গৌরমোহন তাঁহাকে বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণিতে ভরতি করিতে চাহেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার পঞ্চম শ্রেণিতে ভরতি হইবার জন্য কাতর প্রার্থনা করায় অবশেষে তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। অক্ষয়কুমার কঠোর পরিশ্রম সহকারে পাঠাভ্যাস করিয়া ছয় সাত মাস পরে বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। গৌরমোহন তাঁহার অধ্যবসায় ও পাঠানুরাগ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহাকে একেবারে তৃতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করিয়া দিলেন। অক্ষয়কুমার কেবল বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকই পাঠ করিতেন না, হার্মান জেফ্রয়ের সাহায্যে তিনি অনেক উৎকৃষ্ট ইংরেজি গ্রন্থ এই সময়ে পাঠ করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃদেব কাশীযাত্রা করেন এবং অর্থাভাববশত অক্ষয়কুমার বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু গৌরমোহন এরূপ প্রতিভাশালী বালককে সাহায্য করিতে চিরদিন প্রস্তুত ছিলেন, তিনি বিনা বেতনে অক্ষয়কুমারের পাঠের ব্যবস্থা করিয়া দেন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং অক্ষয়কুমার বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও অক্ষয়কুমার জ্ঞানচর্চা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসুর[৩] সাহায্যে তিনি রাজা বাহাদুরের অপূর্ব গ্রন্থাগার হইতে নানা সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক আনিয়া অহোরাত্র পাঠ করিতেন। এই সময়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তিনি পরিচিত হন এবং তাঁহার নিকট উৎসাহ লাভ করিয়া তিনি গুপ্তকবি দ্বারা সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিত আরম্ভ করেন। একখানি কাব্যগ্রন্থও তিনি লিখিয়াছিলেন।

এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভার' উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামে একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়। ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় অক্ষয়কুমার এই বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহাকে সাহিত্য, ভূগোল ও পদার্থবিজ্ঞান পড়াইতে হইত। তখন ভূগোল সম্বন্ধীয় ভাল বাংলা গ্রন্থ ছিল না। অক্ষয়কুমার এই অভাব দূরীকরণের জন্য স্বয়ং একখানি ভূগোল[৪] প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের বিশুদ্ধ রচনা পদ্ধতি দেখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উহার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। অক্ষয়কুমার প্রায় তেরো বৎসর কাল অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত এই পত্র সম্পাদন করেন। এই পত্রে তাঁহার সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সকল সন্দর্ভ বাংলা গদ্য সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়কুমার "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার"[৫] নামক দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইহার পর 'চারুপাঠ'[৬] প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ নামক দুইখানি গ্রন্থে তাঁহার অনেকগুলি সন্দর্ভ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। তিনি এতদ্‌ব্যতীত বহু বিদ্বৎসভায় বক্তৃতাদি করিতেন। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে একদিন তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার শিরোরোগের সূত্রপাত হয়; কিন্তু মাতৃভাষায় উন্নতির জন্য তিনি সামান্য বেতনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও নিজ আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করেন নাই, কিংবা সাহিত্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় নর্ম্যাল বিদ্যালয়[৭] প্রতিষ্ঠিত হইলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিলেন অক্ষয়কুমারকে ১৫০্ বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হউক। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে অক্ষয়কুমার সামান্য বেতন পাইতেন, অন্য কেহ্ হইলে এরূপ উচ্চ পদ লাভ্ করিয়া আনন্দিত হইতেন। কিন্তু তিনি আনন্দিত হইলেন না। তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষাবিভাগে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অপদস্থ হইতে হইবে ভাবিয়া তিনি এই কার্য গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পূর্বের ন্যায় লিখিতে লাগিলেন।

অক্ষয়কুমার নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াইতেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ভাল গ্রন্থ বাংলা ভাষায় তখন ছিল না। বলিয়া তিনি স্বয়ং 'পদার্থ বিদ্যা'[৮] অর্থাৎ 'জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে শিরোরোগের জন্য অক্ষয়কুমার অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তিনি নানা স্থানে স্বাস্থ্যলাভের জন্য পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বালীতে[৯] একটি উদ্যানবাটিকা নির্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এই উদ্যানবাটিকার নাম

রাখিয়াছিলেন "শোভনোদ্যান"। এই শোভনোদ্যানটি তিনি মনের মত করিয়া সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাহাতে কোনও বিলাসের উপকরণ ছিল না। বাহিরের উদ্যানে তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী নানাবিধ বৃক্ষলতাদি রোপণ করিয়াছিলেন, গৃহের অভ্যন্তরে ভূতত্ত্ববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রশিক্ষার নানাবিধ সরঞ্জাম এবং অমূল্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি সজ্জিত ছিল। এই গৃহে জ্ঞানচর্চায় অক্ষয়কুমার তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যাপন করিয়াছিলেন।

রুগ্নশরীরেও সাহিত্যসেবা করিতে অক্ষয়কুমার একদিনও বিরত হন নাই। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'চারুপাঠ'[১০] তৃতীয় ভাগ নামক মনোহর সন্দর্ভ পুস্তক প্রকাশিত করেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" ১ম ও ২য়[১১] ভাগ প্রকাশিত করেন। ভারতবর্ষের ১৮২ প্রকার উপাসক সম্প্রদায়ের যে বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার অনন্য-সাধারণ অধ্যবসায়, অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণার পরিচয় দেয়। এরূপ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আর নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে তাঁহার যশঃসৌরভ য়ুরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কোন সুস্থকায় ব্যক্তি প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় পূর্ণ এইরূপ গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখিতে পারেন কিনা সন্দেহ! ভগ্নস্বাস্থ্য অক্ষয়কুমার রোগশয্যায় শয়ন করিয়া একটু একটু করিয়া এই মহাগ্রন্থ কিরূপে রচনা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আবার ইহারই অবসরে তিনি 'ধর্মনীতি'[১২] নামক আরও একখানি সুচিন্তিত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

১২৯৩ সালের ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ইংরেজি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর দিনও সন্ধ্যাকালে তিনি নিয়মিত বায়ু সেবন করিয়া আসিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমারের অসাধারণ বিদ্যানুরাগ, অপূর্ব অধ্যবসায়, গভীর স্বদেশপ্রেম তাঁহার দেশবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক অতি বিরল।

লর্ড সিংহ
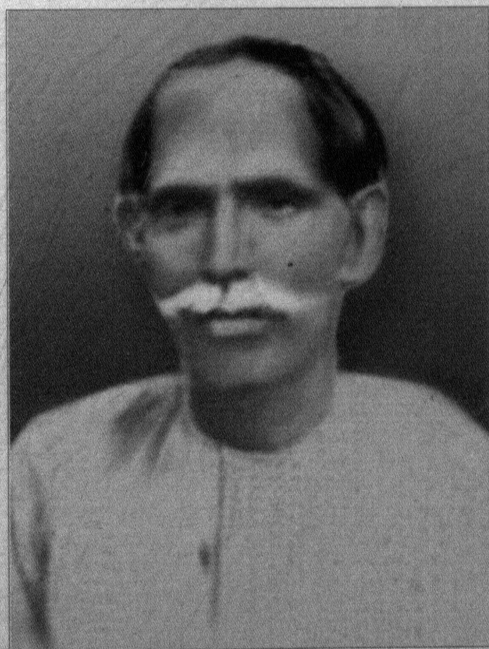
অক্ষয়কুমার দত্ত
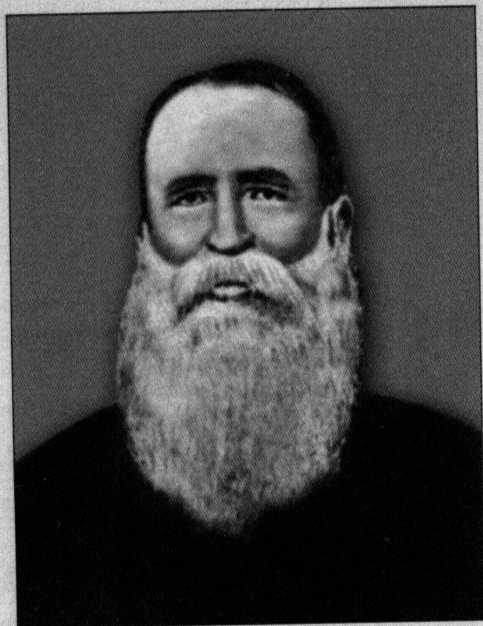
ভূদেব মুখোপাধ্যায়

নবাব বাহাদুর আবদুল লতিফ

রাসবিহারী ঘোষ

চন্দ্রনাথ বসু

বটকৃষ্ণ পাল
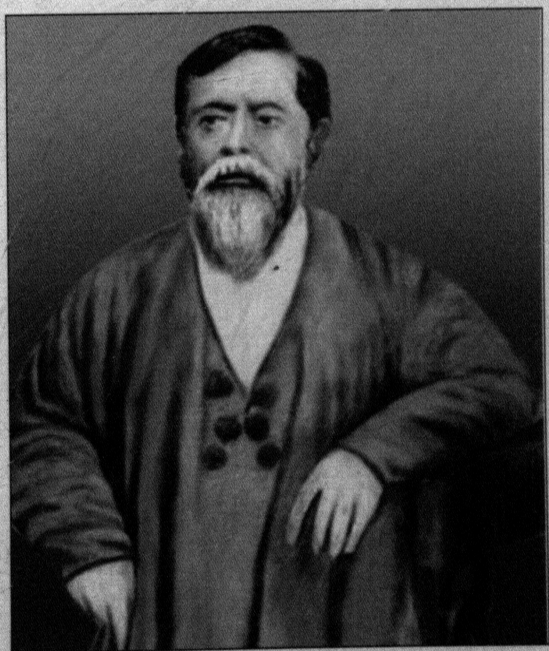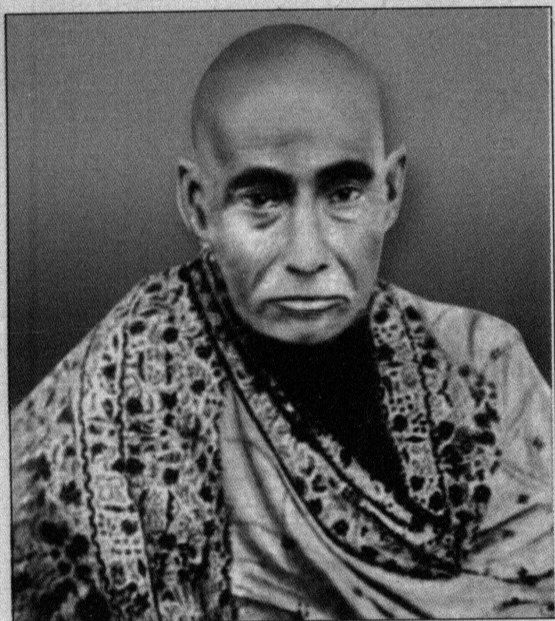
খাজে আবদুল গনি
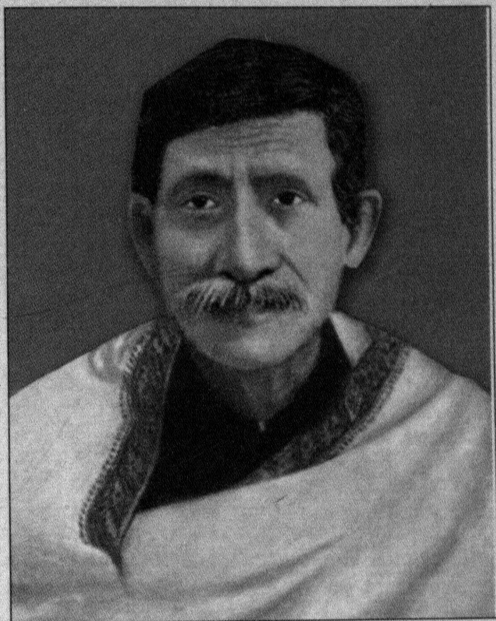
মতিলাল ঘোষ
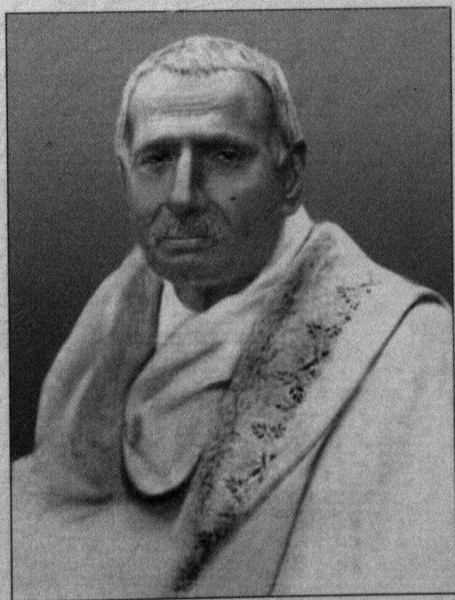
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
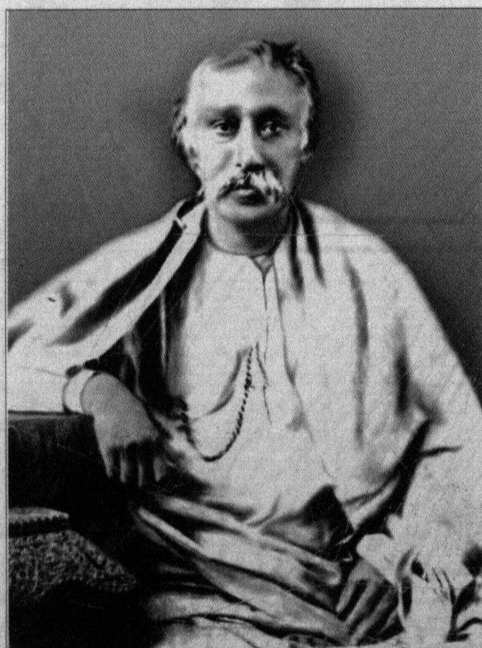
গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মহেন্দ্র লাল সরকার

রমেশচন্দ্র দত্ত
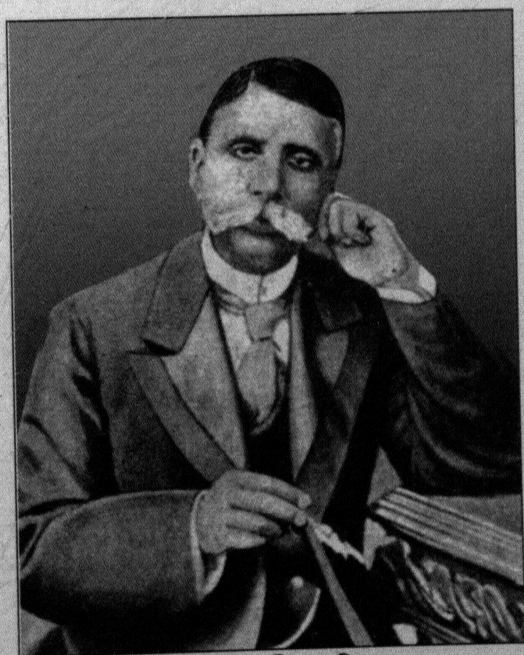
সৈয়দ আমীর আলি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
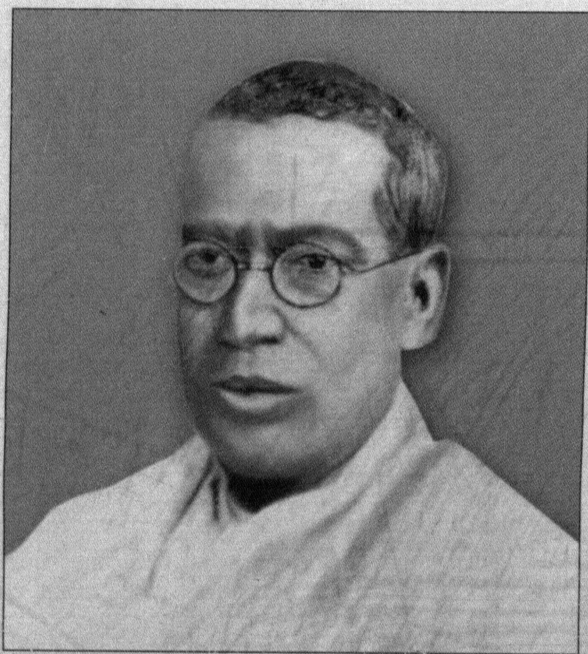
বিপিনচন্দ্র পাল
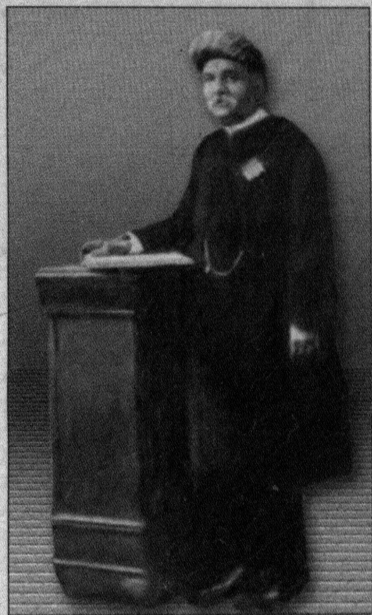
মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী
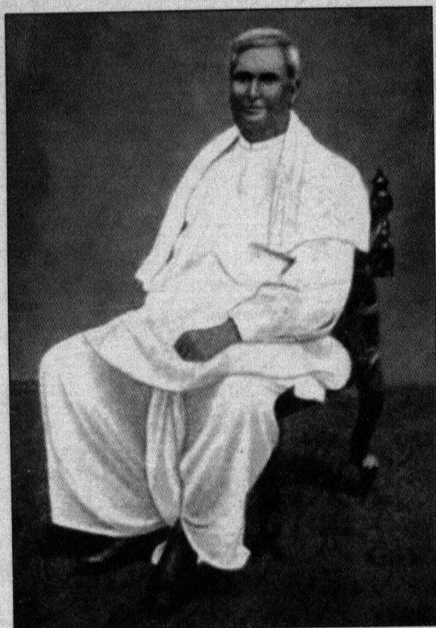
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
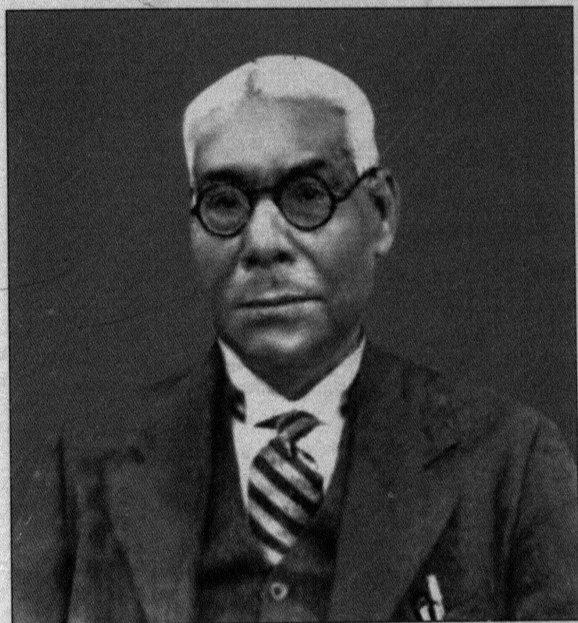
কেদারনাথ দাস
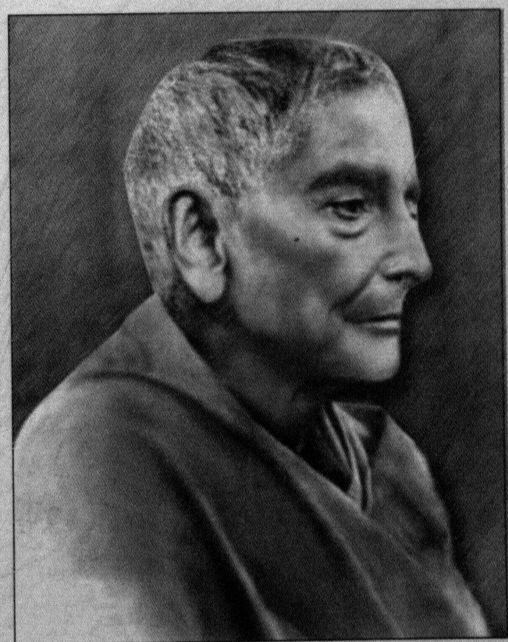
ঈশানচন্দ্র ঘোষ

মোজাম্মেল হক

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

সরলাদেবী চৌধুরাণী
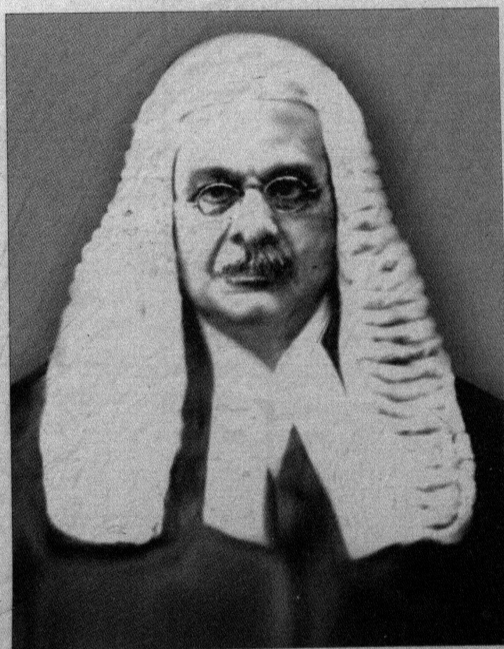
আব্‌দর রহিম

নৃপেন্দ্রনাথ সরকার
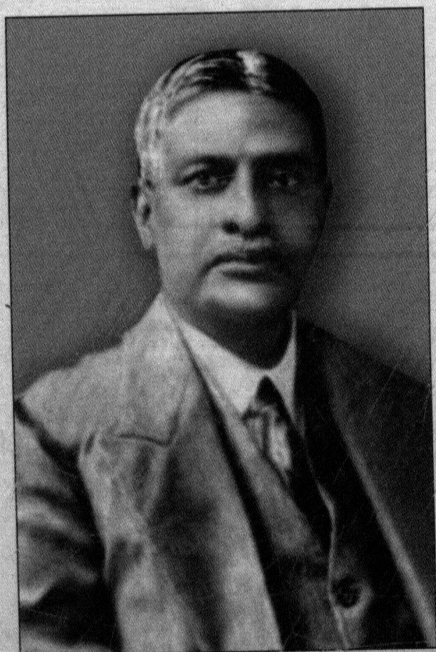
উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

মেঘনাদ সাহা

সরোজিনী নাইডু

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

যে সকল মহাপুরুষ ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করিয়াও ইংরেজি সভ্যতায় মুগ্ধ হন নাই তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই ভূদেব উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া এদেশে শিক্ষা-প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ইংরেজি শিক্ষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতা একজন খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং নিজ টোলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। ভূদেবের পিতার নাম ছিল পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ তারিখে কলিকাতায় ভূদেবের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই ইংরেজি প্রথায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ; প্রথমে কিছুকাল তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে পড়িতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ভূদেব স্কুলে পঠদ্দশাতে প্রতি বৎসর নানাপ্রকার পুরস্কারাদি লাভ করিতেন।

ভূদেব যখন কলিকাতা হিন্দু কলেজের ছাত্র তখন কলিকাতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা-প্রণালী লইয়া বিষম বিরোধ চলিতেছিল। ঐ সময়ে ভূদেবের সহপাঠী মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন; ভূদেবও অজ্ঞাতসারে ক্রমে সেই দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। পুত্রের এই ভাবগতিক দেখিয়া পিতা বিশ্বনাথ স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি পুত্রকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন যে ভূদেব কখনও অখাদ্য ভোজন বা অপেয় পান করিবেন না। পিতার এই উপদেশ তিনি সারা জীবন পালন করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে নিষ্ঠাবান হিন্দু বলিয়াই তাঁহার প্রসিদ্ধি হইয়াছিল।

হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপনের পর বহুদিন ভূদেব কোনো ভাল কাজ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সে সময়ে তিনি নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বেড়াইতেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান ভূদেবের পক্ষে কোন কার্য গ্রহণ না করিয়া এই ভাবে শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করা সম্ভবপর হইল না; তিনি সুবিধা পাইয়াই মাসিক ৫০ টাকা বেতনে গভর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই ভূদেবের শিক্ষা ও মনোবৃত্তি অনুসারী পেশা ছিল। শিক্ষকতার মধ্য দিয়া তিনি দেশসেবা করিতে প্রথম হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

কিন্তু ভূদেবের মত একজন অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষকতাই শেষ কার্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই। তাঁহার শিক্ষকতা কার্যে মুগ্ধ হইয়া গভর্নমেন্ট তাঁহাকে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে স্কুলসমূহের অতিরিক্ত পরিদর্শকের কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের

পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে উক্ত কার্যই করিতে হইয়াছিল। সে সময়ে দেশের সর্বত্র স্কুল পরিদর্শন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান এত সহজসাধ্য কার্য ছিল না। স্কুল পরিদর্শনের জন্য তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সকল স্থানেই যাইতে হইত। সে সময়ে সবেমাত্র নূতন নূতন স্কুল স্থাপিত হইতেছিল ; সেই সকল স্কুলের কার্য দেখিয়া সেগুলি যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে, ভূদেব তাহারই ব্যবস্থা করিতেন; ক্রমে তিনি স্কুল পরিদর্শন বিভাগে উচ্চতর পদ লাভ করিতে থাকেন। গভর্নমেন্ট তাঁহার কার্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে শিক্ষা বিভাগের কার্য উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য গভর্নমেন্ট ভূদেবকে একটি রিপোর্ট লিখিতে বলিয়াছিলেন; তাঁহার লিখিত রিপোর্ট সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার কার্যদক্ষতা দেখিয়া ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে তৎকালীন 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার'[১] সদস্য মনোনীত করা হইয়াছিল।

ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষাবিষয়ক যে কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হইত, তাহাই ভূদেবের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইত। এক সময়ে বাংলার শিক্ষা বিভাগের সর্বপ্রধান কর্মচারী ছুটি লইলে ভূদেবকে সেই কার্য প্রদান করা হইয়াছিল। প্রায় ৫০ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে কোনো বাঙালির পক্ষে এরূপ উচ্চপদ লাভ করা কল্পনাতীত ছিল, কিন্তু ভূদেবের কর্মপ্রতিভা গভর্নমেন্টের তৎকালীন সকল বড় বড় কর্মচারীকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে তাঁহার এই পদোন্নতিতে কেহই তখন আপত্তি করেন নাই।

শুধু প্রতিপত্তি ও সম্মানের দিক দিয়া নহে, অর্থের দিক দিয়াও ভূদেবের জীবনে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান ছিলেন; অতি অল্পেই সন্তুষ্ট থাকিতেন ; কাজেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া তিনি তাহা নানাবিধ সৎকার্যে ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি স্বীয় পিতার নামে কয়েক লক্ষ টাকা জমা রাখিয়া গিয়াছেন—তাহা হইতে এখনও সকল টোলে "বিশ্বনাথ বৃত্তি" প্রদত্ত হইয়া থাকে।

গভর্নমেন্টের 'এডুকেশন গেজেট'[২] নামক পত্রখানি পূর্বে প্যারীচরণ সরকার[২(ক)] মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইত ; সরকার মহাশয় ঐ কার্য ত্যাগ করিলে ভূদেবের উপর সে ভার অর্পিত হইয়াছিল। ভূদেব সারা জীবন উক্ত গেজেটের সম্পাদক ছিলেন এবং পরে গভর্নমেন্ট উহার স্বত্ব ত্যাগ করিলে তিনি নিজেই উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজিও এডুকেশন গেজেট ভূদেবের পৌত্রপৌত্রীগণ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে।*

ভূদেব ছাত্র ও শিক্ষকগণের উপকারের জন্য বহু সংখ্যক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত "শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব"[৩] আজিও সকল শিক্ষক কর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ছাত্রগণের জন্য তিনি 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান',[৪] 'ক্ষেত্রতত্ত্ব',[৫] ইংল্যাণ্ডের

---

* বর্তমানে লুপ্ত।

ইতিহাস',[৬] 'পুরাবৃত্তসার',[৭] 'রোমের ইতিহাস'[৮] প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'[৯] বাংলা ভাষায় অতি উপাদেয় পুস্তক। 'পুষ্পাঞ্জলি'[১০] নামক পুস্তকে তিনি তাঁহার স্বদেশপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পর এদেশের জনসাধারণকে হিন্দুধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন ; তৎকালে দেশে সংস্কৃত চর্চা হ্রাসের ফলে জনসাধারণের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র চলিত না। সেজন্য তিনি জনসাধারণের উপযোগী করিয়া নূতন স্মৃতিগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'আচার প্রবন্ধ',[১১] 'সামাজিক প্রবন্ধ'[১২] ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ'[১৩] নামক পুস্তক তিনখানি এখনও বাংলা দেশে স্মৃতিশাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী। কি ভাবে সংসারধর্ম পালন করিলে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সুখশান্তি লাভ করা যায়, ভূদেব উক্ত তিন পুস্তকে সে বিষয়ে উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে তারিখে ভূদেব পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি চুঁচুড়ায় নিজ বাটীতে পিতার নামে "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেশীয় প্রথায় চিকিৎসার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল ; সেজন্য তিনি নিজ বাটীতে একটি দাতব্য কবিরাজি চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুত্রপৌত্রগণও পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। রায় মুকুন্দদেব[১৪] তাঁহার পুত্র ছিলেন এবং এ যুগের অন্যতমা শ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী[১৫] ভূদেববাবুর পৌত্রী।

আবদুল লতিফ

ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে মেকলে, বেন্টিঙ্ক, ডাফ ও হেয়ার প্রমুখ মনীষীগণ যেমন সর্বতোভাবে স্মরণীয় ও অগ্রণী, মুসলমান সমাজেও তেমনি এ সম্বন্ধে নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর অগ্রণী ছিলেন। শুধু বাংলার মুসলমান সমাজে নহে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিষ্ঠা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

আবদুল লতিফ কাজি ফকির মহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ[১] ফরিদপুর জেলার রাজাপুর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। কাজি সাহেব কলিকাতায় দেওয়ানি আদালতে ওকালতি[২] করিতেন। তাঁহারা পুরুষানুক্রমিক কাজি।

আবদুল লতিফ ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে[৩] রাজাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি শিক্ষালাভ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া মাদ্রাসায় প্রবেশ করেন। প্রথমে আরবি-পারসি অধ্যয়নের পর ইংরেজি বিভাগ খোলা হইলে[৪] তিনি ইংরেজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে যখন কলকাতা

মাদ্রাসায়[৫] প্রথম ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হয়,[৬] তখন মুসলমান সমাজ হইতে তাহার বিরুদ্ধে রীতিমত অভিযান সৃষ্টি হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন ইংরেজশাসনের মাত্র শৈশবাবস্থা। ইংরেজি শিক্ষা কোরানানুমোদিত নহে, সুতরাং ধর্মহানিকর, এই ধারণার ঘন-কুজ্ঝটিকায় তখনও চারিদিক পূর্ণ। এই সকল বাধাবিপত্তি কাটাইয়া অল্পদিনেই মেধাবী আবদুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষায় সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার দেখাদেখি এক এক করিয়া আরও তিন চার জন মুসলমান যুবক ইংরেজি শ্রেণিতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্যালয় ছাড়িয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করিলে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমশ মুসলমান সমাজের নেতৃগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন।

প্রথম জীবনে আবদুল লতিফ ঢাকা গভর্নমেন্ট স্কুলে সহকারী শিক্ষকরূপে কার্য করেন এবং ক্রমশ কলিকাতা মাদ্রাসার আরবি ও ইংরেজি অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট[৭] পদে নিযুক্ত হন। চারি বৎসর পরে সাতক্ষীরায় বদলি হইয়া তিনি সেই স্থলের নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিষয় গভর্নমেন্টের গোচর করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করেন। তিনি এবং আরও কয়েকজন দেশীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর চেষ্টায় গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে অবহিত হন ও সার্ অ্যাস্‌লি ইডেন নীলকরদের অত্যাচার দমনের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সাতক্ষীরা হইতে তিনি হুগলি জেলার দস্যু-তস্কর-প্রপীড়িত জাহানাবাদ মহকুমায় বদলি হন। এইস্থানে পাঁচ বৎসরকাল থাকিয়া এই সকল অরাজকতা সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া তিনি বিশেষ যশস্বী হন এবং সরকারের নিকট প্রশংসা লাভ করেন। তাঁহার কার্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে আলিপুর সুবারবন পুলিশ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করা হয়।

তিনি একবার অস্থায়ীভাবে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদও লাভ করেন এবং তৎপর ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে শিয়ালদহে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটরূপে বদলি হইয়া সাত বৎসর ঐ পদে আসীন থাকিয়া ৮০০্ পর্যন্ত বেতন প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্বে কোনও দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এত অধিক বেতন পান নাই। তিনি এরূপ সুনাম অর্জন করেন যে সাহেবগণও তাঁহার নিকট হইতে সাহেব বিচারকের নিকট মামলা লইয়া যাইবার দাবি করিতেন না। তাঁহার ছত্রিশ বৎসর কার্যকালের মধ্যে তিনি মাত্র চার মাস অসুস্থতা নিবন্ধন ছুটি লইয়াছিলেন।

তাঁহার চাকুরিকালে তিনি তিন বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) সভ্য নিযুক্ত হন। ভারতের সমগ্র মুসলমান সমাজে তিনি প্রথম এই সম্মানের অধিকারী হন। লর্ড এল্‌গিন তাঁহাকে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" মনোনীত করেন।

যাঁহারা সর্বপ্রথম 'জাস্টিস্ অব্ দি পীস্'[৮] নিযুক্ত হন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার এই সম্মান কেবল কলিকাতাতেই নিবদ্ধ ছিল না—তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জন্য এই সম্মান প্রাপ্ত হন (১৮৬৫ খ্রিঃ)।

আবদুল লতিফ গভর্নমেন্টের অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তখনকার রক্ষণশীল সমাজ যে-কোনো নূতন ব্যবস্থাকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিত, কিন্তু আবদুল লতিফের মধ্যস্থতার ফলে এই বিরুদ্ধভাব প্রশমিত হইত। মুসলমান ওয়াহাবি সম্প্রদায় একবার গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য আরম্ভ করে (১৮৭০ খ্রিঃ)। আবদুল লতিফ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ-ইস্তাহার ও সভাসমিতির দ্বারা তাহার প্রতিরোধ করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সহিত সার্ভিয়া প্রমুখ রাজ্যগুলির মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষের মুসলমানগণের তুরস্কের পক্ষে আন্দোলন ক্রমশ এক সমস্যার সৃষ্টি করায়, আবদুল লতিফ তাঁহার স্বজাতীয়গণকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিতে ও চাঁদা দ্বারা তুরস্ককে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া নানাস্থানে আলোচনাদি আরম্ভ করেন। তাঁহার এই দূরদর্শী আন্দোলন ভারতসরকার ও তুরস্কসরকারকে প্রভূত সাহায্য করে এবং তুরস্কসুলতান তাঁহাকে এতদুপলক্ষে সম্মান-সূচক উপাধি প্রদান করেন (Order of Medjidi)।

এতদিন অবধি আবদুল লতিফ মৌলবি হিসাবেই পরিচিত হইতেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির দরবারে মহাসম্রাজ্ঞীর ঘোষণাবাণী উপলক্ষে তিনি "Empress" পদক ও খাঁ বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার টাউনহলে মুসলমান সাহিত্য সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ছোটলাট স্যার্ বিডন গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে প্রকাশ্য ধন্যবাদ ও একখানি স্বর্ণপদক উপহার দিয়া সম্মানিত করেন। ঐ সভাতে বড়লাট স্যার্ জন্ লরেন্স প্রেরিত শিক্ষাবিস্তারকল্পে তাঁহার এই অক্লান্ত চেষ্টার উল্লেখলিপি ও এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকার সম্পূর্ণ গ্রন্থ তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদত্ত হয়।

মুসলমান সাহিত্য সমিতি (Mohammedan Literary Society) তাঁহার প্রকাণ্ড কীর্তি। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার গৃহে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। তদবধি নানাস্থানে ইহার শাখাসমিতি স্থাপিত হইয়া মুসলমান সমাজের সর্ববিষয়ে আলোচনার কেন্দ্র হইয়া উঠে।

বিলাতের হাউস অব্ কমন্স হইতে ভারতের অর্থ ও রাজস্ব সম্বন্ধে একটি তদন্ত-কমিটি গঠিত হয় (১৮৭৮ খ্রিঃ)। বড়লাট লর্ড লরেন্স, আবদুল লতিফকে ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতিনিধি হিসাবে সাক্ষ্য-প্রদানকল্পে বিলাত যাইতে অনুরোধ করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই সে পার্লামেন্ট ভাঙিয়া যাওয়ায় এ বিষয়ে আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

ইহার দুই বৎসর পরে তিনি নবাব এবং আরও একবৎসর পরে সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে নবাব বাহাদুর—এই শ্রেষ্ঠ উপাধি প্রদান করেন।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপন আন্দোলনে আবদুল লতিফ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। মহম্মদ মহ্সীন ফন্ডের অর্থ যাহাতে মুসলমানগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ব্যয় হয় তদ্‌বিষয়ে তিনি গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও তাহার ফলে

এই ফন্ডের বহু সংস্কার[৯] সাধিত হয়। তখন হইতে বাংলার যে-কোনো স্থানে মুসলমান ছাত্রকে স্কুলের বা কলেজের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ ঐ ফান্ড হইতে অদ্যাবধি দেওয়া হইতেছে। এই ফন্ডের সাহায্যে রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভূপাল রাজ্যের মন্ত্রিত্ব[১০] গ্রহণ করেন। রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা তখন বড়ই সঙিন ও সঙ্কটপূর্ণ ছিল। তথাপি তিনি যখন তাঁহার কর্তব্য শেষ করিয়া কয়েক মাস পরে ফিরিয়া আসিলেন তখন বেগমসাহেবা হইতে সেখানকার সকলেই এবং ভারত-সরকারও তাঁহার দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এইস্থানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, মাত্র একদিনের বিজ্ঞাপনে এইরূপ কার্যের ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপভাবে এই দুরূহ কার্য গ্রহণ আবদুল লতিফের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন;[১১] তাঁহার মৃত্যুতে দেশ শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়। নানাস্থানে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশবিদেশের সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কার্যাবলি প্রকাশিত হয়। বিলাতের 'টাইমস্' পত্রও দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। বাংলার লাট লর্ড কার্‌মাইকেল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার প্রতিমূর্তি উন্মোচন করেন। তদুপলক্ষে দেশের সমগ্র নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলমান, পারশি, জৈন, খ্রিস্টান, দেশীয় বিদেশীয়, সকলে তাঁহার আত্মার প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্ত কর্মীকে দেশ কখনই ভুলিতে পারিবে না।

রাসবিহারী ঘোষ

স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণি হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহার পরই ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করা যে কি ক্ষমতাসাপেক্ষ তাহা অনুমান করিতে পারিলে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন যে রাসবিহারী ঘোষ কি উপাদানে গঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্মজীবন যে কি ভাবে গঠিত হইবে, ছাত্রজীবনের এই ঘটনাই তাহা সুস্পষ্টরূপে সূচিত করিয়াছিল।

বি. এ. পরীক্ষার ফল খুব ভাল হইবে না মনে হইয়াছিল। বহুদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিবার ফলে ভালরূপ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ তিনি পান নাই। মাঝে মাঝে যতদূর প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিলেন তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এবং পরীক্ষার সতেরো দিন মাত্র পূর্বে আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল ; পরে দেখা গেল যে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন!

আবার ইহার ঠিক এক বৎসর পরে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রেণির অনার্স

সহ এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর বৎসরই আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

প্রতিভা যাঁহাকে আশ্রয় করে, কার্যকুশলতা তাঁহার শতমুখী হয় ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যুবক রাসবিহারী সবেমাত্র হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছেন, মক্কেলকুল তখনও তাঁহার বক্তৃতার মধু-চক্রে আকৃষ্ট হয় নাই অথবা আইনের কূট তর্কজালে আবদ্ধ ও হয় নাই, সুতরাং পসার প্রতিপত্তি তখনও বহুদূরে। এমনি সময়ে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি বিখ্যাত স্যার বার্নস্ পিককের[১] এজলাসে বিনা পয়সায় যুবক রাসবিহারী একটা মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার সওয়াল জবাবের পর প্রতিপক্ষীয় উকিল সওয়াল জবাব করিতে উদ্যত হইলে, স্যার বার্নস্ পিকক রাসবিহারীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করেন যে, এই যুবকের এমন সুন্দর ভূমিকা ও অত্যুৎকৃষ্ট সওয়াল জবাবের পর তাঁহার আর কিছু বলিবার আছে কি? ইহাতে হাইকোর্টময় একটা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। সময়সাপেক্ষ হইলেও রাসবিহারীর ভবিষ্যৎ অর্গলমুক্ত হয়। ইহাই রাসবিহারীর প্রথম জীবনের উন্নতির আভাস।

ভারতের নব জাগরণের যুগে ঘুমন্ত জাতির নিদ্রাভঙ্গের সূচনায় যে কয়জন পুরুষসিংহ ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হন, রাসবিহারী তাঁহাদেরই অন্যতম। বাংলার জ্যোতিষ্কমণ্ডলের তিনি এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। অগণিত প্রাণের মধ্যে তিনি এক মহাপ্রাণ। জাতির প্রাণের গান তাঁহার অন্তরের তন্ত্রীতে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাই দেখা যায় তাঁহার সমগ্র জীবন একটা কঠোর সাধনা।

স্থির, গম্ভীর, অকুতোভয়, কর্তব্যনিষ্ঠ রাসবিহারী কাহারও ভ্রূকুটি, লোকনিন্দা বা বিরুদ্ধবাদীগণের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ প্রভৃতিতে সর্বদাই অবিচলিত ছিলেন। আইন-অধ্যাপনায়, আইন-প্রণয়নে বা আইন-ব্যবসায়ে কিংবা শিক্ষা-বিস্তারে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে জাতির হিতসাধনে ও প্রকৃত বদান্যতায় ধীরপ্রতিজ্ঞ রাসবিহারী ইতিহাসে অতুলনীয়।

অথচ স্যার রাসবিহারী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান ছিলেন। সুবৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামের ঘোষ পরিবারে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গত জগদ্বন্ধু ঘোষ এবং পিতামহ স্বর্গত পীতাম্বর ঘোষ। পিতামহীর নিকট তিনি অধিকতর আদর পাইতেন। কোন এক ঘটনায় পিতামহী পরিবারবর্গের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া রাসবিহারীকে লইয়া তাঁহার পিত্রালয় তোড়কনা গ্রামে চলিয়া যান। কাজেই গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন তাঁহার অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কয়েকমাস পিতামহীর নিকট থাকিবার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে বর্ধমানে লইয়া গিয়া রাজ কলেজ-স্কুলে ভরতি করিয়া দেন। এই সময় হইতে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইতে থাকে। তিনি প্রায়ই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে থাকেন।

তাঁহার পিতা পুলিশ কর্মচারী ছিলেন ও বদলি উপলক্ষে ইনস্পেকটার হইয়া বাঁকুড়ায় গমন করিলে রাসবিহারী তত্রত্য উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভরতি হন। তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়ন কালে দেখা যায় সেবার প্রথমশ্রেণি হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী তেমন কেহ ছিল না। স্কুল কর্তৃপক্ষ রাসবিহারীর অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই

সে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সম্মানের সহিত পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের এম. এ। আইন পরীক্ষার পর ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি আইনের কঠিন অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও তাহার চারি বৎসর পরে 'ঠাকুর ল' লেকচারার নিযুক্ত হন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার বক্তৃতাদি পরে 'ব্রিটিশ ভারতে বন্ধকী আইন'[২] নামে প্রসিদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাতে যে কয়েক সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হন তাহার সমস্তই তিনি কয়েক বৎসর সরস্বতী পূজায় ব্যয় করেন।

স্যার রাসবিহারী ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ডি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য যাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। পরে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হন। ব্যারিস্টার না হইলেও আইন ব্যবসায়ে তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জন করেন তাহা বহু ব্যারিস্টার আজীবন পরিশ্রম করিয়াও করিতে পারেন নাই। তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে 'বাঁটোয়ারা আইন' ও 'জাজমেন্ট ডেটার্স আইন' প্রণয়ন করিয়া ভারতের মহৎ উপকার সাধিত করেন। লবণ-শুল্ক রহিত, দুর্ভিক্ষ নিবারণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার এবং অন্যান্য নানাবিধ বিল উপলক্ষে তিনি যে তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক সময়ে তাঁহাকে অনেকের অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়। কর্তব্য হিসাবে তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উপলক্ষে লর্ড কার্জনের এশিয়াবাসীকে আক্রমণ সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট উত্তরে তাঁহার তেজস্বিতার অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। স্যার গোপালকৃষ্ণ গোখেল মহাশয়ের[৩] অনুরোধে সুরাটে জাতীয় কংগ্রেসের অধিনায়কত্ব করিতে তিনি স্বীকৃত হন, কিন্তু অন্য এক দল তিলক মহাশয়কে সভাপতি করিবার চেষ্টায় বিফল হওয়ায় এক গোলমালের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে সেবারকার অধিবেশন পণ্ড হয়। পর বৎসর মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে মাদ্রাজবাসিগণেব অনুরোধে স্যার রাসবিহারী তাহাতে সভাপতিত্ব করেন।

স্যার রাসবিহারীর ভাষাজ্ঞান, বিশেষত ইংবেজি, যেমন অতুলনীয় ছিল তাঁহার আইনজ্ঞানও ছিল তদ্রূপ। শুধু ভারতীয় আইন নহে, জগতের নানা দেশের আইন সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধু আইনজ্ঞই ছিলেন না, আইন প্রণয়নকারী হিসাবেও তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

স্যার রাসবিহারী এম্. এ. ডি. এল্ ইত্যাদি ছাড়াও বহু উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে সি-আই-ই, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সি. এস.আই. এবং ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে নাইট উপাধি লাভ করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকে প্রস্থান করেন।

রাসবিহারী যেমন প্রভূত অর্থার্জন করিয়াছিলেন তেমনি দানেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার অগাধ দান বর্ণনায় আবদ্ধ করা যায় না। সে দান তাঁহার অন্তরের গভীরতায় নিহিত ছিল। আজীবন অকাতরে তিনি এত অধিক দান করিয়া গিয়াছেন যাহার কোন ইয়ত্তা নাই। তাঁহার দান গ্রহীতা ভিন্ন অপর কেহ জানিতে পারিত না। তিনি নিজেও দান করা ছাড়া পরে তাহার কোনো হিসাব রাখিবার আবশ্যক বোধ করেন নাই।

স্বধর্মে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং সে বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছিল। শোনা যায় প্রথম যৌবনে তিনি একবার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা করেন ও কিছু পরে সিংহলে উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণেচ্ছু হন। তিনি ছিলেন সন্ধানী, তাই বিভিন্ন মার্গে সত্যের সন্ধান করিবার বাসনা তাঁহার মনে জাগ্রত হয়; কিন্তু শেষ বয়সে প্রকৃত হিন্দুরূপেই শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রীদিগের জন্য তিনি মাতৃনামে "পদ্মাবতী পদকে"র ব্যবস্থা করেন। জননীর মৃত্যুকালে তাঁহার দর্শন না পাওয়ার দুঃখ তাঁহার মনে চিরদিন ছিল। তাই মেদিনীপুরের কাঁসাই নদীর তীরে জননীর চিতাপার্শ্বে "পদ্মাবতী শ্মশানঘাট" নির্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহারই নামে নিজগ্রামে পুষ্করিণী ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ধমানে যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় তখন তিনি শিমলায়। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় তিনি শিমলা হইতে বহুকষ্টে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। যে স্থানে দাহ সম্পাদিত হয় তথায় তিনি তাঁহার পিতার নামে সুন্দর চিমনিযুক্ত শ্মশান নির্মাণ করাইয়া দেন।

সকল যুবকই উকিল, ডাক্তার, চাকুরিজীবী হইলে দেশ চলিতে পারে না। ব্যবসায় ও শিল্প দেশের পক্ষে আবশ্যক। এই হেতু বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন ও ব্যারিস্টার টি. পালিত মহাশয়ের অনুরোধে তিনি তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। নানা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। জাপান হইতে বাঙালি যুবক দেশলাই প্রস্তুত শিখিয়া আসায় তিনি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া এক কারখানা প্রস্তুত করিয়া তাহাদের হাতে তাহার ভার অর্পণ করেন।

তোড়কনা গ্রামে রাসবিহারী পিতামহীর নামে একটি পুষ্করিণী ও পিতার নামে একটি স্কুল স্থাপিত করেন। তাঁহার উইলে আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী, আশ্রিত ও প্রতিপালিত সকলেরই যথোচিত ব্যবস্থা হয়। দেবসেবা প্রভৃতির জন্য তিনি নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেন। তিনি জগদ্বন্ধু স্কুলের জন্য নগদ একলক্ষ টাকা দেন ও দরিদ্র নারায়ণ সেবায় যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। আইন পুস্তক ছাড়া তাঁহার সমস্ত গ্রন্থাগার তিনি জগদ্বন্ধু স্কুলকে দিয়া গিয়াছেন।

যাদবপুর টেকনিক্যাল্ স্কুলের জন্য যে সম্পত্তি তিনি দান করেন তাহার মূল্যও বড় কম নহে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার স্বর্গত টি. পালিত[৪] মহাশয় তাঁহার বাড়িঘর প্রভৃতি ও প্রায় বারোলক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করেন, কিন্তু তাহা যথেষ্ট না হওয়ায় স্যার রাসবিহারী তথায় প্রথমে দশলক্ষ টাকা ও পরে এগারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা দান করেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার দান এক লক্ষ টাকা এবং কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে[৫] পঞ্চাশ হাজার টাকা।

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দেশে মানুষ তৈয়ারি করা। তাহার জন্য তিনি তাঁহার যথাসর্বস্ব দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহার এই মহান ত্যাগে মানুষ তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে আজিও স্মরণ করিয়া থাকে।

চন্দ্রনাথ বসু

বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ-যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-সূর্যের চতুর্দিকে যে কয়টি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিয়া বাংলার সাহিত্যাকাশ অপূর্ব আলোকে জ্যোতির্ময় করিয়াছিল, তন্মধ্যে চিন্তাশীল লেখক ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু অন্যতম।

১২৫১ বঙ্গাব্দের ১৭ ভাদ্র শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে চন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন (১৮৪৪ খ্রিঃ)[১]। তাঁহার পিতা সীতানাথ ও পিতামহ কাশীনাথ[২] উভয়েই স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন এবং চন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাচীন হিন্দু আদর্শের পরম অনুরাগী হইয়াছিলেন ; পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন রাখিতে পারে নাই।

পঞ্চম বর্ষে যথারীতি হাতে-খড়ি হইবার পর তাঁহাদের বাটীতে অবস্থিত পাঠশালায় চন্দ্রনাথ উদয় নামক এক গুরুমহাশয়ের নিকট নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। আট বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলকাতায় লইয়া আসেন এবং জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ছয়মাস মাত্র এই বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার পর তিনি গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শাখা-বিদ্যালয়ে[৩] প্রবিষ্ট হন। এনট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্বে তিনি শাখা বিদ্যালয় হইতে মূল বিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন। তখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারির মূল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু[৪] মহাশয়ের পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু[৫] মহাশয়। চন্দ্রনাথ ইহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার সহপাঠীরা প্রথমে তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়াছিল এবং নানা বিদ্রুপাত্মক গান রচনা করিয়া তাঁহাকে খ্যাপাইত ; কিন্তু শীঘ্রই তাহারা তাঁহার গুণের পক্ষপাতী ও অনুরাগী হইয়াছিল।

বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট একটি ছাত্রসভা ছিল—তাহার নাম ওরিয়েন্টাল ডিবেটিং ক্লাব। চন্দ্রনাথ এই সভায় ইংরেজি প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন এবং তর্কবিতর্ক করিতেন।

বাল্যকালে চন্দ্রনাথ অঙ্কে ও বাংলায় বড় কাঁচা ছিলেন। সেইজন্য ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কোনোপ্রকারে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে কেরানিগিরিতে নিযুক্ত করাইয়া দিবেন এরূপ সংকল্প করেন, কারণ মাসে দশ টাকা বেতন দিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দিবার অবস্থা তাঁহার ছিল না। কিন্তু এই সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ অ্যাটকিনসন সাহেব[৬] ওরিয়েন্টাল সেমিনারির স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ হরেকৃষ্ণ আঢ্য মহাশয়কে লিখিয়া

পাঠাইলেন যে তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারি হইতে উত্তীর্ণ একটি বালককে একটি বৃত্তি দিবেন। চন্দ্রনাথ এই বৃত্তি লাভ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই স্থানে তিনি বাংলার আর্নল্ড প্যারীচরণ সরকার, অধ্যাপক কাউএল প্রভৃতি বিচক্ষণ অধ্যাপকগণের নিকট ইতিহাস পাঠ করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে এফ. এ পরীক্ষায় চন্দ্রনাথ পঞ্চম স্থান অধিকার করেন—প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালেও সেখানে ছাত্রদের সভায় চন্দ্রনাথ ইংরেজি প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠ করিতেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণিতে পাঠ করিবার সময় তাঁহার সহপাঠী (পরে নিজাম রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ) মৌলবি সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামির[৭] সহযোগিতায় 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন' নামে একখানি ইংরেজি মাসিক পত্র বাহির করিতেন। কাগজখানি পনেরো মাস চলিয়াছিল। প্যারীচরণ সরকার মহাশয় উক্ত পত্র সম্পাদনে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং স্বীয় মুদ্রাযন্ত্রে উহা মুদ্রিত করিয়া দিতেন। সংসারানভিজ্ঞ বালক-সম্পাদকগণের কাজে বিশৃঙ্খলার জন্য যথারীতি মূল্য আদায় হইত না এবং প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের ছাপাখানার প্রায় চারিশত টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল। সরকার মহাশয় উহার জন্য কখনও পীড়াপীড়ি করেন নাই এবং প্রফুল্লচিত্তে এই ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন।

এই মাসিক পত্রে On the Importance of the Study of History অর্থাৎ ইতিহাস আলোচনার উপকারিতা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ যে একটি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ইংলিশম্যান পত্র প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে উহা একজন দেশীয় লেখকের রচনা হইতে পারে না।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বি. এ পরীক্ষা দিয়া চন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করেন; স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও অধ্যাপক ব্লকম্যান সাহেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রনাথ ইতিহাসে এম. এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বৎসরই এম. এ পরীক্ষায় স্যার রাসবিহারী ইংরেজিতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান এবং কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শন-শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রনাথ বি. এল পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় রাসবিহারী প্রথম এবং চন্দ্রনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

অতঃপর চন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের উকিলশ্রেণিভুক্ত হন। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ হেনরি উড্রোর নিকট কর্মপ্রার্থী হইলেন। উড্রো সাহেব অত্যন্ত সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া কটক কলেজে দুইশত টাকা বেতনের অধ্যাপকের পদ তাঁহাকে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, "আমি যদি তোমার পিতা হইতাম তাহা হইলে এ বিভাগে আসিতে তোমাকে নিষেধ করিতাম—এ বিভাগে কাহারও কিছু হয় না।" এই সময়ে চন্দ্রনাথ কৃষ্ণদাস পালের সুপারিশে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের একটি পদ পাওয়াতে তাঁহাকে অধ্যাপকতায় প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথকে, বলিয়াছিলেন "ডেপুটির পদে যাইতেছ যাও, কিন্তু

টিকিতে পারিবে না।" হইলও তাহাই। ঢাকার কর্মস্থলে চন্দ্রনাথ পুলিশের কোন অন্যায় ব্যবহারে প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহার মত সমর্থন করিলেন না। ছয়মাস ডেপুটিগিরি করিয়া চন্দ্রনাথ কার্যে ইস্তফা দিলেন।

অতঃপর চন্দ্রনাথ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের[৮] অনুরোধে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। তখন রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[৯] প্রকৃত পক্ষে জয়পুরের রাজা; তিনি চন্দ্রনাথকে কিছুদিন পরে শাসন-বিভাগে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং" বঙ্গের বাঙালি চন্দ্রনাথের জয়পুর ভাল লাগিল না ; তিনি ছুটি লইয়া জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। ছুটির মধ্যেই বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট লাইব্রেরির অধ্যক্ষ ললার সাহেবের মৃত্যু হইল। চন্দ্রনাথের পরম হিতৈষী কৃষ্ণদাস পাল সেই কর্মের জন্য শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ সার্ আলফ্রেড ক্রফ্‌টের[১০] নিকট দরখাস্ত করিতে পরামর্শ দিলেন। কৃষ্ণদাস পাল পূর্বেই ক্রফট্‌কে বলিয়া রাখিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর তারিখে ঐ কর্ম পান।[১১] পদের বেতন ছিল মাত্র ২০০্ হইতে ২৫০্ ; উহা চন্দ্রনাথের প্রতিভার উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু স্বল্পে সন্তুষ্ট চন্দ্রনাথ উহাতেই সুখী হইয়াছিলেন।

মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের[১২] স্বর্গারোহণ ঘটিলে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি তারিখে চন্দ্রনাথ বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। সতেরো বৎসর এই শ্রমসাধ্য দায়িত্বপূর্ণ কার্য সুসম্পাদিত করিয়া ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ৩৫ বৎসর বয়সে কর্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাঁহার ১৭৫্ টাকা মাত্র পেনশন প্রাপ্য হয়। কিন্তু উহা অত্যন্ত অল্প বোধ হওয়ায় সেক্রেটারি অব স্টেটের বিশেষ অনুমতি লইয়া তাঁহাকে অতিরিক্ত পেনশন দেওয়া হইয়াছিল।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ছাত্রাবস্থায় চন্দ্রনাথ বাংলায় কাঁচা ছিলেন। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি আচার্য ঁকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের[১৩] নিকট কিছু বাংলা (পাঠ্য না হইলেও) ও কিছু সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার দিনে ইংরেজি রচনার দ্বারাই বাঙালি যুবকগণ যশোলাভের চেষ্টা করিতেন; চন্দ্রনাথও প্রথমে বয়সে ইংরেজি রচনাতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, যখন বি. এ পাশ করেন নাই তখন হইতেই ঁগিরিশচন্দ্র ঘোষের "বেঙ্গলি" কাগজে ইংরেজি প্রবন্ধ লিখিতেন। এম. এ পাশ করিয়াই তিনি "On the Life and Character of Oliver Cromwell"[১৪] নামক একটি প্রবন্ধ ছাপাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত হিন্দু প্যাট্রিয়টে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত উহার একটি সুদীর্ঘ প্রশংসাসূচক সমালোচনা বাহির হইয়াছিল।

এ পর্যন্ত চন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় কোনোও প্রবন্ধ লেখেন নাই। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন"[১৫] প্রচারিত করিয়া শিক্ষিত বাঙালিকে বাংলায় মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য যদিও আহ্বান করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রনাথ সানন্দে ও সাগ্রহে মাতৃভাষার উন্নতির জন্য বন্ধু বঙ্কিমের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা লক্ষ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু বাংলায় লিখিতে সাহসী হন নাই। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট লাইব্রেরির অধ্যক্ষ পদে

বৃত হইয়া তিনি বাংলা গ্রন্থাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে এবং "কলিকাতা রিভিউ"[১৬] নামক সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈমাসিক গ্রন্থগুলির ইংরেজি ভাষায় সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সমালোচনা পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথকে বাংলায় লিখিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন "বঙ্গদর্শন" বঙ্কিমের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের[১৭] হাতে। চন্দ্রনাথ ১২৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে বঙ্গদর্শনে "অভিজ্ঞান শকুন্তল"[১৮] এর ধারাবাহিক আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই প্রবন্ধ রচনার পূর্বে রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন[১৯] মহাশয়ের সহিত, শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়ছিলেন। চন্দ্রনাথের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' সুধীসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল।

চন্দ্রনাথ উদার ও স্নেহময় পিতা ছিলেন। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্যও আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি অমায়িক, বিনয়ী, কর্তব্যপরায়ণ, স্বাধীনচিত্ত ও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের তিনি অকৃত্রিম অনুরাগী ও একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বাস্তবিকই তিনি বঙ্গসাহিত্যকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা অমূল্য। ১৩১৭ সালের ৬ আষাঢ় তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে কখনও তাহা পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ।

বটকৃষ্ণ পাল

অতি দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও মানুষ নিজ চেষ্টা ও কর্মশক্তির দ্বারা যে প্রচুর অর্থ ও প্রভূত সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা বাংলার অন্যতম ব্যবসায়ীপ্রবর স্বর্গত বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের জীবনকথা আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে গন্ধবণিক[১] জাতীয় পাল উপাধিধারী কোনো ব্যক্তি ব্যবসায় উপলক্ষে হাওড়ায় আসিয়া শিবপুরে বাস করিয়াছিলেন। সেই বংশে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে[২] স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ পাল ও মাতার নাম শ্যামাসুন্দরী। অতি অল্প বয়সেই বটকৃষ্ণ মাতৃপিতৃহীন* হন। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। কাজেই তাঁহার ভাগ্যে বিদ্যাশিক্ষা করা হয় নাই। পাঠশালায় তিনি অতি সামান্য মাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বারো বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার মাতুল রামকুমার দে মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন হইতে তাঁহাকে অর্থার্জনের চিন্তা করিতে হয়। কলিকাতায় নূতনবাজারে রামকুমারের একখানি মশলার দোকান[৩] ছিল; ঐ দোকানেই বটকৃষ্ণের কর্মজীবনের হাতেখড়ি আরম্ভ হয়। কিন্তু মাতুলের দোকানখানি ছোট ছিল বলিয়া অধিক দিন তথায় তাঁহার মন টিকিল না। তিনি ১৬

* মাতাপিতৃহীন শুদ্ধ প্রয়োগ।

বৎসর বয়সে মাতুলের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইলেন ও একটি অহিফেনের দোকানে[৪] কাজ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাও ভাল না লাগায় তিনি বৈদ্যবাটীর হাটে পাটের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেই সময় একবার নৌকাডুবি হইয়া তিনি জলমগ্ন হন, দৈবকৃপায় কোনো প্রকারে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। সেই দুর্ঘটনার পর বরাহনগর নিবাসী রাধানাথ পালের সহিত একযোগে তিনি কলিকাতায় খেংরাপটিতে একখানি মশলার দোকান খুলেন। সেই সময়ে পটলডাঙা নিবাসী গোলোকচন্দ্র নাগের কন্যা গৌরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বিবাহের পর হইতেই ভাগ্যদেবীও তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। তিনি রাধানাথ পালের সহিত ব্যবসায় সংশ্রব ত্যাগ করিয়া মাধবচন্দ্র দাঁর সাহায্যে কলিকাতায় ১২১নং খেংরাপটিতে নিজেই একখানি মশলার দোকান খুলেন। সেই দোকান পরিচালনায় বটকৃষ্ণের অপূর্ব ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মাধবচন্দ্র দাঁ বটকৃষ্ণকে তাঁহার ব্যবসায়ের অংশী করিয়া লইয়াছিলেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইতে থাকে ও ১২৬৫ সালে তিনি ১২২নং খোংরাপটিতে একটি ঘর ভাড়া লইয়া বটকৃষ্ণ পাল এন্ড কোম্পানি নাম দিয়া একটি বিলাতি ঔষধের দোকান খুলেন। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির মূল হইয়া দাঁড়ায়। সে সময়ে ইংরেজ পরিচালিত ঔষধের দোকানসমূহেই শুধু বিলাতি ঔষধ বিক্রীত হইত। বটকৃষ্ণ কখনও খরিদ্দারদিগকে ঠকাইতেন না ও অতি অল্পমাত্র লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া ঔষধ বিক্রয় করিতেন; সেই জন্য তাঁহার দোকানে খরিদ্দারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূতনাথ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পিতার কারবারে যোগদান করেন ও অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে তাঁহাদের অপূর্ব সাফল্য লাভ ঘটে।

বর্তমানে বনফিল্ডস্ লেনে যে সাতখানি বাটীতে[৫] তাঁহাদের ব্যবসায় চলিতেছে, তাহার আরম্ভ ঐ ভাবে একটি ক্ষুদ্র ঘরেই হইয়াছিল। সততার কথা রাষ্ট্র হওয়ায় ইউরোপ ও আমেরিকার সকল খ্যাতনামা ঔষধ-বিক্রেতারাই বটকৃষ্ণ পাল এন্ড কোম্পানিকে তাঁহাদের এজেন্ট নিযুক্ত করেন এবং এইরূপে তাঁহাদের নাম চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্রমে তাঁহারা এদেশে ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাদের দমদমাস্থ সুবৃহৎ বাগানবাটীতে[৬] একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু দেশীয় গাছগাছড়ার চাষ করিয়া ঔষধ প্রস্তুতের কার্য করিতে আরম্ভ করেন। ম্যালেরিয়ার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা একদিকে যেমন যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই তদ্দ্বারা দেশেরও যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। এখনও প্রতি রবিবার তাঁহাদের শোভাবাজারস্থ বাসগৃহ এবং দমদমাস্থ বাগানবাটী হইতে ম্যালেরিয়ার ঔষধ বিতরিত হইয়া থাকে। অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কোম্পানি কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান এবং কবিরাজি ঔষধের দোকানও[৭] প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভূতনাথ পাল ও মধ্যম হরিপদ পাল পরলোকগত হইয়াছেন· তৃতীয় পুত্র স্যার হরিশঙ্কর পাল ও চতুর্থ পুত্র হরিমোহন পাল এখনও প্রত্যহ তাঁহাদের ব্যবসায়

পরিদর্শন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কার্যের সুবিধার জন্য তাঁহাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিকে লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করা হইয়াছে।

বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় শুধু অর্থার্জন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তিনি অর্থের সদ্‌ব্যবহারেও সর্বদা অবহিত থাকিতেন। তিনি সরলপ্রকৃতি, সদাশয় ও পরোপকারী ছিলেন। ধনবান হইবার পরও তিনি কখনও তাঁহার পূর্ব দারিদ্র্যের কথা বিস্মৃত হন নাই—সেজন্য চিরদিনই দরিদ্রগণের জন্য তাঁহার মায়ামমতা বিদ্যমান ছিল। তিনি ধনী হইয়া পরজীবনে কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু শিবপুরের পৈতৃক বাটীর কথা ভুলেন নাই। ধনী হইয়া তিনি সমারোহের সহিত শিবপুরের বাটীতে দুর্গোৎসব সম্পাদন করিতেন এবং কলিকাতা শোভাবাজারের বাটীতে জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হইত। দেবদ্বিজে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রতি একাদশীর দিন সমাগত বহু ব্রাহ্মণকে আট আনা করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতেন, মধ্যে মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ ভোজনেরও আয়োজন করিতেন। হিন্দুদিগকে বহু ব্যয়ে পঞ্জিকা ক্রয় করিতে হয় দেখিয়া তাঁহার পরদুঃখকাতর হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল ; সেজন্য তিনি একখানি পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া তাহা ব্রাহ্মণ সজ্জনগণকে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ পঞ্জিকা প্রকাশ ও বিতরণ[৮] করিয়া থাকেন। ১৩২০ সালে তিনি কলিকাতার অদূরে কামারপাড়া গ্রামে এক সাধকের আশ্রম-ভূমির উপর একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া তথায় গন্ধেশ্বরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা[৯] করিয়াছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারেও তাঁহার আগ্রহ কম ছিল না। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতার নানাস্থানে কয়েকটি এবং শিবপুরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সেকালের লোক হইয়াও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; সেজন্য শোভাবাজার পল্লিতে তাঁহার দ্বারা কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত[১০] হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পল্লিধামে একটি অন্নসত্র ও একটি টোল[১১] এবং কলিকাতায় আর একটি টোল প্রতিষ্ঠা[১২] করিয়াছিলেন। গত ১৩২১ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ তিনি পরলোকগত হইয়াছেন।

তাঁহার তৃতীয় পুত্র হরিশঙ্কর গভর্নমেন্ট কর্তৃক 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন এবং কলিকাতার মেয়র পদ এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স নামক দেশীয় বণিকগণের সর্বপ্রধান সমিতির সভাপতির পদ লাভ করিয়া দেশের ও দশের সেবায় ব্রতী আছেন।* বটকৃষ্ণের পুত্রগণের দানে হুগলিতে "ভূতনাথ পাল কৃষি বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণের কৃষিশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বটকৃষ্ণের মহানুভবতা বাঙালির হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক থাকিবে।

* বর্তমানে সকলেই লোকান্তরিত হয়েছেন।

খাজে আবদুল গনি

ঢাকার বর্তমান নবাব-বংশের পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীর হইতে দিল্লিতে আসিয়া অবস্থিত হন। এই বংশের খাজে আবদুল হাকিম দিল্লির রাজ-সংসারে কর্ম করিতেন। নাদির শাহ্ দিল্লি অধিকার করিলে খাজে আবদুল হাকিম সপরিবারে শ্রীহট্টে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। এখানে তাঁহার বিলক্ষণ সমৃদ্ধি হওয়ায় তিনি স্বীয় পিতা মৌলবি আবদুল কাদির এবং ভ্রাতৃদ্বয় মৌলবি আবদুল্লা ও মৌলবি আবদুল ওয়া সাহেবকে নিজের নিকট আনিয়া রাখেন। খাজে আবদুল হাকিম শ্রীহট্টে প্রচুর ভূসম্পত্তি অর্জন করেন। সেখানে এখনও তাঁহার সমাধি বর্তমান আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতা মৌলবি আবদুল্লা তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইয়া সপরিবারে ঢাকায় বেগমবাজারে আসিয়া বাস করেন। এযাবৎ এই বংশ ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়াই প্রধানত অর্থ উপার্জন করিতেছিলেন। অতঃপর মৌলবি হাফিজুল্লা। পরিবারের কর্তা হইয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের চেষ্টায় শ্রীহট্ট, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহ জেলায় প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রীত ও অর্জিত হইল এবং ঢাকার নবাব বংশ পূর্ববঙ্গের সর্বপ্রধান ভূস্বামীরূপে গণ্য হইলেন। মৌলবি হাফিজুল্লা যেমন জমিদারি বাড়াইতেছিলেন তদ্রূপ দানধ্যানে অর্থের সদ্‌ব্যয়ও করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর খাজে আলিমুল্লা এই একান্নবর্তী পরিবারের সর্বপ্রধান কর্তা হইয়া নিজগুণে পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি নিজ চেষ্টায় উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন ও নিজ পরিবারেও ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেন। তিনি স্থানীয় ইউরোপীয় সমাজের সহিত অবাধে মিশিতেন, ময়দানে তাঁহাদের সহিত খেলাধূলা করিতেন। তাঁহার কয়েকটি সুশিক্ষিত হস্তী ও অশ্ব ছিল। ঢাকার ঘোড়দৌড়ের তিনি একজন উৎসাহদাতা ছিলেন এবং ঘোড়দৌড় বাজীতে প্রতি বৎসর একটি কাপ পুরস্কার দিতেন। এই প্রথা এখনও এই বংশে প্রচলিত আছে।

খাজে আলিমুল্লার উত্তরাধিকারীই আমাদের নবাব খাজে আবদুল গনি।[১] তিনি এই বংশকে গৌরবের উচ্চতম শিখরে স্থাপন করেন। জমিদারির ভারপ্রাপ্তির পূর্বে তিনি জমিদারিকার্য পরিচালন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই শিক্ষালাভ করেন নাই। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে, কার্যভার পাইবার অনতিকাল মধ্যেই তিনি জমিদারি কার্য পরিচালন আয়ত্ত করিয়া লইয়া, একদিকে গভর্নমেন্ট এবং অপরদিকে তাঁহার প্রজাবর্গের সহিত সুমধুর প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। এইরূপে তিনি পূর্ববঙ্গের আদর্শ জমিদার বলিয়া পরিগণিত

হইলেন। ঢাকায় মুসলমান সমাজের উপর তাঁহার এমনই প্রভাব জন্মিয়াছিল যে, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় সিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল বিরোধ উপস্থিত হইলে কেবল নবাব খাজে আবদুল গনির চেষ্টাতেই এই বিরোধের মীমাংসা হয়, নচেৎ মহা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিবার সম্ভাবনা ছিল। বিবাদ প্রশমিত হইলে নবাব সাহেব নিজে ব্যয়ে উভয় সম্প্রদায়ের বিংশতি সহস্র ব্যক্তিকে এক বিরাট ভোজ দেন।

কেবল এই একটি ঘটনা নহে। নবাব সাহেবের প্রকৃতি এমন মধুর ও নিরপেক্ষ ছিল যে, দুই ব্যক্তি বা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, অনেক স্থলেই, উভয় পক্ষই নবাব সাহেবকে সালিশ মান্য করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বিরোধের মীমাংসা করিয়া লইত। এইরূপে তিনি অনেক পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারণ করিয়া সমাজের মহা উপকার সাধন করিয়াছিলেন।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় নবাব খাজে আবদুল গনি যে দৃঢ়চিত্ততার ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। ঢাকা তখন একপ্রকার অরাজক। ৭৩ সংখ্যক নেটিভ ইন্‌ফ্যানট্রির কিয়দংশ তখন ঢাকায় অবস্থিত ছিল। সিপাহিরা নবাব সাহেবকে গভর্নমেন্টের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য অনুরোধ এমন কি ভয় প্রদর্শন পর্যন্ত করিতে লাগিল। নবাব সাহেব তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি নির্ভীকভাবে উত্তর করিলেন, 'তোমাদের যতই ক্ষমতা থাকুক আমি তোমাদের ভয় করি না। আমি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আছি। তিনি সর্বশক্তিমান। এই দুঃসময়ে তিনি আমাকে ত্যাগ করিবেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে।' বিদ্রোহের সময়ের মধ্যেই তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ একবার তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি ঢাকা ত্যাগ করিয়া আপনার জমিদারির কোন সুদূর অংশে গিয়া অবস্থিতি করুন ; নচেৎ আপনাকে বিপন্ন হইতে হইবে। নবাব অকুতোভয়ে উত্তর করিলেন, এই সঙিন মুহূর্তে আমি ঢাকায় রহিয়াছি বলিয়াই লোকের আশা-ভরসা রহিয়াছে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস ও আস্থা রহিয়াছে। আমার উপস্থিতির জন্যই বিদ্রোহীরা তাহাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিতেছে না। আমি এখান হইতে চলিয়া গেলে লোকে আতঙ্কিত হইয়া উঠিবে। তখন তাহারা যে কি করিবে তাহা বলা যায় না। এই আতঙ্ক নিবারণই আমার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য। আমি তাহাই করিতেছি এবং করিব।

বিদ্রোহ যতদিন ছিল, নবাব সাহেব তাঁহার ঢাকার আবাসবাটী দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত করিয়া পরিবারবর্গ ও প্রজাবর্গকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া দিবারাত্রি পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ-শাসনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস ছিল। তাই যখন গভর্নমেন্ট ঋণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, নবাব সাহেব প্রচুর কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া সে সময়ে গভর্নমেন্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তদ্‌ব্যতীত ঢাকার ইংরেজ কর্মচারীগণকে সে সময়ে তিনি নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। দেশের প্রকৃত অবস্থা যখন যেরূপ ঘটিতেছিল তাহা তিনি সরকারকে নিয়মিতভাবে জানাইতেছিলেন এবং তাঁহার হস্তী, অশ্ব, নৌকা, গাড়ি প্রভৃতি সরকারের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

ঢাকা, মৈমনসিংহ ও বাখরগঞ্জ জেলার শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে নবাব খাজে আবদুল গনি অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতে তিনি বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঢাকায় তিনি একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যহ বহু ব্যক্তিকে অন্ন দান করিতেন। আর্ত, প্রার্থী তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কখনও বিমুখ হয় নাই। ঢাকার পার্শ্বস্থ বুড়ীগঙ্গার বন্যার উৎপাত নিবারণার্থ নবাব সাহেব বাঁধ নির্মাণ করাইয়া দেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট লর্ড নর্থব্রুক তাহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার উহার উদ্বোধন করেন। নবাব আবদুল গনি যদি আর কিছু নাও করিতেন, তথাপি একমাত্র জলের কল—যাহার কল্যাণে ঢাকাবাসী পরিশ্রুত জলপান করিয়া তৃপ্ত হইতেছে—ঢাকাবাসীর নিকট তাঁহার নাম শ্রদ্ধাভরে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত। আয়র্ল্যান্ডে দুর্ভিক্ষের সময় নবাব সাহেব ৬০০০ টাকা দুর্ভিক্ষ তহবিলে দান করেন এবং মক্কার জোবেদা খাল সংস্কারার্থে ৪০০০০ টাকা সাহায্য করেন।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্যের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সি. এস্. আই এবং ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ব্যক্তিগতভাবে নবাব উপাধিতে ভূষিত হন।

তদানীন্তন প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে কলকাতায় আগমন করিলে লর্ড নর্থব্রুক নবাব সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ আলাপ করাইয়া দেন এবং যুবরাজ নবাব সাহেবকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভারত-ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে একটি পদক উপহার দেন।

দিল্লির দরবারে খাজে আবদুল গনি বংশানুক্রমিক নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপলক্ষে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র আসানুল্লা ব্যক্তিগতভাবে নবাব উপাধি লাভ করেন।

নবাব খাজে আবদুল গনি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কে. সি. এস্. আই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন। পাশ্চাত্য ধরনের খেলাধূলাতেও তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিল না।

সন ১৩০৮ সালের ১ পৌষ এই মহানুভব ব্যক্তি মহাপ্রস্থান করেন।

মতিলাল ঘোষ

দেশ ও জাতিকে বড় করিবার জন্য যাঁহারা নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন মতিলাল ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সে আজ বহুদিনের কথা ; দেশের অবস্থা তখন কিরূপ, আজিকার অবস্থা দেখিয়া তাহার কিছুই অনুমান করা যায় না। আজ যেমন পথে ঘাটে সংবাদপত্রের ছড়াছড়ি এবং তাহাদের মারফত দেশের সকল বিষয়ের আলোচনা ও সর্বসমক্ষে বিষয়াদির উপস্থাপন সম্ভব হইয়াছে, তখন তাহা অতি সামান্য মাত্রই ছিল।

এমনই সময়ে সর্বসাধারণকে দেশাত্মবোধে উদ্‌বোধিত করা যে কত বড় কঠিন কাজ, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মতিলাল ও তাঁহার অগ্রজ শিশিরকুমার[১] অগ্রণী হইয়া এই দুরূহ কার্য সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনই এই কার্যের এক সংগ্রামময় ইতিহাস বা প্রকৃত পক্ষে এদেশের সংবাদপত্রেরই ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

শ্রদ্ধাবান হিন্দু পরিবারে মতিলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ পদ্মলোচন ঘোষ তখনকার বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল ছিল না। মতিলালের পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয় যশোহর জেলা আদালতে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। দোল, দুর্গোৎসব, বারো মাসে তেরো পার্বণ, ক্রিয়াকর্মাদি তাঁহার বাড়িতে বাঁধা ছিল। আরবি ও পারসি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন।

আজিকার বিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার নামকরণ হইয়াছে, অমৃতবাজার গ্রামের নাম হইতে। এই অমৃতবাজার গ্রাম যশোহর জেলায়। পূর্বে ইহার নাম ছিল পলুয়া মাগুরা। মতিলালের মাতার নাম অমৃতময়ী। এই মাতৃনামানুসারে পরে ঐ গ্রামের নাম হয় অমৃতবাজার, এবং সেই গ্রাম হইতে তাঁহাদের পত্রিকার প্রথম প্রচার হেতু তাহার নাম হয় অমৃতবাজার পত্রিকা।

মতিলালকে লইয়া তাঁহারা আট ভাই[২]। তন্মধ্যে হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল এই তিন জনে মিলিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার প্রবর্তন করেন। তাঁহাদের আট ভ্রাতার পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি ও সৌভ্রাত্রের এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন ছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালনাকালে রাজনীতি-ক্ষেত্রে শিশিরকুমার ও মতিলাল জনসমাজে ও জননায়কগণের মধ্যে শীঘ্রই সুপরিচিত হইয়া উঠেন। কালে তাঁহারা শীর্ষস্থানীয়গণের অন্যতম হন ও তাঁহাদের অভিমতাদি সমগ্র দেশের মতামত বলিয়া গ্রহণীয় হইতে থাকে। তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাললালও ক্রমে পত্রিকার কার্যে যোগদান করিয়া পরে সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ, মতিলাল শৈশব হইতেই মিষ্টভাষী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের আনুগত্য তাঁহার এমনি ছিল যে কখনই তাঁহাদের ছাপাইয়া যাইবার কল্পনাও তাঁহার মনে আসিত না। চিরকাল অন্তরালে থাকিয়াই তিনি দেশের ও দশের সেবা করিয়া গিয়াছেন; যদিও প্রতিপত্তির সুযোগ তাঁহার বহু প্রকারে আসিয়াছিল, সে সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নাই। কর্মযোগী মতিলাল দুঃস্থ দেশবাসীর দুঃখ-নিবারণ-চেষ্টাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে মতিলাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বাস্থ্য তাঁহার কোন দিনই ভাল ছিল না। কিন্তু পদব্রজে ভ্রমণও তাঁহার কম ছিল না। যানবাহনের সুবিধা তখন ছিল না ; তাই তিনি বাড়ি হইতে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত ৫০ মাইল অনায়াসেই পদব্রজে অতিক্রম করিতেন।

পাশ করার পর কিছুদিন জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশনে এবং কিয়ৎকাল কৃষ্ণনগর কলেজে ফার্স্ট আর্টস্ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা দেন নাই। অত্যধিক পরীক্ষার চাপ তাঁহার ভাল লাগিত না; কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানানুশীলনে কোন দিনই তাঁহার বিরতি ছিল না।

তিনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত বহু স্থানের গ্রাম্য সমাজের অনেকের পক্ষে একটা আকর্ষণ ছিল। খুলনা জেলার পিলজং গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারি গ্রহণ তাঁহার প্রথম কার্য। বয়স তখন মাত্র ষোলো। শিক্ষাদান কার্যে তাঁহার সাফল্য অসাধারণ বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য তিনি অধিক কাল করেন নাই। তাঁহার মতের দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ ; আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাহস কাহারও ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্মুখে, তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে, বাদপ্রতিবাদ বড় বেশি উপস্থিত হইত না।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমার অনেকদিন হইতেই "অমৃত প্রবাহিণী"[৩] নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রচার করিতেছিলেন। এই কাগজখানিই প্রকৃত পক্ষে অমৃতবাজার পত্রিকার পূর্ব সূচনা।

হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার ইন্‌কম ট্যাক্সে ডেপুটি কালেক্টরি ছাড়িয়া এবং মতিলাল তাঁহার হেডমাস্টারি ছাড়িয়া দিয়া ১৮৬৮ সালে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলা সাপ্তাহিক রূপে বাহির করিতে আরম্ভ করেন। একটি ছোট কাঠের প্রেস, কিছু পুরাতন টাইপ ও তাঁহারা কয়েক ভাই—এই ছিল কাগজের সম্পত্তি। নিজেরাই কপি লিখিতেন, কালি প্রস্তুত করিতেন, কম্পোজ করিতেন, টাইপে কালি লাগাইতেন, ছাপিতেন এবং সেই ছাপা কাগজ নিজেরাই প্যাক করিয়া ডাকে দিতেন। গ্রাহকসংখ্যা তখন অনুমান পাঁচশত। এমন হইয়াছে, আইনের পীড়নে মুদ্রণকার্য সম্ভবপর হয় নাই—ছাপা কাগজের পরিবর্তে হস্তলিখিত লিথো কপি চারিদিকে প্রেরিত হইয়াছে, তবুও তাঁহারা কোনো দিনই দমেন নাই। রাজপুরুষগণের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া মানহানির দায়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। বিচারে মুক্তিলাভ করিলেও যখন বুঝিয়াছেন গ্রামে থাকিয়া পত্রিকা পরিচালন

সম্ভবপর নহে, তখন কিছুদিনের জন্য উহা বন্ধ করিয়া পরে কলিকাতায় আসিয়া আবার তাহা বাহির করিয়াছেন (১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দ)। এই সময়ে উহা একসঙ্গে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় বাহির হইতে থাকে।

কিছুদিন পরে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'প্রেস অ্যাক্ট' পাশ হয়। সে আইনে বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করা একদিনও সম্ভবপর নহে। রাতারাতি কাগজখানিকে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি কাগজে পরিবর্তিত করেন। অমৃতবাজার ইংরেজি সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের অফিস তখন বহুবাজারে হিদারাম ব্যানার্জির গলিতে।[৪] পরে পত্রিকা অফিস বাগবাজারে স্থানান্তরিত হয়।[৫]

এই সময় হইতে মতিলাল দেশে সকল আন্দোলনে লেখনী সঞ্চালন করেন এবং নানা ভাবে, কি আইনক্ষেত্রে, কি চাকুরিক্ষেত্রে, কি শিক্ষা-আলোচনায়, কি সমাজ-সমস্যায়, সর্ববিষয়েই তিনি দেশকে সর্ব প্রকারে সাহায্য করিতে থাকেন। অমৃতবাজার পত্রিকা দ্রুতগতিতে সমগ্র ভারতবর্ষের মুখপত্ররূপে দণ্ডায়মান হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ১৯ ফেব্রুয়ারি হইতে 'অমৃতবাজার' দৈনিক পত্ররূপে দেখা দেয়।

মতিলাল পরম বৈষ্ণব ছিলেন। অগ্রজ মহাত্মা শিশিরকুমারের সহিত নাম-কীর্তনে তিনি প্রায়ই বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইতেন। স্বল্পভাষী মতিলাল বক্তৃতা খুব কমই করিতেন। সভা-সমিতিতে তাঁহার উপস্থিতিই প্রকাণ্ড শক্তিস্বরূপ মনে হইত। যদি কোথাও কখনও তিনি বক্তৃতা করিতেন, তাহা অতি অল্প কথায় এমন সুযুক্তিপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর হইত যে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার লেখনীও তদ্রূপ শক্তি বিতরণ করিত। গুরুত্বপূর্ণ গম্ভীর বিষয়েও তিনি সমভাবে লেখনী চালনা করিতেন।

সন ১৩২৯ সালের ২৫ ভাদ্র (ইং ১৯১২) এই অনন্যকর্মা স্বদেশসেবক ও সাংবাদিক, নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব মহাপ্রয়াণ করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলাদেশে যে-সকল মহাপুরুষ সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা যথেষ্ট সম্মান ও অর্থ উপার্জন করিয়া বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অন্যতম। হরপ্রসাদের পিতার নাম ছিল রামকমল ন্যায়রত্ন; তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং নিজে টোল করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে টোল ছাড়াও পিতা এবং পিতামহের টোলে পড়াইতে হইত। রামকমল সম্বন্ধে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় লিখিয়াছিলেন—'বাংলার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রায় অর্ধেকই রামকমল ন্যায়রত্নের ছাত্র।'

যশোহর কুমীয়া গ্রামে[১] এই ভট্টাচার্য পরিবারের পূর্ববাস ছিল। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ঐ বংশের মাণিক্য তর্কভূষণ গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটি গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। ইনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতৃপিতামহ ছিলেন।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ২২ অগ্রহায়ণ[২] মঙ্গলবার নৈহাটি গ্রামে হরপ্রসাদের জন্ম হয়। তিনি পিতার পঞ্চম পুত্র[৩] ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে নৈহাটিতে প্রথম একটি ইংরেজি বিদ্যালয় খোলা হয় এবং হরপ্রসাদ ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ করেন। স্কুলের শিক্ষক একদিন হরপ্রসাদকে শাস্তি দেওয়ায় পিতা হরপ্রসাদকে স্কুলে যাইতে নিষেধ করেন। পরে কয়েক মাস বসিয়া থাকিবার পর উক্ত বিদ্যালয়ে হরপ্রসাদ পুনরায় পড়িতে যান। ঐ বৎসর রথের পর অমাবস্যার দিন তাঁহার পিতার গঙ্গালাভ হয়[৪]।

সে সময়ে হরপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু[৫] কাঁদি (মুর্শিদাবাদ) স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিয়া নন্দকুমার হরপ্রসাদকে কাঁদিতে লইয়া যান ও স্কুলে ভরতি করিয়া দেন। কিন্তু তথায় মাত্র ছয়সাত মাস কাল তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠাগ্রজের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ নৈহাটিতে ফিরিয়া আসেন ও তথাকার স্কুলে পড়িতে থাকেন। মধ্যে কয়েকমাস তিনি ভাটপাড়ায় এক টোলে পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু পুনরায় স্কুলে গিয়াছিলেন। গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছিলেন। সে সময় অর্থাভাবে তাঁহাকে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। নানাপ্রকার বাধা বিপত্তির পর তিনি সংস্কৃত কলেজে ভরতি হন[৬] ও ১৮৭১খ্রিস্টাব্দে একাদশ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি[৮] পাইয়া এনট্রান্স পাশ করেন। এফ.এ পরীক্ষায়ও তিনি বৃত্তি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বি.এ পরীক্ষায় কোন বৃত্তি পান নাই[৯]। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম হন এবং বহু পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় তাঁহাকে 'শাস্ত্রী' উপাধি প্রদান

করা হয়[১০]। সে সময়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিহিত দেওয়াসিন গ্রামের রায় বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা হেমন্তকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্বশুর সাব-জজ ছিলেন। ইহার পর ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদের মাতৃবিয়োগ হয়।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মাসিক ১০০্ টাকা বেতনে তিনি হেয়ার স্কুলের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন[১১]। তাঁহাকে তখন অনুবাদ বিভাগের শিক্ষকের কার্যও করিতে হইত। ঐ বৎসরই লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক[১২] রাজকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় অসুস্থ হইলে হরপ্রসাদকে লক্ষ্ণৌয়ে প্রেরণ করা হয়। তিনি তথায় এক বৎসর কাজ করার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১৩] ঐ বৎসরই তাঁহাকে বাংলা গভর্নমেন্টের সহকারী অনুবাদক পদে[১৪] নিযুক্ত করা হয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং আট বৎসর ঐ কার্য করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক[১৫] পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল[১৬] ও সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিস্ট্রার পদ লাভ করেন।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইলে তিনি সরকারি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অবসর গ্রহণ করার দিনই গভর্নমেন্ট তাঁহাকে "বাংলা দেশের ইতিহাস, ধর্ম, রীতি ও প্রচলিত কাহিনি সম্পর্কে সংবাদ প্রদানকারী" পদে নিযুক্ত করেন—ঐ কাজ তাঁহাকে আজীবন করিতে হইয়াছিল। বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির বারো হাজার পুথির তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্যও গভর্নমেন্ট তাঁহাকে মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তি দান করিতেন; এ কাজও তাঁহাকে আজীবন করিতে হইয়াছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুন হইতে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত কয় বৎসর তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিতে হইয়াছিল।

এই সকল বেতনভোগী চাকরি ছাড়াও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রায়ই বহু অবৈতনিক কার্য করিতে হইত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহাকে 'গোপালতাপনী' উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ কার্যে এবং 'নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য' পুস্তক রচনায় সহায়ক নিযুক্ত করেন। তদবধি তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির কোনো না কোনো কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। একবার হরপ্রসাদকে সোসাইটি হইতে 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা'[১৮] প্রকাশের ভার দেওয়া হয়। রাজা রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তিনি সোসাইটির সংস্কৃত পুথি বিভাগের প্রধান পরিচালক[১৯] নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধিরূপে বোম্বাইয়ের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির শাখার শতবার্ষিক উৎসবে যোগদান

করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে সোসাইটির আজীবন সহকারী সভাপতি করা হয় এবং ইহার পর দুই বার তিনি সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হন। তিনি কয়েক বৎসর উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের কার্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্য-সাধনায় বিঘ্ন হওয়ায় তিনি মিউনিসিপালিটির কার্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[২০]

১৩০৩ সালে শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাহার পর তিনি ১৪ বার উহার সহকারী সভাপতি এবং ১৩ বার উহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র[২১] মহাশয়ের সহিত একযোগে তিনি বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রাচীন পুস্তক ও পুথি সংগ্রহের জন্য তিনি চার বার নেপালে[২২] গমন করিয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সিমলায় প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্‌গণের সম্মিলনে যোগদান করিয়া তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের উন্নতি সম্পর্কে গভর্নমেন্টকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গভর্নমেন্ট তাঁহাকে সি. আই. ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রাজকীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা স্যার জন মার্শাল সাহেবের অনুরোধে তিনি বারো হাজার পুথি ক্রয় করিয়াছিলেন। সেগুলি এখন কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে' রক্ষিত আছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তিনবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন—প্রথম ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানে; সেবার তিনি সাহিত্য শাখারও সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয়বার ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে হেতমপুরে এবং তৃতীয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রাধানগরে। তাহা ছাড়া ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় নিখিল ভারত হিন্দু সভার সভাপতি, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মথুরায় নিখিল ভারত সংস্কৃত কংগ্রেসের সভাপতি ও ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসের সভাপতিও তাঁহাকেই হইতে হইয়াছিল। এইবার অসুস্থ দেহ লইয়াও তিনি লাহোরে গমন করিয়াছিলেন।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে বৃহত্তর ভারত পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করা হইয়াছিল এবং ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন।

১৩১৬ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' শাস্ত্রী মহাশয়কে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য

শ্রেণিভুক্ত করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিলাতের 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির' বিশিষ্ট সদস্য[২৩] মনোনীত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে তাঁহার সংবর্ধনা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে একটি গরদের জোড়, একটি সোনার আংটি ও একটি রূপার চন্দনের বাটি দেওয়া হইয়াছিল।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গভর্নর লর্ড লিটন কলেজে শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে ফেলো মনোনীত করিয়াছিলেন এবং 'বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি' তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য করিয়া লইয়াছিলেন।

লেখক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বলিয়া বাংলাদেশের লোক চিরদিন হরপ্রসাদের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। তিনি পঠদ্দশাতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পরে 'ভারতমহিলা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এ বিষয়ে উহা প্রামাণ্য গ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের সপ্তমবর্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বাল্মীকির জয়'[২৪] পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা গদ্য-কাব্য। এই পুস্তকখানি বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের নবম বর্ষে ১২৮৯ সালে তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কাঞ্চনমালা'[২৫] প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মেঘদূত ব্যাখ্যা'[২৬] নাম দিয়া তিনি মেঘদূতের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ঐ পুস্তক অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া লোকে তাহার নিন্দা করিয়াছিল, কিন্তু পুস্তকখানি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'[২৭] লিখিয়াছিলেন, ইহাতে হিন্দুযুগ বা প্রাচীন হিন্দুদিগের বিবরণ আছে। এই ইতিহাস স্কুলপাঠ্য হওয়ায় তিনি উহা হইতে ৫০ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের মধ্যে হরপ্রসাদের স্থান অতি উচ্চে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই এ বিষয়ে হরপ্রসাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। হরপ্রসাদ তাঁহার কার্যদক্ষতার দ্বারা গুরুকে ও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক হিসাবেও তাঁহার সমকক্ষ খুব কমই দেখা যায়। হরপ্রসাদ ভারত ইতিহাসের হিন্দুযুগ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা তত্ত্বপূর্ণ ও সুন্দর করিয়া কেহই এ পর্যন্ত লিখিতে পারেন নাই।

বৌদ্ধধর্ম, বিশেষ মহাযান সম্বন্ধে, হরপ্রসাদের জ্ঞান অতি গভীর ছিল। অনেক এই জন্য তাঁহাকে বৌদ্ধ মনে করিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' মাসিক পত্রে বৌদ্ধধর্ম[২৮] সম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্ত্রশাস্ত্রেও হরপ্রসাদের যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল; নেপালে যাইয়া তিনি হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভেদ ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজি শিক্ষার মোহে মুগ্ধ হইয়াও হিন্দুপূজা ছাড়েন নাই। তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেন। প্রতি বর্ষে নিজের জন্মতিথি পূজা ও মাতাপিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিতেন। তিনি হিন্দুদিগের আচার-নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নাই।

তিনি একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন। দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া

নিজের চেষ্টায় একাধারে বাণী ও কমলার কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় অনেকেরই অহমিকা দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাতে তাহা হয় নাই। তিনি গুণের ও গুণীর আদর করিতে জানিতেন। তাঁহার কলিকাতার পটলডাঙা স্ট্রিটের বাসভবনে বহু গুণী ব্যক্তির সমাগম হইত।

তাঁহার দানও কম ছিল না। পুথির তালিকা প্রকাশের জন্য তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিকে ১৮ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। নৈহাটির স্কুলেও তিনি ৩০ হাজার টাকা দিয়া গিযাছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে এই দান সামান্য নহে। তাহা ছাড়া তাঁহার বহু ক্ষুদ্র দান ছিল তাহার সংবাদ তিনি কখনও কাহাকেও জানিতে দেন নাই।

১৩৩৮ সালের ১ অগ্রহায়ণ, ইংরেজি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার শব কলিকাতার বাড়ি হইতে নৈহাটিতে লইয়া গিয়া গঙ্গাতীরে সৎকার করা হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলার নাট্য-সমাজে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার নাটকাদি এক সময়ে বাংলার নাট্যজগতে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং এখনও পরম সমাদরে পঠিত ও অভিনীত হইয়া থাকে। এই নাট্যরচনায় তিনি যেভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হন তাহাও অভূতপূর্ব।

পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক ও ধর্মভাবপূর্ণ অন্যূন সত্তর খানি নাটক, গীতি-নাট্য ও প্রহসন তিনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার লিখিবার অসাধারণ শক্তির পরিচয়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করিয়া ইনি বঙ্গের রঙ্গালয়ের সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন এবং তদ্দারা বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহার স্বলিখিত নাটকগুলি কি ভাষায়, কি ভাবে, স্বভাবতই গভীর ও হৃদয়গ্রাহী; সঙ্গীত রচনাও তেমনি সুমধুর।

পৌরাণিক বহু উপাখ্যানকে নাটকরূপে প্রবর্তিত করিয়া তিনি সেগুলিকে সাধারণ জনসমাজে সুপরিচিত করেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা ব্যতীত এই সকল আখ্যানবস্তুর বিষয় হয়তো বহুলোকের নিকট অজ্ঞাতই থাকিত।

তাঁহার পৌরাণিক নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'জনা',[১] 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস',[২] প্রভৃতি বিশেষ সমাদর লাভ করে। সামাজিক নাটকগুলিও বিশেষ সমস্যামূলক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে 'বলিদান',[৩] 'প্রফুল্ল',[৪] 'শাস্তি কি শান্তি',[৫] প্রভৃতি নাটকগুলি আজও বহু সমাদরে অভিনীত হইয়া থাকে।

গিরিশচন্দ্র পরম ভক্ত পুরুষ ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে সাধক পদবাচ্যও করিয়া থাকেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্তশিষ্য ছিলেন; সুতরাং ভক্তিমূলক নাট্যগ্রন্থাদি যে তাঁহার হাতে এমন সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?

'গৃহলক্ষ্মী'[৬] তাঁহার শেষ নাটক। তাঁহার মৃত্যুর পর রঙ্গমঞ্চে ইহার অভিনয় হয়। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্য-স্রষ্টারূপে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে; নাট্যকাররূপে সে স্থান যে সর্বোচ্চ তাহা সর্ববাদীসম্মত।

গিরিশচন্দ্র ৬৮ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ১২৫০ সালের ১৫ ফাল্গুন কলকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। কৈশোরেই তাঁহার মাতৃ ও পিতৃ বিয়োগ হয়। পাঠশালায় শিক্ষা শেষ করিয়া গিরিশচন্দ্র গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ও পরে হেয়ার স্কুলে শিক্ষা শেষ করেন। লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়িয়া তিনি স্কুল ছাড়িয়া দেন। তাহার পর তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা দেখা দেয়। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চারি বৎসর কাল গৃহে বসিয়া তিনি অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করেন। তাহার পর কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া বাগবাজারে এক থিয়েটারের দল গঠন করিয়া দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'[৭] নাটক অভিনয় করেন। নিজে তাহাতে 'নিমচাঁদ' এর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই থিয়েটার পরে ন্যাশনাল থিয়েটার[৮] নামে খ্যাত হয়। কিছুকাল পরে তাহাতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইলে গিরিশচন্দ্র তাহার সংশ্রব ত্যাগ করেন।

এখন যেমন চারিদিকে বায়োস্কোপ, থিয়েটারের ছড়াছড়ি, তখন তেমন ছিল না। ছায়াচিত্রের নামও তখন কেহ শুনে নাই। থিয়েটার ক্বচিৎ হইতে দেখা যাইত। তখন থিয়েটারের মাত্র প্রথম যুগ। গিরিশচন্দ্র বহু আয়াস স্বীকার করিয়া নট ও নাটক উভয়দিকে অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করিতে লাগিলেন। নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইল।

বিডন স্ট্রিটে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে গিরিশচন্দ্র ইহাতে যোগ দেন এবং প্রথমে ইহাতে অবৈতনিক ভাবে কাজ করিতে থাকেন; পরে একশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে তিনি নাটক লেখকরূপে সাহিত্য-জগতে দেখা দেন। ক্রমে বিডন স্ট্রিটে স্টার থিয়েটার[৯] প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গিরিশচন্দ্র তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হন। পরে গোপাললাল শীলের স্বত্বাধিকারিতায় এমারেল্ড থিয়েটার[১০] স্থাপিত হইলে গিরিশচন্দ্র তাহার কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন।

হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার পুনর্গঠিত হইলে গিরিশচন্দ্রের উপর তাহার অধ্যক্ষতা আসিয়া পড়ে। এদিকে বিডন স্ট্রিটে মিনার্ভা থিয়েটার[১১] স্থাপিত হয় এবং তাঁহারই অনূদিত 'ম্যাক্‌বেথ'[১২] তথাকার প্রথম রজনীর অভিনয়রূপে বহু দর্শককে আকৃষ্ট করে। গিরিশচন্দ্র ইহাতে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহার এই ম্যাক্‌বেথের বঙ্গানুবাদ বাংলা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছে ; ইংরেজি নাটকের, বিশেষত ম্যাক্‌বেথের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটকের, এমন সুন্দর অনুবাদ আর প্রকাশিত হয় নাই।

মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্ব বারবার পরিবর্তিত হইতে থাকিলেও গিরিশচন্দ্র প্রায়ই উহার

সংশ্রবে থাকিতেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্থাপিত ক্লাসিক থিয়েটারেও[১৩] তিনি যোগদান করিতেন। ১৩১৪ সালে কোহিনুর থিয়েটার[১৪] স্থাপিত হয়। গিরিশচন্দ্র এখানে ম্যানেজার হন। দশমাস কার্য করার পর তিনি পুনরায় মিনার্ভার অধ্যক্ষতা করেন।

গিরিশচন্দ্র নাটকে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, নাট্যাভিনয়েও সেই তুলনায় কিছু কম সাফল্য লাভ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ নট, অদ্যাবধি কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যে তিনি দর্শকবৃন্দকে সর্বদা মুগ্ধ রাখিতেন। তাঁহার বহু সহকর্মী তাঁহার নিকটে অভিনয় শিক্ষা করিয়া পরে সুবিখ্যাত হন। তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ[১৫] (দানীবাবু) পিতার অভিনয়-নৈপুণ্য সবিশেষ লাভ করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে বহু বিখ্যাত ব্যক্তিও আকৃষ্ট হইতেন। বিদ্যাসাগর ও পরমহংসদেব বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ও বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালের ২৫ মাঘ নটশ্রেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার

দরিদ্র কৃষিজীবীর কুটিরে জন্মগ্রহণ করিয়াও কিরূপে ধনে মানে জ্ঞানে দেশের ও সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরূপে গণ্য হওয়া যায় তাহা স্বর্গত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও উদ্যমশীলতায় তিনি বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন। কলিকাতার "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা"[১] মহেন্দ্রলালের অতুলনীয় কীর্তি। অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে ডাক্তার সরকারই এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

হাওড়া জেলার পাইকপাড়া[২] নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে দরিদ্র সদ্‌গোপ বংশে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর তারিখে মহেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু তখন তাঁহার পিতা তারকনাথ সরকারের[৩] মৃত্যু হয়। তাঁহার জননী মহেন্দ্রলাল এবং আর একটি শিশুপুত্রকে লইয়া কলিকাতায় নেবুতলায় ভ্রাতৃগৃহে[৪] আশ্রয় গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর চারি বৎসর পরে তাঁহার মাতারও মৃত্যু হয়।

মহেন্দ্রলালের মাতুলদের অবস্থাও বিশেষ সচ্ছল ছিল না। কলিকাতায় মহেন্দ্রলাল এক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়[৫] প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। পরে শিক্ষক ঠাকুরদাস দে মহাশয়ের নিকট তাঁহার ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হয়। ইহার এক বৎসর পরে তাঁহাকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভরতি করিয়া দেওয়া হয়।

বাল্যকালে মাতুলালয়ে মাতৃপিতৃহীন* মহেন্দ্রলালকে বাজার মাথায় করিয়া আনিতে হইত। বাড়িতে আলোকের অভাবে অনেক সময় তিনি রাস্তার আলোকের সাহায্যে পাঠ প্রস্তুত করিতেন। এত কষ্টের মধ্যে কাটিলেও, স্কুলে মহেন্দ্রলাল একজন মেধাবী ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। প্রধান শিক্ষক উমাচরণ মিত্রের ইংরেজি উচ্চারণ বিশুদ্ধ ও মধুর ছিল। মহেন্দ্রলাল বাল্যকাল হইতেই উমাচরণ বাবুর অনুকরণে পাঠ ও আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিতেন। এই অনুকরণ চেষ্টার ফলেই কালে তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য যশোভাজন হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রলাল অল্পবয়সেই সুন্দর ইংরেজি রচনা করিতে পারিতেন।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্রলাল হেয়ার স্কুল হইতে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া জুনিয়ার স্কলারশিপ্ লাভ করেন এবং হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন।[৬] হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়া ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। বিজ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগই মহেন্দ্রলালের মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের কারণ। মহেন্দ্রলাল মেডিক্যাল কলেজে ছয় বৎসর[৭] পাঠ করিয়া ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এল্. এম্. এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি পদক পারিতোষিক ও বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন মেডিক্যাল কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র ছিলেন, সেই সময় উচ্চশ্রেণির ছাত্রদিগের অনুরোধে এবং অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের অনুমতি লইয়া, 'চক্ষুর গঠন ও কার্যপ্রণালী' সম্বন্ধে কলেজে কয়েকটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি সকলেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

এল্. এম্. এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মহেন্দ্রলাল চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার নিজ প্রতিভাগুণে অল্পকালের মধ্যেই তিনি শহরের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্রলাল সর্বোচ্চ ডাক্তারি পরীক্ষা এম্. ডি[৮] পাশ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে আরও বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

এই বৎসরই কলকাতায় ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখা[৯] প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি প্রথমে এই অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও তিন বৎসর পরে সহকারী সভাপতি মনোনীত হন। এই শাখা প্রতিষ্ঠাকালীন সভায় মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথির নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার দৃঢ় মত[১০] ছিল—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যে সকল রোগী আরোগ্য হয়, তাহা ঔষধের গুণে নহে, রোগীকে বিশেষ ভাবে পরিচর্যা করার ফলেই সম্ভব হয়। সেই সময় তাঁহার কোনো বন্ধু তাঁহাকে একখানি ইংরেজি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক[১১] সমালোচনার জন্য প্রদান করেন। মহেন্দ্রলাল মনে করিলেন, হোমিওপ্যাথি যে বিজ্ঞানমূলক চিকিৎসা নয়, তাহা প্রমাণ করিবার এই একটা বিশেষ সুযোগ। কিন্তু পুস্তকখানি পাঠ করিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মিল যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে ইহার যথাযথ সমালোচনা করা অসম্ভব। তিনি সেইজন্য একজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথের[১২] রোগীদিগের চিকিৎসা-কার্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ

* 'মাতাপিতৃহীন' শুদ্ধ ব্যবহার।

করিলেন। ফলে, অল্পকালের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, হোমিওপ্যাথি প্রথায় সত্য নিহিত রহিয়াছে[১৩]। তখন তাঁহার মত পরিবর্তিত হইল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার গুণ সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য তিনি আপন শক্তি নিয়োজিত করিলেন।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে[১৪] ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার চতুর্থ বাৎসরিক অধিবেশনে ডাক্তার সরকার সমগ্র অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের সম্মুখে প্রচলিত চিকিৎসাপ্রণালীর কতকগুলি দোষ কীর্তন করিয়া, হ্যানিমানের আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রচার করিলেন। সভামধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, ফলে, তাঁহাকে চিকিৎসক সমাজ হইতে একরূপ বিদূরিত করা হইল। কিন্তু তিনি সমস্ত ভুলিয়া সত্যেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে সত্যেরই জয় হইয়াছিল এবং কালে মহেন্দ্রলাল সমসাময়িক চিকিৎসকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যপদে[১৫] নিযুক্ত হন। তিনি "ফ্যাকাল্‌টি অব্ মেডিসিনের"[১৬] প্রতিনিধিরূপে সিন্ডিকেটে যোগদানের সময়, হোমিওপ্যাথ বলিয়া অন্যান্য চিকিৎসক সভ্যগণ বিশেষ বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এমন কি তাঁহার এম্. ডি ডিগ্রি কাড়িয়া লওয়ার জন্যও চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি চারি বৎসরকাল 'ফ্যাকাল্‌টি অব্ আর্টের' সভাপতি ছিলেন। দশবৎসর কাল তিনি সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন এবং ভাইস চ্যান্সেলারের অনুপস্থিতিতে সাধারণত তাঁহাকেই সভাপতির কার্য করিতে হইত।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম হইতে মহেন্দ্রলাল 'ক্যালকাটা জার্নাল অব্ মেডিসিন'[১৭] নামক একখানি চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ করেন। পর বৎসর এই পত্রিকার এক সংখ্যায়[১৮] "ভারতীয়গণের বিজ্ঞান-চর্চার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা"[১৯] সম্বন্ধে তিনি একটি বিশেষ যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাই ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা স্থাপনার প্রথম সূচনা। নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অক্লান্ত চেষ্টার ফলে, ছয় বৎসর পরে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্রলাল বিজ্ঞান-সভা স্থাপনে সমর্থ হন। ইহাই সমগ্র ভারতের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার সর্বপ্রথম ও অন্যতম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানের বহু প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান অধ্যাপক এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং সুবিখ্যাত স্যার্ সি. ভি. রমন[২০] এই বিজ্ঞানাগারেই গবেষণা করিয়া কৃতকার্য হইয়া 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়াছেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ডাক্তার সরকার বিজ্ঞান-সভার সম্পাদক ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

মহেন্দ্রলাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে তিনি কলকাতার শেরিফের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল বহুকাল ধরিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। স্বাস্থ্যবিভাগে তাঁহার অভিমত সাদরে গৃহীত হইত। তিনি বহুকাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গলের সভ্য ছিলেন এবং তথাকার কাউন্সিলেরও সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মেরও একজন ট্রাস্টি ছিলেন এবং ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকগুলি বিখ্যাত সভার সদস্যপদে মনোনীত হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্টের নিকট হইতে বিশেষ সম্মানসূচক সি. আই. ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি অনারারি ডি. এল্ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। যেমন অর্থার্জন করিয়াছেন তেমন দানেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন বহু দরিদ্রকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধাদি দান করিতেন; নিতান্ত দরিদ্রের পথ্যেরও ব্যয়ভার বহন করিতেন। একবার দেওঘর বাসকালীন কুষ্ঠরোগীদিগের দুর্দশা অবগত হইয়া তিনি বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়েন এবং তাহাদের জন্য কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া একটি আশ্রয়বাটী নির্মাণ করাইয়া দেন। ডাক্তার সরকারের সহধর্মিণীর নাম অনুসারে আশ্রমের নাম "রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম"[২১] রাখা হইয়াছে।

অবিশ্রান্ত কার্যে ব্যস্ততার মধ্যে মহেন্দ্রলালের স্বাস্থ্য ভাল থাকিত না, মধ্যে হাঁপানি রোগে তিনি বিশেষ কষ্ট পাইতেন। তদুপরি চিকিৎসাসূত্রে কয়েকটি স্থানে যাইয়া তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য শেষ বয়সে তিনি বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের শেষে তিনি এক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে থাকেন এবং ঐ রোগেই ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে, ৭১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

নিরক্ষর সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া এরূপ উন্নতি ও মর্যাদালাভ পৃথিবীর যে কোন দেশেই স্মরণীয় ও গৌরবজনক। মহেন্দ্রলাল নানা গুণের অধিকারী ছিলেন এবং অসত্যকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। বিদেশীয় পোষাক পরিপন্থী বলিয়াই মনে করিতেন। শিশুকাল হইতেই পরমেশ্বরে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে, রোগযন্ত্রণার মধ্যে, তিনি কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গীতগুলিতে[২২] তাঁহার স্বাভাবিক ধর্মভাব পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে যে কয়েকজন মনীষী তাঁহাদের ভাব ও ভাষা দ্বারা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন ও তাহার নূতন রূপ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ। কোনো বিশেষ বিষয়েই যে সাহিত্য-প্রতিভা নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে; সে প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী।

কলিকাতার রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঈশানচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার পিতা; রমেশচন্দ্র তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। ইংরেজি ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ আগস্ট তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতার শিক্ষার পর তিনি তাঁহার দুই বাল্যবন্ধুর সহিত উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষায় দুরূহ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য ইংল্যান্ড গমন করেন। তখনকার দিনে ইংল্যান্ডে গমন এখনকার মত সুলভ ও সহজ ছিল না। সে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বের কথা।

এই তিন বন্ধুর একত্র অধ্যয়নের ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ধারাও একই ভাবে প্রধাবিত হইয়াছিল। এই তিন বন্ধুর একজন স্বয়ং রমেশচন্দ্র, দ্বিতীয় সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি বিহারীলাল গুপ্ত[১] এবং তৃতীয় দেশপূজ্য বাগ্মীশ্রেষ্ঠ জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে রমেশচন্দ্র তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকলে একত্রে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপূর্বে মাত্র একজন বাঙালি ছাত্র আই. সি. এস্ পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন—তিনি আমাদের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[২]

দেশে ফিরিয়া আসিয়া রমেশচন্দ্র প্রথমে বঙ্গদেশে শাসনবিভাগের কার্য আরম্ভ করেন। ইহার পর তিনি নানা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট পদ অলঙ্কৃত করেন ও শেষে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত হন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয় ছিলেন।

তখন লর্ড রিপনের[৩] আমল। বিখ্যাত 'ইলবার্ট বিল'[৪] তখন পাশ হয়। চারিদিকে একটা শোরগোল পড়িয়া গেল—দেশময় চাঞ্চল্য। রমেশচন্দ্র তখন বর্ধমান বিভাগের কমিশনার। সুতরাং জেলার শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কিছুতেই একজন বাঙালির অধীনে কর্ম করিতে রাজি হন নাই। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একযোগে ছুটির প্রার্থনা জানান। ইহাতেই দেখা যায় যে তাঁহার এই উচ্চপদ প্রাপ্তিতে ইউরোপীয় মহলেও একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

তিনি যে শুধুই সরকারি উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু জাতীয় জীবনের গঠনেও সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশহিতৈষণার চেষ্টা

তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় তিনি ইংরেজিতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এমনি এক সময় একদিন তিনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিমন্ত্রণ করেন। তখন 'বঙ্গদর্শনের যুগ', বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-গুরু। তাঁহার এ আহ্বান যুবক রমেশচন্দ্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে হঠাৎ বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লইয়া উপস্থিত হওয়া সামান্য ব্যাপার নহে, রমেশচন্দ্র তাই দ্বিধাভরে বলেন যে বাংলা লিখিতে পারা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। বঙ্কিম হাসিয়া উত্তর দেন, সে ভাবনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহারা দেশের উদীয়মান কর্মী সুতরাং অচিরেই শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, তাঁহারা যাহা লিখিবেন তাহাই বাংলা এবং যাহা রচনা করিবেন তাহাই সাহিত্য।

রমেশচন্দ্রের প্রথম ইংরেজি প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় রেভারেন্ড লালবিহারী দে[৫] সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'[৬] নামক ইংরেজি মাসিক পত্রে,—বিষয় 'বঙ্গসাহিত্য'[৭]। ইহার পর তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রাদি লইয়া পর পর অনেকগুলি বাংলা উপন্যাস রচনা করেন। ইতিহাস পাঠ বা ইতিহাস আলোচনা করা তাঁহার বরাবরের আগ্রহ। সহজভাবে জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র সাধারণে প্রচার দ্বারা জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করাই তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা। বাংলার চরিত্রাদি লইয়া 'বঙ্গবিজেতা',[৮] মহারাষ্ট্র জীবন লইয়া 'জীবনপ্রভাত'ও 'জীবন-সন্ধ্যা',[৯] উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান লইয়া 'মাধবীকঙ্কণ',[১০] বাংলার দ্রুত অধঃপতনশীল সমাজ লইয়া 'সমাজ'[১১] ও 'সংসার'[১২] প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অপূর্ব দান। কি ভাষার স্বচ্ছন্দ গতিতে, কি তাহার মিষ্টতায়, কি ভাবে, কি আদর্শে—সে সব বাস্তবিকই ছিল অনবদ্য। লেখার একটা সজীবতা তাঁহার সকল গ্রন্থেই বিদ্যমান। তিনি 'ভারতের ইতিহাস'[১৩] ও 'বিলাত ভ্রমণ'[১৪] নামে আরও দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন তাঁহারই কৃত 'ঋগ্‌বেদের বাংলা অনুবাদ'[১৫] বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

অপরদিকে ইংরেজিতে তাঁহার *History of India,*[১৬] *Ramayana and Mahabharata in English Verse,*[১৭] *Economic History of British India*[১৮] প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ। তাঁহার Rigveda গ্রন্থ ভারতের প্রাচীন আর্য সভ্যতার বিকাশরূপে বিশ্ববিখ্যাত হয়। তাঁহার শেষ দুইখানি গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় লিখিত হয়,—প্রথমটি *Lake of Palms*[১৯]; এখানি 'সংসার' অবলম্বনে লিখিত ; অপরখানি The Slave Girl of Agra[২০] ; 'মাধবীকঙ্কণ' অবলম্বনে ইহা রচিত। দুই খানি পুস্তকই অতি উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

রমেশচন্দ্র রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণের পূর্বে উড়িষ্যার বিভাগীয় কমিশনারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন উড়িষ্যা একটি বিভাগমাত্র—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা একত্র তখন একটি প্রদেশ। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কিছুকাল লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী থাকেন। অর্থনীতিতে

তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের ফলস্বরূপ *Economic History of British India* ছাত্রসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠে। অধ্যাপনান্তে কিছুদিন তিনি বরোদার রাজস্ব-সচিবের কার্য করেন। পরে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রধান রাজমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। দুঃখের বিষয়, এই উচ্চপদে আসীন হইয়া তিনি বিশেষ কিছু করিবার অবসর পান নাই। অত্যল্পকাল মধ্যেই ঐ বৎসর ২৯ নভেম্বর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর নানাভাবে তিনি দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের'[২১] ইনি অন্যতম স্রষ্টা এবং তাহার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, দেশীয় সাহিত্যে অসামান্য পারদর্শিতা এবং কয়েকটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকার ফলে বঙ্গসাহিত্যের অপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তিনি যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও বঙ্গের সাহিত্যিকগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষণার্থে পরিষদের বিশেষ বিভাগ 'রমেশ-ভবন'[২২] সংস্থাপন করিয়া বাঙালির অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

সৈয়দ আমীর আলি

যাঁহারা নানা জনহিতকর কার্যে এবং বিবিধ সদ্গুণের দ্বারা জগতে যশস্বী হইতে সমর্থ হইয়াছেন, সৈয়দ আমীর আলি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার শিক্ষা যেমন অসাধারণ ও পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণও ছিল তদ্রূপ উচ্চ। হিন্দু-মুসলমানে তিনি ভেদ বোধ করিতেন না, কারণ তাহারা একই দেশের অধিবাসী ও তাহাদের কল্যাণও একই সূত্রে গ্রথিত বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করিতেন।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল হুগলিতে সৈয়দ আমীর আলি জন্মগ্রহণ করেন। হুগলি কলেজ বহু প্রাচীন এবং সেকালের বহু কৃতী মনীষী ঐ কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। আমির আলি ঐ কলেজে প্রবিষ্ট হন ও বিশেষ যোগ্যতার সহিত বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইহার এক বৎসর পরেই এম. এ উপাধি লাভ করেন। কিয়ৎকাল পরে বিশেষ সম্মানের সহিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন।

অত্যল্পকাল মধ্যেই আমীর আলি আইনে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন। ওকালতি আরম্ভ করিবার কিছুকাল পরেই গভর্নমেন্টের উচ্চ-শিক্ষা বিষয়ক স্টেট্ স্কলারশিপ পাইয়া তিনি বিলাত যাত্রা করেন ও ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া পুনরায় কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

এক বৎসর পর ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আমীর আলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পর বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের মুসলমান আইনের (Muhammedan Law) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পাঁচ বৎসর তিনি এই স্থানে অধ্যাপনা করেন। এই সময় হইতেই তিনি মুসলমান সমাজের নানা সমস্যার বিষয় চিন্তা করিয়া তাহার সমাধান সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন। কি উপায়ে সমাজকে ঘোর রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামি হইতে যুগোপযোগী করা যায় ও কিভাবে নৈতিক, সামাজিক ও কর্মজীবনের ধারার মধ্যে জগতের বর্তমান ভাব ও বৈশিষ্ট্যের উন্নত প্রণালী প্রবর্তন করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে থাকেন। এতদুদ্দেশ্যে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা শহরে Central National Muhammedan Association স্থাপন করেন। পঁচিশ বৎসর কাল তিনি এই সমিতির সেক্রেটারি বা সম্পাদক থাকিয়া সমাজের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ঐ বৎসরই তিনি মুসলমান সমাজের আর একটি বিরাট ও প্রধান অনুষ্ঠানের কার্যনির্বাহকমণ্ডলীতে যোগদান করিয়া একাদিক্রমে ২৮ বৎসর (১৮৭৬-১৯০৪ খ্রিঃ) সভাপতিরূপে তাহার উপর কর্তৃত্ব করেন। এই অনুষ্ঠান পুণ্যাত্মা হাজি মহম্মদ মহ্‌সীন মহাশয়ের নাম সম্পর্কিত হুগলির বিখ্যাত ইমামবাড়া।

গভর্নমেন্টের দৃষ্টি এই যুবক ব্যারিস্টারের প্রতি বরাবরই ছিল। তাঁহার পাঁচ বৎসর ব্যারিস্টারির পর ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি বিশেষ কার্যকুশলতার পরিচয় দেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই গভর্নমেন্ট তাঁহাকে অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্টেটের পদে উন্নীত করেন। পরে ঐ পদে তাঁহাকে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিবার কথা হয়; কিন্তু তিনি পুনরায় আইন ব্যবসায়ে যোগদানের সঙ্কল্প করিয়া ঐ পদে ইস্তফা দেন এবং হাইকোর্টে ফিরিয়া আসেন।

ব্যারিস্টারিতে তিনি প্রভূত যশ ও অর্থ অর্জন করেন ও ক্রমে আইনের বিশেষজ্ঞ বলিয়া সুনাম প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে পাঁচ বৎসর কাল (১৮৭৯-৮৩ খ্রিঃ) তিনি বাংলার ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার ও তৎপর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঠাকুর ল-এর (Tagore Law) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সি. আই. ই উপাধি লাভ করেন।

তাঁহার কার্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল কলিকাতার হাইকোর্ট—শুধু আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে নহে, মাননীয় বিচারক হিসাবেও বটে। এইজন্যই সাধারণত তিনি জাস্টিস্‌ আমীর আলি বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। চৌদ্দ বৎসর সসম্মানে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণপূর্বক তিনি ইংল্যান্ডে যাইয়া বাস করেন। অবসর গ্রহণ করিলে স্বদেশ ও স্বজাতির কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই, বরং তত্রত্য মুস্‌লিম-লিগের শাখার সভাপতিরূপে সর্বদাই প্রভূত পরিশ্রম করিতে থাকেন।

ভারতবাসীর মধ্যে বিলাতে সম্রাটের মন্ত্রণা সভায় (Privy Council) আমীর আলিই প্রথম সভ্য (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁহার এই সম্মানে সমগ্র ভারতবর্ষ সম্মানিত হইয়াছিল।

ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমীর আলির খ্যাতি নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য নানা গ্রন্থাদিতে নিবদ্ধ। *Life and Teaching of Mahomed*[১] তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনামূলক গ্রন্থ। এ সম্বন্ধে তাঁহার আর একখানি পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য, *The Spirit of Islam*[২] তাহার নাম।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি তাঁহার আইন সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলি, যথা—*Mahomedan Law ; Personal Law of Mahomedans ; Students' Hand Book of Mahomedan Law*. এতদ্‌ভিন্ন তিনি *Law of Evidence* এবং *Bengal Tenancy Act* নামক পুস্তকদ্বয়ের যুগ্ম গ্রন্থকারের অন্যতম।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে তাঁহার History of the Saracens[৩] ও Mahomedan Civilization in India[৪] সুপ্রসিদ্ধ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরিচয় বাংলা-ভাষাভাষী কাহাকেও দিতে হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁহার হাতে কাঁটাও ফুল হইয়া ফুটিত, এমনি ভাবে তিনি তাঁহার আখ্যান-বস্তুকে রূপ দিতেন। যতদিন বঙ্গ-সাহিত্য বর্তমান থাকিবে ততদিন দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষয় যশ ও অমর প্রতিভা বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী লেখক অদ্যাবধি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সাধারণ্যে ডি. এল্. রায় নামে সমধিক পরিচিত।

বঙ্গসাহিত্যের যাহারা স্রষ্টা, বাংলা ভাষাকে যাঁহারা রূপ দিয়াছেন, বাংলা সাহিত্য যাঁহাদের লেখনী প্রসূত হইয়া জগতে সমাদর লাভ করিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদেরই একজন। তখনকার এইরূপ সাহিত্য মহারথিগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভারের মধ্যে দিয়াও তাঁহারা সাহিত্যের শ্রীসৃষ্টি, শ্রীবৃদ্ধি ও সেবা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রমুখ অনেকেই এইরূপ উচ্চপদে আরূঢ় ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালও এইরূপ গভর্নমেন্টের উচ্চপদে সমাসীন থাকিয়া সাহিত্য-সেবাব্রতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়[১] কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। ১২৭০ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন (১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ)। মাত্র ৫০ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের ছাত্রজীবনের প্রথম দিক কৃষ্ণনগরেই কাটে। তিনি বাল্যাবস্থায় বহুদিন

ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছিলেন। পরে আরোগ্যলাভ করিয়া স্কুলে ভরতি হন ও নিয়মিত অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল হুগলি কলেজে যান এবং সেই কলেজ হইতে বি. এ পরীক্ষা পাশ করেন।

১২৯১ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রেভেলগঞ্জ স্কুলে হেডমাস্টার[৪] হন। এই সময়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে রাজকীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। যথাকালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে সেটেলমেন্টের[৫] কার্যে নিযুক্ত করেন। এই সূত্রে কিছুদিন সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্য করিয়া পরে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট[৬] হন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ[৭] করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি আবগারি বিভাগের প্রথম ইনস্পেকটার নিযুক্ত হন ও তাঁহার কর্ম জীবনের শেষের দিকে বাঁকুড়ায় কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চা করিতেন। তিনি যেমন সুপুরুষ ছিলেন তেমনই সুরসিক, সদ্‌বক্তা ও সুকণ্ঠ ছিলেন। ছাত্রজীবন হইতেই নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতালোচনার সংবাদ পাইলে সেস্থানে অত্যধিক জনসমাগম হইত। একে তাঁহার লিখিত সঙ্গীত সুললিত ভাষা, সুমধুর ঝঙ্কার ও কবিত্বপূর্ণ, তাহাতে আবার তাঁহারই মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত সুর-তান-লয় বিশিষ্ট ; সুতরাং তাহা যে অতীব হৃদয়গ্রাহী হইত তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি কোথাও আসিয়াছেন এ সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র চারিদিক হইতে লোকের আগমন হইত ; তাঁহার সঙ্গীত আলাপন না শুনিয়া তাহারা তাঁহাকে ছাড়িত না।

তাঁহার হাসির গানগুলি যেমন মিষ্ট ও রসপূর্ণ, তাঁহার স্বদেশ সঙ্গীতগুলি তেমনি বীরত্বব্যঞ্জক ও ভাবপূর্ণ। অন্যান্য গানগুলিও তেমনি মধুর কবিত্বপূর্ণ। ফলত সঙ্গীত রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার "আমার জন্মভূমি"[৮] "আমার দেশ"[৯] "বঙ্গভাষা"[১০] "ভারতবর্ষ"[১১] প্রমুখ গানগুলি চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। সঙ্গীতের এক একটি পদের মধ্যে দেশের অতীত গৌরবের ইতিহাস কি ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা, "আমার দেশ" গানটিতে অতি সুন্দর রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বঙ্গজননীকে সম্বোধন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন ঃ—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়;
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ ;
তুই কিনা মাগো তাদের জননী, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ।
উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার ;
আজিও জুড়িয়া অর্ধজগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে তাঁর।
অশোক যাহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ ;
তার কিনা এই ধূলায় আসন তার কিনা এই ছিন্ন বেশ।"

সঙ্গীতের শেষ চরণে স্বদেশ-উন্মাদনা মূর্ত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাই কবি গাহিতেছেন ঃ—

যদিও মা তোর দিব্য আলোক ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর ;
কেটে যাবে মেঘ নবীন আলোক ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।
দেবী আমার, সাধনা আমার স্বর্গ আমার, আমার দেশ!"

পঠদ্দশার পর হইতেই তিনি নানা পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। ভারতী,[১২] নব্যভারত,[১৩] প্রবাসী,[১৪] প্রভা[১৫] প্রমুখ তখনকার দিনের মাসিক পত্রাদিতে তিনি প্রায়ই প্রবন্ধ লিখিতেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি নাটক, প্রহসন ইত্যাদিও লেখেন। সঙ্গীত রচনার ন্যায় নাটকেও তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। সেগুলি তাঁহার স্বদেশপ্রাণতার অফুরন্ত উৎস। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন যে, যে সব চরিত্রের তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সে সব দেবচরিত্র। সুতরাং তাঁর লেখনী হইতে মনুষ্য চরিত্র সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে তিনি 'নূরজাহান'[১৬] ও 'সাজাহান'[১৭] রচনা করেন। 'রাণা প্রতাপ',[১৮] 'দুর্গাদাস',[১৯] 'মেবার পতনে'[২০] এইরূপ দেবচরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। তাঁহার 'তারাবাঈ',[২১] 'কল্কি অবতার,'[২২] 'আর্য্যগাথা',[২৩] 'আষাঢ়ে',[২৪] 'হাসির গান'[২৫] 'ত্র্যহস্পর্শ',[২৬] 'বিরহ',[২৭] 'পাষাণী'[২৮] ইত্যাদি যথেষ্ট সমাদর লাভ করে।

ইংল্যান্ড বাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল "Lyrics of Ind"[২৯] নামে একখানি ইংরেজি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। তথায় তিনি ইংরেজি সঙ্গীতবিদ্যা ও রচনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি "Crops of Bengal"[৩০] নামক কৃষিবিদ্যা বিষয়ক একখানি ইংরেজি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

জীবনের শেষভাগে তাঁহার বিখ্যাত 'চন্দ্রগুপ্ত'[৩১] এবং 'পরপারে',[৩২] নাটক প্রকাশিত হয়। 'ভীষ্ম',[৩৩] 'সিংহল বিজয়'[৩৪] ও 'বঙ্গনারী',[৩৫] এই তিনখানি পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। 'মন্দ্র',[৩৬] 'আলেখ্য'[৩৭] ও 'ত্রিবেণী'[৩৮] তাঁহার আগের লেখা।

সাহিত্য আলোচনার জন্য তিনি একটি নূতন ধরনের সাহিত্য মজলিস সৃজন করেন। তাঁহার নাম হয় "পূর্ণিমা মিলন"[৩৯]। ইহা ছিল সাহিত্যসেবীদের আলাপ-পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদানের মাসিক সম্মিলন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য প্রতিভা যে কত বড় ছিল তাহা পরিমাণ করা যায় না। ১৩২০ সালে তিনি দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মাসিক পত্র "ভারতবর্ষের"[৪০] সম্পাদক হইয়া তাহা প্রকাশে অগ্রসর হন এবং তাহারই কার্যে ব্যাপৃত থাকাকালীন হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হওয়ায় পরলোক গমন করেন।[৪১] তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশের ও বাংলা ভাষার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার আর পূরণ হইবে কি না সন্দেহ।

বিপিনচন্দ্র পাল

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ বাংলা দেশের পক্ষে এক স্মরণীয় বৎসর। যে কোনো দেশেই প্রথম যখন জাতীয়তা-প্রচার আরম্ভ হয়, তখন সে দেশ আপনাকে যেভাবে জাতীয়তার সহিত মিশাইয়া দেয়, তাহা সেই দেশ ও জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। সেইজন্যই বাংলাদেশের ও বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে উল্লেখযোগ্য। ঐ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে যে জাতীয়তা-প্রচার-কার্য আরম্ভ হইয়াছিল, সেই প্রচার-কার্যের সহিত বহু বাঙালির নাম ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আমরা এখানে যে দেশপ্রেমিকের কথা বিবৃত করিব, সেই স্বর্গত মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় উক্ত প্রচারকার্যের একজন প্রথম ও প্রধান সহায়ক ছিলেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ৭ নভেম্বর শ্রীহট্ট জেলার পইক নামক গ্রামে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র পাল গভর্নমেন্টের চাকরি করিতেন—তিনি মুনসেফ ছিলেন। শ্রীহট্ট গভর্নমেন্ট স্কুলে প্রথম শিক্ষালাভের পর বিপিনচন্দ্র কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করিতে আসেন। সে সময়ে 'সঞ্জীবনী'[১] সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, খ্যাতনামা দেশসেবক ও অ্যাটর্নি ভূপেন্দ্রনাথ বসু,[২] সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র[৩] প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। কলিকাতায় সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল ; সেজন্য বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পুত্রের এই ধর্মত্যাগ হিন্দু পিতা সহ্য করিতে পারেন নাই—তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। পিতা পুত্রের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করায় পুত্রকে দারুণ অর্থকষ্টে পতিত হইতে হইল। এফ. এ পাশ করার পর আর তাঁহার কলেজের বেতন দিবার সামর্থ্য ছিল না। কাজেই তিনি কটক কলেজে অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু সে কাজ অধিক দিন স্থায়ী না হওয়ায় তিনি ব্যাঙ্গালোরে "নারায়ণস্বামী মুদালিয়ার" বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য করিতে বাধ্য হন।

কিন্তু শিক্ষকতা অপেক্ষা মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্য বিপিনচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল। শিক্ষকতার মোহ তাঁহাকে অধিক দিন আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় বহু ব্রাহ্ম তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবনমোহন দাশ মহাশয় "ব্রাহ্ম জনমত"[৪] নামে কলিকাতায় একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্রের বন্ধুগণ তাঁহার জন্য ঐ কাগজের সম্পাদন ভার সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিলে বিপিনচন্দ্র

ব্যাঙ্গালোরের কর্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। যে দিকে বিপিনচন্দ্রের প্রতিভা পরে প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই সংবাদপত্রের সম্পাদকের জীবন এইভাবে তাঁহার আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত কাগজ অধিক দিন না চলায় বিপিনচন্দ্র লাহোরের 'ট্রিবিউন'[৫] পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। পরে যে কংগ্রেস আন্দোলন বিপিনচন্দ্রের সমগ্র জীবনের সাধনার বস্তু হইয়াছিল, 'ট্রিবিউনে' কাজ করিবার সময় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র সেই কংগ্রেসে প্রথম যোগদান করেন। সেই সময়ে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বিপিনচন্দ্রের পরিচয় ঘটে এবং তিনি সুরেন্দ্রনাথ-পরিচালিত দলে যোগদান করেন। বিপিনচন্দ্রের মত মধ্যে মধ্যে পরিবর্তিত হইলেও তিনি স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ, যশ প্রভৃতি অতি সহজেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। তিনি দেশসেবা ও সংবাদপত্র সেবাকেই জীবনের মহান্ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কখনও অর্থ বা যশের প্রার্থী ছিলেন না। তাঁহার কার্য তাঁহাকে যশের মুকুট প্রদান করিলেও তাঁহাকে কোনো দিন অর্থের অধিকারী করে নাই। ইহাই হয়তো তাঁহার জীবনের অভিশাপ ছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া শৈশবে পিতার সহিত মতভেদের ফলে তাঁহার যে দারিদ্র্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনের সাথী হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে কখনও কেহ দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখে নাই। তিনি সকল সময়েই নিজের দারিদ্র্যের কথা অকপটে প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার স্বাধীন চিন্তাধারা ও আত্মসম্মান জ্ঞানের জন্য কোথাও তিনি অধিক দিন চাকরি করিতে পারেন নাই। 'ট্রিবিউনের' কার্য ছাড়িয়া দিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। উক্ত লাইব্রেরি মেটকাফ হলেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি আখ্যা লাভ করিয়াছে। এই কর্ম করিবার সময় তাঁহার পড়াশুনার অপূর্ব সুযোগ ঘটে; সেই সময়ে তিনি বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। রাজনীতিচর্চা ও ধর্মচর্চা উভয়ই তাঁহাকে সমানভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেজন্য তিনি রাজনীতি ও ইতিহাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদ ও পুরাণগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন; তাঁহারা তাঁহার ধর্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি কলিকাতা হইতে 'হিন্দু রিভিউ''[৬] নামক যে মাসিক পত্র প্রচার করিতেন, তাহা ইউরোপ ও আমেরিকার ধর্মযাজক ও প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ কর্তৃক সাদরে পঠিত হইত। আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য তিনি বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং কয়েকবার পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ভ্রমণ করিয়া ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতে যাইয়া তিনি বিলাতি ভাবাপন্ন হন নাই। আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের সভায় বক্তৃতা করিতে যাইবার সময় তিনি ধুতি, পাঞ্জাবি ও চাদর ব্যবহার করিতেন। সে সময়ে তাঁহার এরূপ সুনাম প্রচারিত হইয়াছিল যে তিনি ইচ্ছা করিলে সে সময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া আনিতে পারিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের পর পাশ্চাত্য দেশে আর কেহ তাঁহার মত সম্মান লাভ করেন নাই।

সংবাদপত্রের সম্পাদকের জীবন গ্রহণ করায় তাঁহাকে বহু সাময়িক পত্রের সংশ্রবে আসিতে হইয়াছিল। তিনি 'নিউ ইণ্ডিয়া',[৭] 'বন্দেমাতরম্',[৮] 'ডেমোক্রাট',[৯] 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট'[১০] প্রভৃতি বহু দৈনিক পত্রের সম্পাদনের কাজ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্বদেশীর মন্ত্র প্রচারের জন্য 'বন্দেমাতরম্' নামক যে ইংরেজি দৈনিক প্রকাশিত হইয়াছিল, বিপিনচন্দ্র তাহার অন্যতম লেখক ছিলেন। তিনি ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সমানভাবে প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। তাঁহার উভয় ভাষায় লিখিত প্রবন্ধই সমান সমাদর লাভ করিত।

তাঁহার প্রবন্ধগুলি চারিদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে ; সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে বহু সংখ্যক পুস্তক হইতে পারিত। বিপিনচন্দ্রের রচিত 'শোভনা',[১১] 'ভারত সীমান্তে রুশ',[১২] জেলের কথা',[১৩] 'ভারতের জাতীয়তা',[১৪] 'চরিত্র চিত্র',[১৫] 'গল্পগ্রন্থ',[১৬] 'সত্যমিথ্যা',[১৭] 'ভারতের আত্মা',[১৮] 'জাতীয়তা ও সাম্রাজ্য'[১৯] প্রভৃতি পুস্তক যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছে। তিনি যে আত্মজীবনী[২০] লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই বটে কিন্তু তাহার প্রথমাংশ ইতিহাসের দিক দিয়া এক অপূর্ব সামগ্রী হইয়াছে।

দেশসেবা করিতে যাইয়া তাঁহাকে বহুবার কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। 'বন্দেমাতরম্' পত্রের প্রথম রাজদ্রোহ মামলার সময় গভর্নমেন্ট পক্ষ তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করিলে তিনি গভর্নমেন্ট পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হন ও সেজন্য তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। তাহার পর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁহাকে দ্বিতীয় বার জেল খাটিতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রনেতা বাল গঙ্গাধর তিলক[২১] হোমরুল আন্দোলন[২২] আরম্ভ করিলেন বিপিনচন্দ্র তাহাতে যোগদান করেন এবং বিলাতে যাইয়া এখানে 'স্বরাজ'[২৩] পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। সেই প্রবন্ধটি রাজদ্রোহসূচক বিবেচিত হওয়ায় তিনি বোম্বাইয়ে অবতরণ করা মাত্রই গভর্নমেন্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁহার এক মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক যখন এদেশে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন বিপিনচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি লইয়া নেতৃবৃন্দের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি উক্ত আন্দোলন ত্যাগ করেন। তাহার পূর্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এলাহাবাদ হইতে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' নামক এক ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বিপিনচন্দ্রকে উক্ত পত্রের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন পণ্ডিত মতিলাল ব্যারিস্টারি কার্য ত্যাগ করেন নাই। সে সময়ে তাঁহার মত অর্থশালী ব্যক্তি ঐ অঞ্চলে অতি অল্পই ছিল। বিপিনচন্দ্রের এলাহাবাদ বাসকালে সুখসমৃদ্ধির কোনই অভাব ছিল না। কিন্তু কাগজের মত লইয়া পণ্ডিত মতিলালের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি ঐ চাকরি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। আবার তাঁহাকে সেই দারিদ্র্যের কঠোর পেষণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি সুরেন্দ্রনাথের

'বেঙ্গলি' পত্রের এবং ঘোষ ভ্রাতৃগণের 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সহিত প্রায় সারাজীবনই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার জন্য লোকে তাঁহার রাজনীতিক মতকে সর্বদাই শ্রদ্ধা করিত।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তাঁহার সহিত আর কোনো সংবাদপত্রেরই সম্পর্ক ছিল না। তিনি স্বদেশী যুগে যেমন অভূতপূর্ব সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তেমনই দেশের লোকের দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া অনাদৃতভাবেই চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাগ্মিতা তাঁহাকে সমগ্র ভারতে জনপ্রিয় কবিয়াছিল। কি ইংরেজি, কি বাংলা—তাঁহার যে কোনো ভাষার বক্তৃতাই শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিত। তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতাও যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ ছিল। বাংলার ইতিহাসে বিপিনচন্দ্রের নাম চিরদিন উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।*

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র

কাশিমবাজারের রাজবংশ[১] দানশীলতার জন্য ভারতবিখ্যাত। এই বংশের ধনসম্পদও যেমন প্রচুর, অর্থের সদ্‌ব্যবহার কিরূপে করিতে হয় তাহাও পুরুষানুক্রমে এই বংশীয়গণের অধিগত। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী[২] এই বংশের দৌহিত্র-সন্তান হইয়াও উত্তরাধিকার-সূত্রে বিষয়সম্পত্তির সহিত বংশগত দানশীলতারও অধিকারী হইয়াছিলেন। সাধারণের হিতকর কার্যে তাঁহার ধনাগারের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত। মুক্তহস্তে দান করিয়া তিনি বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

১২৬৭ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ কলকাতা শ্যামবাজারে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় (১৮৬০ খ্রিঃ)। তাঁহার পিতা নবীনচন্দ্র নন্দী[৩] কাশিমবাজার রাজবাড়ির জামাতা ছিলেন; মহারাজা লোকনাথ রায়ের পৌত্রী, রাজা হরনাথ[৪] রায়ের কন্যা গোবিন্দসুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রাজা কৃষ্ণনাথ[৫] হরনাথের একমাত্র পুত্র ছিলেন। কৃষ্ণনাথের পুত্র ছিল না ; দুইটি মাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল, তাঁহারা অকালে মারা যান। কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ী বিষয়াধিকারিণী[৬] হন। দানশীলতার জন্য তিনি সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করেন এবং সরকার হইতে সম্মানলাভ করেন। কৃষ্ণনাথ পত্নীকে কিছু লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, সেই শিক্ষাগুণে তিনি দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ের সহায়তায় সুবৃহৎ জমিদারির কার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় থাকিতেন।

* বিপিনচন্দ্রের মৃত্যু ২০.৫.১৯৩২

তাঁহার নিজের জন্য ব্যয় কিছু ছিল না বলিলেই হয়; কিন্তু জনহিতকর কার্যে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শাশুড়ী রাণী হরসুন্দরী বিষয়াধিকারিণী হন; কিন্তু তিনি দৌহিত্র মণীন্দ্রচন্দ্রকে সম্পত্তির অধিকার অর্পণ করিয়া কাশীবাস করিতে থাকেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় মণীন্দ্রচন্দ্র এই বিপুল সম্পত্তি[৭] লাভ করেন (১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁহার পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তাঁহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাঁহার জননীর মৃত্যু হয় এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহাকে কাশিমবাজার রাজসংসার প্রদত্ত মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া বৃহৎ পরিবার পালন করিতে হইয়াছিল। তাহার পর মাতামহের সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে আসে।

জীবনের প্রধান ভাগ মধ্যবিত্ত গৃহস্থভাবে কাটাইয়া তিনি যে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার ফলস্বরূপ তিনি মাতামহের বিপুল সম্পত্তি সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রও বিলাসবর্জিত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জমিদারির প্রায় সমগ্র আয় জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইত। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সদনুষ্ঠানে তাঁহার ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় চারি কোটি টাকা। বহরমপুরে মাতুলের স্মৃতিচিহ্ন কৃষ্ণনাথ কলেজে তিনি প্রতি বৎসর ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। কলেজ ও স্কুলসংলগ্ন ছাত্রাবাসের জন্য বৎসরে আরও ১৫ হাজার টাকা দিতেন। কলেজবাটীর সংস্কার সাধনার্থ তিনি দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বহরমপুরে একটি শিল্প-বিদ্যালয় ও একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার ছিল এবং মেডিক্যাল স্কুলের জন্য ৫০ হাজার টাকা তিনি গভর্নমেন্টের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় নাই—স্কুল দুইটি স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার প্রদত্ত অর্থে কলিকাতায় একটি শিল্প-বিদ্যালয় ও তৎসহ একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় এবং ইথোরায় একটি খনি-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নানাস্থানে আরও কয়েকটি উচ্চ ও মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সেইগুলির পরিচালনের জন্য তিনি বৎসরে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। তিনি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই লক্ষ টাকা এবং আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-কলেজে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। রংপুর কলেজে তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দৌলতপুর কলেজ, পুরী বেদ বিদ্যালয়, দিল্লির মহিলা ডাক্তারি স্কুল প্রভৃতি আরও নানা প্রতিষ্ঠানে তিনি অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন। দুঃস্থ ছাত্রগণের সাহায্যার্থ তিনি সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার অর্থ-সাহায্যে বহু বঙ্গীয় যুবক বিদেশে গিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবন বলিতে গেলে একটি নিরবচ্ছিন্ন দানের ইতিহাস।

দেশে জ্ঞানালোকের বিস্তার, বিশেষ করিয়া শিল্পশিক্ষার বিস্তারের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ও আগ্রহ ছিল। স্বদেশীর যুগে প্রধানত তাঁহার আগ্রহে ও আংশিক অর্থ-সাহায্যে বাংলায় সর্বপ্রথম চিনামাটির বাসনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠার

উদ্যোগ হইলেই তিনি প্রচুর অংশ ক্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠাতৃবর্গকে উৎসাহিত করিতেন। তিনি নিজেও কলকারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পের প্রসারের জন্য প্রভূত চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতেন। কলকারখানায় ও ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগ করিয়া অর্থলাভ অপেক্ষা শিল্পবাণিজ্যের বিস্তৃতি সাধন তাঁহার বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল। এইরূপ নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার ফলে, কোন কলকারখানা উঠিয়া গেলে বা ব্যবসায় ফেল করিলে অর্থনাশের আশঙ্কা তাঁহাকে একটুও বিচলিত করিতে পারিত না। পক্ষান্তরে কোন শিল্পবাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান সফলতা লাভ করিলে, দেশের ও জনসাধারণের মঙ্গলের কথা ভাবিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহার রাজোচিত দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কয়েকজন সদস্য মহারাজের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইবামাত্র পরিষদের গৃহ-নির্মাণার্থ তিনি আপার সারকুলার রোডে হালসিবাগানে বহুমূল্য জমি দান করেন।[৮] বার্ষিক বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনেরও তিনি প্রথম ও প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহারই গৃহে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর বদান্যতাগুণে প্রসন্ন হইয়া গভর্নমেন্ট তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে বংশানুক্রমে মহারাজা উপাধিদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গভর্নমেন্ট ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে তারিখে মণীন্দ্রচন্দ্রকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন এবং সেই প্রতিশ্রতি অনুযায়ী মণীন্দ্রচন্দ্রের লোকান্তরের পর তাঁহার পুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় মহারাজা হইয়াছেন।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র যে কেবল দানশীলতার জন্যই প্রসিদ্ধ তাহা নহে, সামাজিকতায়ও তিনি রাজবংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বিনয়, আড়ম্বরশূন্যতা, ধর্মনিষ্ঠা, মহানুভবতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন; বৈষ্ণবোচিত বিনয় তাঁহার সহজাত সংস্কার-স্বরূপ ছিল।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে. সি. আই. ই উপাধি লাভ করেন। ১৩৩৬ সালের ২৫ কার্তিক তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের কথা বলিতে গেলেই তাঁহার বংশগৌরবের কথাই সর্বাগ্রে বলিতে হয়। একই বংশে, দুই তিন পুরুষের মধ্যে, এত অধিকসংখ্যক সম্মানিত ব্যক্তির জন্ম সাধারণত দেখা যায় না। বিদ্যার ও যশের গৌরবে এমন গৌরবান্বিত বংশ বাংলাদেশে আর বেশি নাই বলিলেই হয়। একটি মাত্র উদাহরণে এই গৌরবের কথা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় এককালীন ছয় জন সদস্য বাংলার অপর কোনো বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সর্বাধিকারী বংশের প্রসন্নকুমার,[১] সূর্যকুমার,[২] রাজকুমার,[৩] দেবপ্রসাদ, সুরেশপ্রসাদ[৪] ও জ্যোতিঃপ্রসাদ[৫]—এই ছয় জনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্য হইয়া বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। দেবপ্রসাদ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশকে আরও গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছেন।

লোকে সাধারণত অর্থোপার্জন লইয়াই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। দেবপ্রসাদ অ্যাটর্নি ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা কৃতী অ্যাটর্নিগণের জীবনকথা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিগণের কার্যের দায়িত্ব কত অধিক এবং কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদিগকে অর্থাজন করিতে হয়। কিন্তু সেই কার্যের মধ্যেও স্যার দেবপ্রসাদ বহু জনহিতকর ও দেশহিতকর কার্যে যোগদান করিবার অবসর করিয়া লইতেন। তিনি যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহাদের কয়েকটির নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা হইতে তাঁহার বহুমুখী কর্মপ্রতিভার বিষয় কতকটা অবগত হওয়া যায় ঃ—কলিকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিস্টিটিউট, রেফিউজ, গীতা সভা, মাদকতা নিবারণী সভা, বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের পরিচালন সভা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ইনকর্পোরেটেড ল সোসাইটি, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ, বৌদ্ধবিহার, বিলাতের ইউনিভারসিটি কংগ্রেস, লর্ড লিটনের স্টুডেন্টস্ কমিশন, হেগ্ মরাল এডুকেশন লীগ, দক্ষিণ আফ্রিকায় গভর্নমেন্টের ডেপুটেশন, জেনিভায় জাতিসংঘ, ঢাকা, দিল্লি ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা, বেঙ্গল কাউন্সিল, কাউন্সিল অব্ স্টেট প্রভৃতি।

এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যে যোগদান ও কার্য পরিচালন ব্যবস্থা করিয়াও সর্বাধিকারী মহাশয় সাহিত্য-চর্চার অবসর করিয়া লইতেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজি বহুসংখ্যক সাময়িক পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি 'প্রবাস পত্র',[৬] 'ইউরোপে তিন মাস',[৭] 'দক্ষিণ

আফ্রিকার দৌত্য কাহিনী',[৮] 'জেনিভা ভ্রমণ',[৯] 'স্মৃতিরেখা',[১০] 'সনাতনী',[১১] 'আবেগ ও উচ্ছ্বাস'[১২] ইত্যাদি বহু বাংলা পুস্তক এবং *Notes and Extracts,*[১৩] *Thoughts and Problems*[১৪] প্রভৃতি কয়েকখানি ইংরেজি পুস্তকও লিখিয়া গিয়াছেন।

দেবপ্রসাদ বিনয়গুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি নিজেকে কখনও প্রচার করিতে চাহিতেন না, বা অপর কেহ করে তাহাও ভালবাসিতেন না। তাঁহার অকৃত্রিম বিনয়ের একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। ঢাকার সারস্বত সমাজের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে উপাধিদান কালে সভাক্ষেত্রে তাঁহার গুণকীর্তন করিয়া বলেন যে তিনি সকল গুণের অধিকারী বলিয়াই 'সর্বাধিকারী'। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সকলেরই তাঁহার উপর অধিকার আছে বলিয়াই তিনি 'সর্বাধিকারী', নচেৎ নহেন।

বাল্যজীবনে দেবপ্রসাদ হেয়ার স্কুল, সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন ; এবং পরবর্তী জীবনে উক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালক-কমিটির সদস্য হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছাত্রজীবনে যে-সকল শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই। হেয়ার স্কুলে তখন যে-সকল শিক্ষক কার্য করিতেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষাজগতের এক একজন দিকপাল ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কতকটা সেজন্য সে যুগের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্যার দেবপ্রসাদের সময়ে হেয়ার স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে কোন্নগর নিবাসী গিরিশচন্দ্র দে, বাঁশবেড়িয়ার নীলমণি চক্রবর্তী, মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরলাল রায়, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রভৃতি সকলেই খ্যাতনামা ছিলেন। স্যার দেবপ্রসাদ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে হেয়ার স্কুল হইতে এনট্রান্স পাশ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজেও বহু কৃতী অধ্যাপকের নিকট তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার সৌভাগ্য হইয়াছিল। দেবপ্রসাদের জ্যেষ্ঠতাত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী সে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন; পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলায় পাটীগণিত,[১৫] বীজগণিত[১৬] ইত্যাদি অঙ্কপুস্তক প্রণয়ন করেন। তখনকার অধ্যাপকগণের মধ্যে ডাক্তার পি. কে. রায়, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার,[১৭] রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,[১৮] রো, ওয়েব, পার্সিভাল, টনী, সাট্‌ক্লিফ প্রভৃতির নাম শিক্ষিত সমাজের সকলেই জানেন।

এম. এ, বি. এল পাশ করিয়া স্যার দেবপ্রসাদ খ্যাতনামা অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হইয়াছিলেন এবং পরে 'মিত্র এণ্ড সর্বাধিকারী' নামে অফিস চালাইয়াছিলেন। ধনী হইয়াও তিনি আদৌ বিলাসী ছিলেন না। তাঁহার সাদাসিধা জীবনযাত্রা- প্রণালী সকলকেই মুগ্ধ করিত এবং সকলের আদর্শস্বরূপ ছিল। পিতার দ্বিতীয় পুত্র হইয়াও নিজগুণে তিনি বংশের সকলের পরামর্শদাতা এবং সহায়ক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় বাহাদুর ডাক্তার সত্যপ্রসাদ চীফ অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার চতুর্থ সহোদর ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সুবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন এবং

তাঁহার সপ্তম সহোদর মণীন্দ্রপ্রসাদ খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। অপর ভ্রাতারাও সকলেই কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁহার বংশে তিনজন গভর্নমেন্ট কর্তৃক 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

দেবপ্রসাদের পিতা রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী যৌবনে সরকারি চাকরি লইয়া যুক্ত-প্রদেশের বাস করিতেন এবং সিপাহি বিদ্রোহের সময় Brigade Surgeon রূপে গাজীপুরে থাকিয়া নিজ অসাধারণ বুদ্ধিবলে বহু ইংরেজের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সেস্থানে আট দিন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ থাকিয়া সূর্যকুমারকে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছিল; তাহার পর কাশী হইতে বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য গাজীপুরে যাইয়া সকলের প্রাণরক্ষা করে। দেবপ্রসাদের পিতামহ যদুনাথ পদব্রজে ভারতবর্ষের প্রায় সকল তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই ভ্রমণ কাহিনি প্রত্যেক দিনের "রোজনামচা"[১৯] রূপে স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ পুস্তক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'তীর্থভ্রমণ'[২০] নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

দেবপ্রসাদ গভর্নমেন্টের নিকট হইতে সি. আই. ই, সি. বি. ই ও স্যার উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং নবদ্বীপ প্রমুখ বহু স্থানের পণ্ডিত-সমাজ কর্তৃক বহু উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনিই বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য তিনি প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু যিনিই ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন তিনিই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার কাছে বড়-ছোটর কোন প্রভেদ ছিল না, সকলকেই তিনি সমান আদরে স্থান দিতেন এবং তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাকে সত্যই অজাতশত্রু বলা চলে। তাঁহার মৃত্যুর পর ছোট-বড় সকলেই এই বলিয়া শোক করিয়াছেন যে, 'আমাকেই তিনি সকলের অপেক্ষা বেশি ভালবাসিতেন।'

দেবপ্রসাদের জন্মস্থান হুগলি জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রাম, যেখানে মহাত্মা রামমোহন রায়ও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রধানত তাঁহার চেষ্টাতেই ঐ গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং 'রাধানগর পল্লীসমিতি' ও 'প্রসন্নকুমার পাঠাগার' বলিয়া দুইটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার এই সকল মহদনুষ্ঠান হইতেই বুঝা যায় যে তিনি কখনও রাজধানীর মোহে গ্রাম ও দেশকে ভুলেন নাই! অদ্ভুত ছিল তাঁহার সংযম ও স্বার্থত্যাগ। জীবনে কেহ কখনও তাঁহাকে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া একটিমাত্র অন্যায় বা রূঢ় বাক্যও উচ্চারণ করিতে দেখে নাই।

দেবপ্রসাদ যে সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সে সময়ে নানাকারণে তাঁহাকে বিশেষ ধীরতা, সংযম ও বুদ্ধিমত্তার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি কর্মে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বাঙালি যুবকের প্রথম সামরিক শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেন। তাঁহার চেষ্টায় University Corps-এর সভ্যগণ কনভোকেশনে প্রথম সামরিক পরিচ্ছদ পরিয়া কুচকাওয়াজ দেখাইয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। এখন

পর্যন্ত সেই স্মরণীয় দিন Khaki Convocation Day বলিয়া গৌরবের সহিত অভিহিত হয়।

ছাত্রমণ্ডলীর উপর তাঁহার এত প্রগাঢ় স্নেহদৃষ্টি ছিল যে, চিরজীবন তিনি ছাত্রদিগের জন্যই পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন এবং নিজেকেও শেষ পর্যন্ত একজন ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। প্রধানত তাঁহার চেষ্টাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্টুডেন্টস্ ফাণ্ড' স্থাপিত হইয়াছে এবং তিনি ইহাতে প্রচুর অর্থদান গিয়াছেন।

বিদ্যাক্ষেত্রের ন্যায় ক্রীড়াক্ষেত্রেও দেবপ্রসাদের প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়াছিল। তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় ছিলেন এবং তিনিই বাঙালির মধ্যে ক্রিকেট খেলার প্রবর্তন করেন। তাঁহার পঞ্চম সহোদর নগেন্দ্রপ্রসাদও সেইরূপ ফুটবল খেলার প্রচলন করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রতিভা ও কর্মশক্তি যে বহুমুখী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি কেবল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, ব্যাঙ্ক এবং ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ডিরেক্টার ও চেয়ারম্যান থাকিয়া দেশের ব্যবসায়েও যথেষ্ট সহায়তা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে বহু প্রসিদ্ধ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান প্রধানত তাঁহার চেষ্টার ফলেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শেষজীবনে গীতা সভা, রেফিউজ ও বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাসমিতি লইয়া তাঁহাকে যেরূপ কঠোর শ্রম করিতে দেখা যাইত, তাহা সাধারণত দেখা যায় না। সকলের জন্যই সর্বদা তাঁহার গৃহদ্বার খোলা থাকিত এবং উপদেশ ইত্যাদির দ্বারা সহায়তা করিতে কখনও তাঁহাকে বিমুখ দেখা যায় নাই।

শিক্ষার সহায়তা, অর্থ উপার্জন, জনসেবা প্রভৃতি কার্যের সঙ্গে সঙ্গে দেবপ্রসাদ ধর্মচর্চাতেও বহু সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন এবং যখন গীতা, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ করিতেন তখন উহা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি ধর্মবিষয়ক বহু সভা ও প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারস্বরূপ ছিলেন। দেবপ্রসাদ কীর্তনগানের বড়ই অনুরাগী ছিলেন। দেশের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াগণ প্রায়ই তাঁহার 'প্রসাদপুর' ভবনে সমবেত হইয়া কীর্তনগানে সকলকে প্রচুর আনন্দদান করিতেন।

স্যার দেবপ্রসাদ যে-সকল গুণের অধিকারী ছিলেন এবং যে-সকল মহান্ কার্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সামান্য মাত্র উল্লেখ করা হইল। তিনি অল্পদিন হইল লোকান্তরিত[২১] হইয়াছেন। তাঁহার কর্মপ্রেরণা, আদর্শ ও ত্যাগে তরুণ বাংলা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে এ আশা অনায়াসেই করা যায়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

মহাত্মা তুলসীদাসের গান বা গাথা মধুর, মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার রচিত একটি গাথার যদি রূপান্তর করা যায় তবে সেটি এমন ভাবে দাঁড়াইতে পারে—

প্রথম যেদিন এসেছিলে ভবে,
কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিল সবে,
সফল জীবন প্রয়াণে হাসিবে,
তোমার বিহনে সকলে কাঁদিবে।*

অর্থাৎ তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদিয়া উঠিয়াছিলে, কিন্তু তখন সকলে আনন্দে হাস্য করিয়াছিল। এমন কাজ করিয়া যাও, যেন তুমি চলিয়া যাইবার সময়ে হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইবার সময়ে হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইও, আর তোমার জন্য সকল লোকে ক্রন্দন করে। জীবনধারণ তাঁহারই সার্থক, যিনি চলিয়া গেলে চারিদিকে একটা হাহাকার উঠে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে এমনি ভাব দেখা যায়। তিনি এমন পবিত্র জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, এমন সকল কার্য করিয়াছেন, এমন ভাবে জীবন-ব্রত উৎযাপন করিয়া গিয়াছেন যে, যাইবার সময় তিনি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার অভাবে বাংলার শিক্ষিত সমাজ অশ্রুপাত করিয়াছে।

তাঁহার মনীষা, সদ্‌গুণরাশি, শুদ্ধ চরিত্র ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য হেতু তিনি শিক্ষিত সমাজে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর নামে পরিচিত ছিলেন। বশ্রন গোত্রীয়, জিঝেতীয়, ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার পিতা ছিলেন। ১২৭২ সালের ৫ ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন (১৮৬৩ খ্রিঃ)[১]।

প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়িয়া তিনি কান্দি ইংরেজি স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন ও ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি ফার্স্ট আর্টস্ পড়িতে আরম্ভ করেন। এখানে তিনি পিতৃব্যের নিকট অবস্থান করিতেন। প্রথমাবধি তিনি অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এফ. এ

* তুলসী যব জগমে আয়া,
জগ হাঁসে তুম রোয়,
এইসী কাম করকে চলো
তুম হাঁস জগ রোয়।”

পরীক্ষায় সুবর্ণপদক লাভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজেই তিনি বি. এ পড়েন। এই সময় হইতে বিজ্ঞানের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ আসিয়া পড়ে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বি. এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানের অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি চল্লিশ টাকা বৃত্তি পান।

তিনি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানের এম. এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এক শত টাকার পুস্তক ও সুবর্ণ পদক পারিতোষিক লাভ করেন। পর বৎসর পদার্থবিদ্যায় ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ বৃত্তির অধিকারী হন।

রামেন্দ্রসুন্দরের কর্মজীবন ছিল শিক্ষা বিভাগে এবং শিক্ষকের কার্যে, মাত্র বিজ্ঞানের বা রসায়নের পরীক্ষার গৃহেই তিনি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেন না ; পরন্তু সভ্য মানবসমাজের অতীত ইতিহাসের গুপ্ত মর্মকথা বলিবার নানা ভাবে নানা চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। জীবতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি মিশর, হিব্রু, গ্রিক ও রোমক ইতিহাসের আলোচনা করিয়া ভারতের সভ্যতার সহিত তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিতে বহু শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে ইতিহাসে তাঁহার প্রবল অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তিনি গ্রিন,[২] হিউম্,[৩] গিবন[৪] ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত ভাষাতেও অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত অধ্যাপক জানকীনাথ ভট্টাচার্য ও রামেন্দ্রসুন্দর একই সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই রাম-জানকীর অপূর্ব সম্মিলনে রিপন কলেজ ধন্য হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর ঐ কলেজে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হন। ২৭ বৎসর অধ্যাপনার পর জানকীর হাতে কলেজের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া রাম মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকসঙঘ সাহিত্যের উৎস সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

দর্শন ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের অতীব প্রিয় ব্যাখ্যান বস্তু। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সেবা তাঁহার অফুরন্ত জ্ঞান-স্পৃহাকে তৃপ্ত করিতে পারিত না। সাংখ্যদর্শনের কাছে জার্মান দর্শনের ঋণ কতটা, রামেন্দ্রসুন্দর এ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর[৫] মহাশয়ের সঙ্গে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের আলোচনা করেন। তাঁহার একটি দার্শনিক প্রবন্ধ পরলোকগত অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়া জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে সে দেশের দার্শনিক মহলে সাড়া পড়িয়া যায়। কিন্তু ৫৫ বৎসর বয়সে তাহার অকাল মৃত্যুতে এই শ্রেণির আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।*

তিনি নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য সম্বন্ধে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি

মৃত্যু ৬.৬. ১৯১৯

ছিলেন তাহার ঋত্বিক্ ও আচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'এক মাত্র সারথী'। তাঁহার গ্রন্থাদির মধ্যে 'প্রকৃতি',[৬] 'জিজ্ঞাসা',[৭] 'কর্মকথা'[৮] ও 'চরিতকথা'য়[৯] তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন।

বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের সেবা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান তাঁহাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি ম্যাক্সওয়েল্[১০] বা কেল্‌ভিনের[১১] ন্যায় খ্যাতিলাভ করিতেন।

রামেন্দ্রসুন্দর যেমন বিজ্ঞান বুঝিতেন ও বুঝাইতেন তেমন এদেশে খুব কম অধ্যাপকই পারিয়াছেন। তিনি খাঁটি মানুষ ছিলেন এবং প্রকৃত জ্ঞানযোগীর ন্যায় জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বর্তমান যুগে যে-সকল বাঙালি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ অসাধারণ প্রতিভাবলে বাংলা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন দেশহিতকর কর্ম অনুষ্ঠানে অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও তেমনিই ব্যবসায়ক্ষেত্রে অতুল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া বাণিজ্যবিমুখ বাঙালি জাতির সম্মান সমগ্র সভ্যজগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বাংলার এক অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ব্যবসায় দ্বারা এত অধিক সুনাম ও অর্থ লাভ করিয়াছিলেন যে, শুধু ভারতবর্ষে নহে, ভারতের বাহিরেও নানাদেশে তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল। যে শ্বেতাঙ্গ বণিকসম্প্রদায় ব্যবসায়ীরূপে এদেশে আসিয়া এদেশের লোককে কখনই নিজেদের সমতুল্য মনে করেন না এবং সাধারণ বাঙালি জাতিকে কেরানির জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারাও রাজেন্দ্রনাথকে শুধু নিজেদের সমান অধিকার প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বহু ক্ষেত্রে তাঁহার অধীনতা পর্যন্ত স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

চব্বিশপরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ভ্যাবলা গ্রামে রাজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভগবানচন্দ্র।[১] রাজেন্দ্রনাথ[২] যখন ছয় বৎসরের বালক তখন ভগবানচন্দ্রের মৃত্যু হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া রাজেন্দ্রনাথ কালীগঞ্জে যাইয়া ইংরেজি বিদ্যালয়ে[৩] শিক্ষারম্ভ করেন। তথায় তাঁহাকে এক আত্মীয়ের বাটীতে বাস করিতে হইত। একবার বসন্তের মহামারি উপস্থিত হইলে রাজেন্দ্রনাথ সে স্থান

ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং বারাসতে এক আত্মীয়ের বাসায়[৪] থাকিয়া ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়িতে থাকেন। কিন্তু সেই আত্মীয়ের গৃহেও তাঁহাকে অধিক দিন বাস করিতে হয় নাই। উক্ত আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে তিনি বারাসত ত্যাগ করেন এবং আগ্রায় মাতুলালয়ে[৫] যাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য কৌশলে তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন,[৬] আর তাঁহার আগ্রা যাওয়া হয় নাই। তখন তিনি কলিকাতায় এক আত্মীয়ের গৃহে থাকিয়া মতিলাল শীলের স্কুলে[৭] পড়িতে থাকেন। এনট্রান্স পাশ করিয়া রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্তর্গত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে[৮] ভরতি হইয়াছিলেন এবং তিন বৎসরে পূর্তবিভাগের কার্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যহানির জন্য উপাধি লাভের পূর্বেই তাঁহাকে কলেজ ছাড়িয়া দিতে হয় এবং তিনি জীবিকার্জনের জন্য জীবন-সংগ্রামে যোগদান করেন।

একটি বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা গণিত শিক্ষা দিয়া তিনি মাসিক ১৫ টাকা উপার্জন করিতেন এবং তাহা দ্বারা কলিকাতার মেসে[৯] বাস করিয়া কার্যের সন্ধানে ফিরিতেন। এই সময়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্রাডফোর্ড লেস্লীর[১০] সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং মিঃ লেস্লীর অনুগ্রহে তিনি পলতায় জলের কল নির্মাণের[১১] কতকগুলি কার্যের কন্ট্রাক্ট প্রাপ্ত হন। ইহাই তাঁহার কর্মজীবনের আরম্ভ। তাহার পর অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে মার্টিন কোম্পানির মত এত বড় একটি কোম্পানি গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমগ্র জীবনই তাঁহাকে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কার্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কর্মের দ্বারা বুদ্ধির প্রখরতা জন্মিয়া থাকে। রাজেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে যত অধিক কাজ পাইতে লাগিলেন, তাঁহার বুদ্ধিও তদনুপাতে প্রখর হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মার্টিন কোম্পানি ক্রমে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় কন্ট্রাক্টর রূপে পরিণত হইল। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে যখন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম বার্ন কোম্পানির অবস্থা খুবই খারাপ হইল, তখন রাজেন্দ্রনাথ উক্ত কোম্পানি ক্রয় করিয়া লইয়া মার্টিন কোম্পানির সহিত উহা সংযুক্ত করিয়া দিলেন। মার্টিন কোম্পানি শুধু কন্ট্রাকটারি কাজ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে নাই, ভারতের বহু শহরে উক্ত কোম্পানি বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছে। সেই সকল শহরে মার্টিন কোম্পানির অনুগ্রহে লোকে সুলভে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। স্যার রাজেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতের বহু স্থানে মার্টিন কোম্পানি কর্তৃক লাইট রেল খোলা হইয়াছে। এই রেলের দ্বারা অতি দূরস্থ পল্লিগ্রামেও লোকের যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে।

শুধু অর্থার্জন লইয়াই রাজেন্দ্রনাথকে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায় নাই, জনহিতকর কার্যেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি কোনোদিন প্রকাশ্যভাবে কোনো রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নাই বটে, কিন্তু অর্থদ্বারা বহু আন্দোলনকে পুষ্ট করিতেন। তাহা ব্যতীত তিনি যে-সকল কমিটিতে যোগদান করিয়া কাজ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটির নাম প্রদত্ত হইল—১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদস্থ শ্রমশিল্প ও আর্থনীতিক সমিতির সভাপতি; ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার শেরিফ পদ গ্রহণ ; ১৯১৬ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত

ভারত সম্রাট কর্তৃক গঠিত শ্রমশিল্প কমিটির সদস্য—মধ্যে কিছুকাল তিনি উক্ত কমিটির সদস্য ; ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ভাগীরথী নদীর সেতু কমিটির সভাপতি; ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির সভাপতি ; ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত গভর্নমেন্টের ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির সদস্য; ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় কয়লা কমিটির সদস্য; ১৯২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মুদ্রানীতি ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কমিটির সদস্য।

ভারতে আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠায় ও অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নতিবিধায়ক কার্যে সকল সময়েই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইত এবং সেজন্য তিনি সারাজীবন বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। নারীশিক্ষার জন্যও তাঁহার কম আগ্রহ ছিল না। তিনি দেশের নানাস্থানের বহু নারী-শিক্ষা সমিতিতে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। আর একটি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত—তাহা বাঙালি যুবকগণের শরীরচর্চা। কাপ্তেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন আজীবন বাঙালি যুবকগণের শারীরিক উন্নতি বিধান বিষয়ে অবহিত থাকিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন, স্যার রাজেন্দ্রনাথও প্রায় তেমনই বাংলা দেশের সকল স্থানের শরীর-চর্চা সমিতিগুলিকে সর্বদাই অর্থ দান করিতেন। রাজেন্দ্রনাথ জিতেন্দ্রনাথের মত ঐ· বিষয়ে অনন্যকর্মা না থাকিলেও কোন ব্যায়াম সমিতিকে তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বিমুখ হইতে হয় নাই। বাঙালির স্বাস্থ্য যে কিভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহা তিনি মনে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এ বিষয়ে তাঁহার এত অধিক আগ্রহ দেখা যাইত।

স্যার রাজেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদান সহজসাধ্য নহে। তবে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন—রাজেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি। ভারতীয়গণ যাহাতে প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য সকল জাতির সহিত সমান অধিকার লাভ করিতে পারে সেজন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাহা ছাড়া নিজ আত্মীয়স্বজন, নিজ গ্রামবাসী, এমন কি নিজ জেলাবাসীরা পর্যন্ত যাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনোরূপ কষ্ট না পায়, সেজন্য তিনি বিধিমত চেষ্টা করিতেন। তিনি নিজের জন্মস্থান ভ্যাবলা গ্রামের উন্নতির জন্য সর্বদাই চেষ্টা করিতেন এবং যাহাতে গ্রামে সকলে সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে, সেজন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সর্বদা শ্বেতাঙ্গগণের সহিত মেলামেশা করিবার জন্য তাঁহাকে য়ুরোপীয় পোষাক পরিধান কবিতে হইত বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর হিন্দুধর্মভাবে পূর্ণ ছিল। তিনি স্বগৃহে সর্বদা হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতেন। তাঁহার গ্রামের বাটীতেও তিনি পূজাপার্বণ প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

কেদারনাথ দাস

পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতিতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভের পর যে সকল বাঙালি মনীষী তাহাদের অপূর্ব প্রতিভা প্রকাশ করিয়া এ দেশবাসীদিগকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, পরলোকগত খ্যাতনামা চিকিৎসক স্যার কেদারনাথ দাস তাঁহাদের অন্যতম। স্যার্ কেদারনাথের মত স্ত্রীরোগ-চিকিৎসক এ যুগে অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি যে ভবিষ্যতে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহা তাঁহার বাল্যজীবনেই বুঝা গিয়াছিল।

কেদারনাথের পিতা যাদবকুমার দাস[১] একজন শিক্ষাজীবী ছিলেন। কেদারনাথ যাদবকুমারের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি[২] মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি হেয়ার স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ পাশ করিয়া কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়িতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে তাঁহার ন্যায় মেধাবী ছাত্র আর কেহ মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভের সময় তিনি অনেক মেডেল, পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি আটটি সুবর্ণপদক ও দশ খানি প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ধাত্রীবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা ও শারীর-বিদ্যা—তিনটি বিষয়েই তিনি সকল পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। পাঁচ বৎসর তিনি কলেজ-বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি 'দুর্গাচরণ লাহা'-বৃত্তি ও 'আবদুল গনি'-বৃত্তিও লাভ করেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি এম. বি পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম. ডি পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তখনকার আইনে গ্রাজুয়েট ভিন্ন অপর কাহাকেও এম. ডি পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইত না; সেজন্য কেদারনাথকে মাদ্রাজে যাইয়া এম. ডি পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। এম. বি পাশ করার পরই চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহার অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়া কলকাতা মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে কলেজে একটি চাকরি দেন। তখন কোনো ভারতীয়কে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হইত না। সেজন্য কেদারনাথের জন্য কলেজের রেজিস্ট্রার পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে রেজিস্ট্রারের কার্য করিবার পর পাঁচ বৎসরের জন্য কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালের শিক্ষক ও স্ত্রীরোগচিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল তাঁহাকে ঐ একই পদে নিযুক্ত থাকিতে হয়। হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে গবেষণা সুবিধা হইবে বলিয়া তিনিও কার্যত্যাগ করেন নাই। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার সুচিকিৎসার খ্যাতি চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে সি. আই. ই উপাধি দানে সম্মানিত করেন এবং ভারত ধর্মমহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে "ধাত্রীবিদ্যা মহার্ণব" উপাধি প্রদান করেন।

গভর্নমেন্টের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার কেদারনাথ কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক ও স্ত্রীরোগ-চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ খালি হইলে তাঁহাকেই সেই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি সুখ্যাতির সহিত ঐ পদে কার্য করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

শিক্ষক ও অধ্যাপকের কার্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার কেদারনাথ স্ত্রীরোগ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ ও বহুসংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন[৩]। এক একখানি পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ওয়াশিংটন শহর হইতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল[৪] এবং তিনি তথায় যাইয়া অপূর্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া সুসভ্য মার্কিন জাতিকেও চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

ভারতেও তাঁহার সুনামের অন্ত ছিল না। চিকিৎসাব্যপদেশে ভারতের সকল স্থান হইতেই তাঁহার আহ্বান আসিত। অস্ত্রচিকিৎসায় তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ফ্যাকালটি অব্ মেডিসিনের ডীন, মেডিকেল বোর্ড অব্ স্টাডির সভাপতি, স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির সদস্য, কাউন্সিল অব্ মেডিকেল রেজিস্ট্রেশনের সদস্য, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির সদস্য, এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য প্রভৃতি সম্মানজনক পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবৎসর জনসাধারণের মধ্য হইতে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'কোর্টস মেডেল' নামক এক পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়া থাকেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার কেদারনাথকে ঐ মেডেল প্রদান করা হইয়াছিল।

কেদারনাথ শুধু অর্থ উপার্জন করিয়াই কর্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি বহু ছাত্রকে অর্থসাহায্য করিতেন। চিকিৎসাবিষয়ক নূতন নূতন পুস্তক ক্রয় করা তাঁহার একমাত্র বিলাসিতা ছিল। তাঁহার গৃহে প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূল্যের পুস্তক সংগৃহীত ছিল; মৃত্যুকালে তিনি উক্ত পুস্তক সমুদয় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে[৫] দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নগদ প্রায় ৬০ হাজার টাকাও তিনি উক্ত কলেজে দান করিয়াছিলেন। সেজন্য কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে তাঁহার স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নবনির্মিত প্রসূতি চিকিৎসাগারের "কেদারনাথ মেটার্নিটি হাসপাতাল" নাম প্রদান করিয়াছেন।

কেদারনাথের মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল।[৬] মৃত্যুর ১২ বৎসর পূর্বে তাঁহার সহধর্মিণী লোকান্তরিতা হইয়াছিলেন।

কেদারনাথ জীবনে বহু অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কেহ কোনোদিন অর্থের লোভ দেখে নাই। অর্থের প্রতি অধিক আসক্তি থাকিলে তিনি সারা জীবন (প্রায় ৪৪ বৎসর কাল) নিজেকে অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিতেন না। অধ্যাপনায় সময় ব্যয় না করিয়া যদি তিনি স্বাধীন ভাবে চিকিৎসকের কার্য করিতেন তাহা হইলে আরও অনেক অধিক অর্থ উপার্জন করিতেন। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা এত গবেষণার কার্য ও পুস্তক রচনা সম্ভব হইত না। কেদারনাথের জীবনের ইহাই প্রধান বিশেষত্ব ছিল।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে দারুণ ইরিসিপ্লাস রোগে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি তিনি অধ্যাপনা কার্য ছাড়িতে সম্মত হন নাই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কারমাইকেল কলেজের ছাত্রগণকে শিক্ষাদানের কার্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

স্যার কেদারনাথের মত আসাধারণ মেধাবী ও মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে যুগে তাঁহার মত পণ্ডিতের জন্ম হয়, সে যুগ ধন্য। তিনি বাংলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

পল্লিগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও লোক কি করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ-জীবন গঠন করিতে পারে এবং পরবর্তীকালে প্রচুর অর্থোর্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিয়া যায়, তাহা আমরা কলিকাতা হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব হেডমাস্টার রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জীবনী আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি।

যশোহর জেলায় এক পল্লিগ্রামে[১] ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে[২] ঈশানচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি নয় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন[৩]। তাহার পর কি করিয়া তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। নয় বৎসর বয়স হইতেই তাঁহাকে সাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। বি. এ পরীক্ষায় তিনি গণিতে[৪] গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেন এবং ইংরেজিতে এম. এ পাশ[৫] করেন। প্রথম জীবনে কয়েক বৎসর তাঁহাকে 'ইংলিশম্যান' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি করিতে হইয়াছিল।[৬] ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারি শিক্ষাবিভাগে কার্য লাভ করেন এবং ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল অতিশয় দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত তিনি চাকরি করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে হইতে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত

তিনি হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার[৭] ছিলেন। এই তেরো বৎসরে বাংলার কত লোক যে তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পঠদ্দশায় তাঁহাকে যে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি জীবনে কোনো দিন বিস্মৃত হন নাই; সেজন্য তিনি প্রভূত অর্থের মালিক হইয়াও চিরকাল বিলাস-ব্যসন-বর্জিত অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'কথামালা' পুস্তকের অনুকরণে তিনি যে 'হিতোপদেশ'[৮] নামক স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রচুর আয়ের পথস্বরূপ হইয়াছিল। তিনি বাংলা ভাষায় 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'[৯] প্রকাশ করেন এবং তাহা ৫০ বৎসরেরও অধিককাল বাংলার প্রায় সকল বিদ্যালয়ে পঠিত হইয়াছিল। গভর্নমেন্টের চাকরি করার সময় তিনি কিছুদিন হুগলির ভার্নাকুলার টিচার্স ট্রেনিং কলেজের হেডমাস্টার হইয়াছিলেন এবং একবার তাঁহাকে বাংলার শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর করা হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বে আর কোনো বাঙালি ঐ পদে নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই।

শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী থাকিবার সময় এবং অবসর গ্রহণের পর তিনি অধিকাংশ সময়ই লেখাপড়ায় অতিবাহিত করিতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং সেজন্য তাঁহার পালি ভাষার প্রতিও অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি জীবনের দীর্ঘ ষোলো বৎসর কাল পালি ভাষার অনুশীলনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি 'পালি জাতক'[১০] নামক গ্রন্থসমূহের যে অনুবাদ ছয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন তাঁহাকে সাহিত্যজগতে অমর করিয়া রাখিবে। ঐ ছয় খণ্ড জাতক-গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি ১৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

সুদীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করায় এবং বহু ধনী ছাত্রের সম্পর্কে আসায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ ঝোঁক হইয়াছিল। অবসর গ্রহণের পর তিনি নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন এবং বহু লিমিটেড কোম্পানির ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়া কাজ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা থাকিলে সরকারি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পরও লোক যে কত কাজ করিতে পারে, তাহা স্বর্গত ঈশানচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। পাঠ্যপুস্তক রচনায় তাঁহার বিশেষ আগ্রহ থাকায় সে কার্য হইতে তিনি কোনোদিন বিরত হন নাই। তাহার পর রীতিমতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যে তাঁহাকে প্রায় সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইত। এই কার্যের অবসরে তাঁহাকে পালি জাতকের অনুবাদ কার্য করিতে হইত। নানা কার্যে তাঁহার গৃহে সর্বদা দর্শন-প্রার্থীর সমাগম হইলেও কোনো লোককে তিনি কোনো দিন দর্শনদানে বিমুখ ছিলেন না, সকলকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। নিজে নানাপ্রকার দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া পরের দুঃখ বুঝিবার শক্তি তাঁহার ছিল এবং তাহা সর্বদা তাঁহার কার্যে প্রকাশ পাইত।

ঈশানচন্দ্র অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া

তাঁহার অর্থ সর্বদা পরোপকারের জন্য ব্যয়িত হইত। তাঁহার অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়া ফরিদপুর ও যশোহর জেলার বহু ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। নিজের গ্রামের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল ; যে-কোনো গ্রামবাসী কলকাতা আসিলেই তাঁহার গৃহে আদর অভ্যর্থনা লাভ করিত। গ্রামবাসীরা যে-কোনো উপকার লাভের জন্য তাঁহার নিকট আসিত, তিনি তাহা সফল করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মাতার নামে তিনি স্বগ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; পিতার নামে স্বগ্রামে তিনি একটি মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় করিয়া দিয়াছেন। গ্রামের পথগুলি তাঁহার অর্থে নির্মিত ও সংস্কৃত হইত ; গ্রামে তাঁহারই অর্থে মন্দির নির্মিত হইয়াছে, বহুসংখ্যক নলকূপ খনন করা হইয়াছে ও দুইটি নূতন পুষ্করিণী হইয়াছে। গ্রামের জন্য তিনি যে কত অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি যে এত অধিক দান করিতেন, তাহা তাঁহার নিকটাত্মীয়গণও জানিতে পারিতেন না। মৃত্যুর ২৫ বৎসর পূর্বে তিনি পত্নীহীন হইয়াছিলেন। স্বীয় পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থ কসৌলি পাস্তুর ইনস্টিটিউটে[১১] তিনি একটি বড় বাংলো প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে[১২] একজন রোগীর বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

ঈশানচন্দ্রের পুত্র ভাগ্যও উল্লেখের যোগ্য। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দ্র[১৪] দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের দ্বারা তাঁহার পিতার সুনাম আরও বর্ধিত হইয়াছে ; কনিষ্ঠ প্রতুলচন্দ্রও কলিকাতাস্থ বঙ্গবাসী কলেজের অন্যতম অধ্যাপক। পুত্রদ্বয়ও পিতার গুণাবলি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কার্য করিয়া থাকেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার স্বোপার্জিত বহু অর্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন।

মোজাম্মেল হক্

বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম যে কয়জন মুসলমান লেখক বঙ্গভাষাকে আপনাদের জাতীয় ভাষা বলিয়া সগৌরবে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে চিরজীবন তাহার সেবা করিয়া গিয়াছেন, কবিবর মোজাম্মেল হক্ সাহেব তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি আশৈশব বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক ও সাধক ছিলেন।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপুরের[১] এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া তিনি স্নেহময় মাতামহের[২] ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। শান্তিপুর বাংলার একটি প্রাচীন জনপদ। শিক্ষায়, সভ্যতায়, সম্পদে শান্তিপুর সেকালে একটি বিশিষ্ট নগর ছিল। এইখানেই এক মাইনর স্কুলে তাঁহার বাল্যজীবনের শিক্ষা[৩] আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর তিনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করেন; কিন্তু অবস্থা-বিপর্যয়ে তিনি উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই, অল্প বয়সেই তাঁহাকে স্কুল ছাড়িতে হইয়াছিল।

কবি মোজাম্মেল হক্ যে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে স্ফুরিত হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্রজীবনের কল্পলতায় আমরা দুইটি কুসুম বিকশিত হইতে দেখি, একটি তাঁহার "কুসুমাঞ্জলি"[৪] কাব্য এবং অপরটি তাঁহার "অপূর্বদর্শন কাব্য"![৫] সুতরাং ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বভাবগত কবি-প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ইহার পর সারাজীবন তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবি ও সাহিত্যিক প্রতিভার সম্যক পরিচয় জানিতে হইলে তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি পাঠ করা আবশ্যক। 'কুসুমাঞ্জলি' ও 'অপূর্বদর্শন কাব্য' তাঁহার এই দুইখানি বাল্যরচনা ছাড়া 'হজরত মোহাম্মদ'[৬] কাব্য, 'জাতীয় ফোয়ারা'[৭] কাব্য, 'শাহনামা'[৮] কাব্য, 'মহর্ষি মনসুর',[৯] 'ফেরদৌসী চরিত',[১০] 'প্রেমহার'[১১] কাব্য 'তাপস কাহিনী',[১২] 'হাতেমতাই',[১৩] 'টিপু সুলতান',[১৪] 'জোহারা'[১৫] প্রভৃতি অমুল্য গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

এক সময়ে তিনি 'লহরী[১৬] ও 'মোসলেম ভারত'[১৭] নামক দুইখানি মাসিক পত্রও সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহাকে 'কাব্যকণ্ঠ' উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কেবল যে কাব্য ও সাহিত্য লইয়াই তিনি মগ্ন ছিলেন, এমন নহে; তিনি অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও[১৮] রচনা করিয়াছিলেন। মুসলমান লেখকগণের মধ্যে তাঁহারই পুস্তক সর্বপ্রথম ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন্ কর্তৃক স্কুলপাঠ্যরূপে অনুমোদিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত 'মহর্ষি

মনসুর' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ পরীক্ষায় এবং 'ফেরদৌসি চরিত' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইংরেজি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের একজন পরীক্ষক ছিলেন। শান্তিপুরে তিনি 'জুবিলী মাদ্রাসা স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসরকাল স্বয়ং সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাব্রত ছাড়া তাঁহার জীবনের আর একটা দিকও ছিল, সেটি তাঁহার নিরন্তর কোলাহল-মুখর কর্মময় জীবন। যদিও সাহিত্য-সেবাই তাঁহার প্রধান সাধনা ছিল, তথাপি একজন প্রকৃত নাগরিকের ন্যায় নগরের প্রতি তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। সামাজিক ও পৌরজীবনে তিনি একজন অসামান্য কর্মী ছিলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল তিনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির একজন সুযোগ্য "কমিশনার" ছিলেন। দুইবার তিনি এই পৌরসভার 'ভাইস্ চেয়ারম্যান্' নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রায় কুড়ি বৎসর তিনি দেশের একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং সাহিত্যসেবা ছাড়াও তাঁহার জীবনের অনেকখানি সময় প্রকৃত স্বদেশসেবকের ন্যায় দেশবাসীর কল্যাণকার্যে নিয়োজিত ছিল।

সাহিত্যসেবী ও দেশকর্মী কবি মোজাম্মেল হক্ একজন আদর্শচরিত্র পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী, সদালাপী সদ্গৃহস্থ এদেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও তিনি আজীবন সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্মবিশ্বাসী, পরোপকারী ও অকপটহৃদয় বন্ধু অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। হিন্দু প্রতিবেশী ও বন্ধুগণকে তিনি ভালবাসিতেন, আত্মীয়-জ্ঞানে স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের আপদ-বিপদে, দুঃখ-কষ্টে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। এই গুণে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

বর্তমান বাংলার মুসলমান সমাজের প্রসিদ্ধ নেতা, নদিয়া জেলার হিন্দু-মুসলমানের গৌরবস্বরূপ, বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি খাঁ বাহাদুর আজিজ-উল-হক্ সাহেব কবির সুযোগ্যভ্রাতুষ্পুত্র। ইহাকে কবিবর আপন সন্তানের ন্যায় সস্নেহে ও সযত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আফজল হক্ সর্বপ্রথম 'মোসলেম পাবলিশিং হাউস' খুলিয়া মোসলেম সাহিত্য প্রচারে অগ্রণী হইয়াছেন। কবিবর সকলকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া গত ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

পরলোকগত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের জীবনী অদ্ভুত বৈচিত্র্যপূর্ণ। এরূপ অসাধারণ বৈচিত্র্যময় জীবনী সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। যতীন্দ্রমোহন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বরমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন[১]। তাঁহার পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত[২] চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত উকিল ছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যে জাতীয়তা প্রচার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, যাত্রামোহন তাহার একজন অক্লান্তকর্মী নেতা ছিলেন। যাত্রামোহন যেমন একদিকে ওকালতি দ্বারা প্রচুর অর্থার্জন করিতেন, অপর দিকে তেমনিই দেশের সকল প্রকার জনহিতকর ও প্রগতিশীল আন্দোলনে সাহায্য দান করায় তিনি দেশে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। এইরূপ পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করায় প্রথম জীবন হইতেই যতীন্দ্রমোহনের মনও উচ্চভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

যতীন্দ্রমোহন কলকাতা ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, হেয়ার স্কুল[৩] ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। পিতা পুত্রকে শুধু এদেশের শিক্ষা প্রদান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবার মত লোক ছিলেন না, তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পুত্রকে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে[৪] ইংল্যান্ডে প্রেরণ করেন। তখনও যতীন্দ্রমোহন বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। বিলাতে যাইয়া তিনি কেম্ব্রিজের ডাউনিং কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আইনের প্রথম পরীক্ষা পাশ করেন ও ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে তিনি আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া এল. এল. বি উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সেই বৎসরই জুন মাসে ব্যারিস্টার বলিয়া ঘোষিত হন।

এই সময় যতীন্দ্রমোহনের জীবনে সংগ্রামের যুগ আরম্ভ হইল। প্রথমেই বলিয়াছি, তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না; তাঁহার জীবন সংগ্রামময় ছিল এবং সর্বদা কোনো না কোনো সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে তিনি আনন্দ বোধ করিতেন। সাধারণ লোক হইলে তিনি কলিকাতা হইতেই এম. এ, বি. এল্ পাশ করিয়া চট্টগ্রামে পিতার নিকট যাইয়া ওকালতি আরম্ভ করিতেন। যতীন্দ্রমোহন সে সুগম পথ ত্যাগ করিয়া বিলাতে যাইয়া ব্যারিস্টার হইলেন এবং কলিকাতায় ফিরিয়া আত্মনির্ভরশীল হইয়া ব্যারিস্টারি দ্বারা অর্থার্জনের সঙ্কল্প করিলেন। বিলাতে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি নেলী গ্রে নাম্নী এক ইংরেজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৫] যতীন্দ্রমোহন জানিতেন, এই বিবাহ তাঁহার মাতাপিতা অনুমোদন করিবেন না এবং এই বিবাহের ফলে তাঁহাকে জীবনসংগ্রামে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। তাহা জানিয়াও তিনি নেলীকে বিবাহ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

বিলাতে যতীন্দ্রমোহন শুধু পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন না, তিনি সকল প্রকার আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। কেম্ব্রিজে পড়াশুনার সময় তিনি কেম্ব্রিজস্থ ভারতীয় মজ্‌লিসের সভাপতি[৬] হইয়াছিলেন। খেলাধুলার প্রতি চিরদিনই তাঁহার অত্যধিক আকর্ষণ ছিল। তিনি টেনিস ও ক্রিকেট খেলায় সর্বত্র ডাউনিং কলেজের সুনাম[৭] রক্ষা ও যশ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন। তিনি ধনী পিতার পুত্র ছিলেন; কলিকাতা শহরেও তাঁহার পিতৃবন্ধুর অভাব ছিল না এবং যতীন্দ্রমোহনও কম মেধাবী ছিলেন না। কাজেই অতি অল্পদিনের মধ্যে ব্যারিস্টারিতে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন ব্যারিস্টারি দ্বারা অর্থার্জন ও খেলাধুলা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক ছিলেন না। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয় যতীন্দ্রমোহন তাহাতে যোগদান করিলেন এবং পিতার অনুমতি অনুসারে পর বৎসর সম্মেলনকে চট্টগ্রামে নিমন্ত্রণ করিলেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁহারই উদ্যোগ ও চেষ্টায় চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হইল এবং যতীন্দ্রমোহনের পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির কার্য করিলেন।

ব্যারিস্টারিতে দিন দিন তাঁহার সুনাম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তিনি ঐ ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। তিনি অর্থার্জন করিয়া বিলাসভোগে তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র ভারতে এক নবযুগের সূচনা হইল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস হইতে অসহযোগের মন্ত্র উচ্চারিত হইল। তখন যতীন্দ্রমোহন তাঁহার ইংরেজ পত্নী ও দুই পুত্র লইয়া[৮] কলকাতায় বাস করিতেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ আহ্বানে ব্যারিস্টারি ত্যাগ করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে অন্য কয়েকজন যুবক ব্যারিস্টারের সহিত যতীন্দ্রমোহনও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। ব্যারিস্টারি করিলে যে প্রতিভাবান যুবক একদিন জজ বা অ্যাডভোকেট জেনারেল হইতে পারিতেন, তিনি সকল সুখ ও ঐশ্বর্যের মায়া ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারি হইলেন। চিত্তরঞ্জন যখন ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন—কিন্তু যতীন্দ্রমোহন তখন যুবক মাত্র। তাঁহার এই ত্যাগ তাঁহার দেশবাসীবৃন্দকে বিস্মিত করিয়াছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে যাইয়া যতীন্দ্রমোহন বর্মা অয়েল কোম্পানির কর্মচারীদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব করিলেন। তাহার পরবর্তী মাসেই সমগ্র আসাম বেঙ্গল রেলের কর্মীরা ধর্মঘট করিলে—সেখানেও যতীন্দ্রমোহন নেতা হইলেন। ঐরূপ ধর্মঘট সচরাচর দেখা যায় না। ঐ ধর্মঘট পরিচালনের জন্য যতীন্দ্রমোহনকে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই চট্টগ্রামে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল এবং তিন দিন হাজতবাসের পর তাঁহার তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল। এই ভাবেই যতীন্দ্রমোহনের প্রকৃত রাজনীতিক জীবন আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী

তাঁহাকে "দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন" নামে অভিহিত করিলেন এবং সেই "দেশপ্রিয়" বিশেষণে আজও তিনি বিঘোষিত হইয়া থাকেন। ১৯২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য করা হইয়াছিল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্বরাজ্য ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রবেশ করিলেন। যতীন্দ্রমোহন ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেন; তাঁহাকে স্বরাজ্যদলের সম্পাদক করা হইল। সেই সময়ে চিত্তরঞ্জন অসুস্থ হইয়া পাটনা গমন করিলে বাংলার গভর্নর পরামর্শের জন্য যতীন্দ্রমোহনকেই লাটপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

পর বৎসর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হইলে যতীন্দ্রমোহনই বাংলার রাজনীতিক নেতা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তাঁহাকে একসঙ্গে তিনটি প্রধান ও সম্মানজনক কার্যের ভার দেওয়া হইল—(১) তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইলেন,[৯] (২) তাঁহাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি করা হইল, এবং (৩) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি স্বরাজ্যদলের নেতা হইলেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি তারিখে তিন নম্বর রেগুলেশন আইন অনুসারে ধৃত হওয়া পর্যন্ত তিনি যেভাবে রাজনীতিক কার্য পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসাধারণই বলিতে হইবে।

তাঁহার মত সরল, উদার, অমায়িক ও সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনীতিক কার্যের অবসরে নিজ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্য মধ্যে তাঁহাকে ব্যারিস্টারি করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কখনও তাহাতে মন দিতে পারেন নাই। প্রথম জীবনেই তিনি পিতৃদত্ত অর্থ নানা সৎকার্যে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কাজেই জীবনের শেষ কয় বৎসর তাঁহাকে বিশেষভাবেই অর্থাভাব ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে অর্থাভাবের মধ্যেও তিনি দেশের কাজে কোনোদিন পশ্চাৎপদ ছিলেন না। বোম্বাইয়ে বাওলা হত্যা মামলায় তিনি যেভাবে আইনজ্ঞানের পরিচয় দেন, তাহাতে সমগ্র ভারত চমৎকৃত হইয়া যায়। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার পর ব্যারিস্টারি দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু দেশসেবা তাঁহাকে দারিদ্র্যের পথেই লইয়া গিয়াছিল। ঐ কয় বৎসর তিনি সর্বত্র সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কানপুর ও মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইলে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল। বসিরহাটে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইতে হইয়াছিল।

দারিদ্র্যভোগের জন্য তাঁহার শরীর ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং চিকিৎসকগণের পরামর্শে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন। বিলাত হইতে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি তিনি ধৃত হইলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই নষ্ট হইতে লাগিল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন গভর্নমেন্ট তাঁহাকে রাঁচিতে স্থানান্তরিত করিলেন।[১০] সেইখানে রাজবন্দি অবস্থাতেই ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুলাই[১১] দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকগমন করেন।

সরলা দেবী চৌধুরাণী

কলকাতা জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুর-পরিবার বঙ্গদেশকে নানাদিক দিয়া নানাভাবে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এই পরিবারের প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বনামধন্যা স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর জননী। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীতেই সরলা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দেশপূজ্য রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী, মায়ের মুখোজ্জ্বলকারিণী তনয়া। মাতামহবংশের বহু সদ্‌গুণ এই মহিয়সী মহিলার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে ও তাহার পিতৃকুলের নানা বৈশিষ্ট্য তিনি লাভ করিয়াছেন। ইহার পিতা স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল একজন উচ্চশিক্ষিত ও পাশ্চাত্য-সভ্যতার অনুরাগী উদারপন্থী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নদিয়া জেলার সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ জমিদার ঘোষালবংশের কৃতী সন্তান। প্রথম জীবনে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বটে, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে অল্প কয়েকজন দেশপ্রেমিক ব্যক্তি মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবী লইয়া ভারতে জাতীয় মহাসমিতি (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সরলা দেবীর পিতা স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে সরলা দেবী বেথুন কলেজের ছাত্রীরূপে সম্মানের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। কোনোও পরীক্ষায় তিনি কখন অকৃতকার্য হন নাই। সপ্তদশবর্ষীয়া সরলা দেবী যেদিন বি. এ উপাধি লাভ করেন সেদিন বঙ্গের মহিলা সমাজ তাঁহার সাফল্যে গৌরব বোধ করিয়াছিলেন।

কৈশোরেই সরলা দেবীর সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ দেখা গিয়াছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে অধুনাবিলুপ্ত 'সখা'[১] পত্রিকার প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যখন তাঁহার একটি রচনা[২] পুরস্কারপ্রাপ্ত ও প্রকাশিত হইয়াছিল তখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র দশ বৎসর। 'বালক'[৩] পত্রে প্রকাশিত তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়সের একটি রচনা[৪] সমস্ত আত্মীয় বন্ধুকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের পিতামহ বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সরলা দেবীর সংস্কৃত কাব্য ও নাটক সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ ও সরল আলোচনা পাঠ করিয়া প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া পত্র লেখেন এবং স্বরচিত গ্রন্থাবলি উপহার পাঠান। সরলা দেবীর বয়স তখন উনিশ বৎসর মাত্র।

গীতবাদ্যে সরলা দেবীব দক্ষতা অসাধারণ। তিনি দেশীয় সঙ্গীত ও য়ুরোপীয় সঙ্গীত

উভয় শাখায় সমান পারদর্শিনী। তিনি বীণ, সেতার, এসরাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে যেমন নিপুণা, পিয়ানো, বেহালা, অর্গান প্রভৃতি বৈদেশিক বাদ্যযন্ত্রেও তেমনিই পটিয়সী। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা সরলা দেবীর সঙ্গীত-রচনা ও সুর-সংযোজনায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সর্বদা উৎসাহ দিতেন।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর মাতাপিতা কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের জন্য তেমন উৎসুক ছিলেন না ; কারণ, তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল তাঁহাকে তাঁহারা থিওসফিকাল সোসাইটির অধীনে অধ্যাত্ম তত্ত্বানুসন্ধানে উৎসর্গ করিয়া দিবেন। এই সময় থিয়োজফিস্ট্ মাদাম ব্লাভাটস্কীর[৫] তাঁহারা একান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সরলা দেবীর শৈশব হইতেই জ্ঞানলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল ছিল। এজন্য তাঁহার ভ্রাতা জ্যোৎস্না ঘোষাল যখন 'সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন, তখন সরলা দেবীও বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রাতার সহযাত্রীরূপে বিলাত যাইতে উৎসুক হইয়াছিলেন। সেকালে কুমারী কন্যার বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্মতি দিতে না পারায় সরলা দেবীর বিলাত যাওয়া সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছা বিশেষ তীব্র ছিল। তাই সুযোগ লাভ করিবামাত্র মহীশূরে গিয়া সেখানকার 'মহারাণী বালিকাবিদ্যালয়ে' তিনি শিক্ষয়িত্রীরূপে প্রবেশ করেন। এবার আর কেহ তাঁহাকে বাধা দিলেন না। তাঁহার সেই সময়ের রচিত কতককগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা অতি চিত্তাকর্ষক।

এক বৎসর দক্ষতার সহিত মহীশূর বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনার পর সরলা দেবী তাঁহার জননীর অসুস্থতানিবন্ধন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিবার জন্য বাংলাদেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময় তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়াছিল দেশের ছেলেদের মনে বীরত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের সাহসী ও শক্তিশালী করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন হিন্দু আদর্শে এক মল্লক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তরুণ বঙ্গ-যুবকদের মধ্যে ব্যায়াম, লাঠি-খেলা, অসি-ক্রীড়া, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রবর্তিত "বীরাষ্টমী" উৎসবের মূল। ইহার ফলেই বাঙালি যুবকেরা দিন দিন শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গজনিত দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে দেশীয় শিল্পসামগ্রী ব্যবহারের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে সরলা দেবী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য, সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন, এবং দেশবাসীর দৈহিক ও নৈতিক চরিত্রবল গঠন যে ভারতের উন্নতির এক একটি সুদৃঢ় সোপান, ত্রিশ বৎসর পূর্বে অ্যালবার্ট হলেই এক সভায় বাংলার এই মহিলাই প্রথম একথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কিন্তু জাতীয় জীবনের কেবল এই একটা দিক মাত্র লইয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। দেশের সাহিত্য ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়াও দেশপ্রেমের একটা অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তোলার দিকেও তাঁহার লক্ষ্য অবহিত ছিল। তিনি ইংরেজি, বাংলা ছাড়া ফরাসি, উর্দু, হিন্দি ও

পারস্য ভাষারও চর্চা করিয়াছেন। বাংলার মেয়েদের সঙ্গীত ও শিল্পকলা শিক্ষা দিবার জন্য তিনিই প্রথম এক সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত গৃহের বালকবালিকারা এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়া গীতবাদ্য শিক্ষার একটা সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

ইংরেজি ১৯০৫ সালে পাঞ্জাবের ব্যবহারজীব রাষ্ট্রীয়-কর্মী ও আর্যসমাজভুক্ত পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরীর[৬] সহিত শ্রীযুক্ত সরলা দেবী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহ তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল বীরপ্রসু পঞ্চনদের সঙ্গে বাংলার অন্তরঙ্গ সম্মেলন। এই মিলনের ফলে সরলা দেবী চৌধুরাণীর কর্মক্ষেত্র আরও নব নব দিকে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণীর মতই তিনি আর্য সমাজের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতের নানাস্থানে আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য বৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। এই সময় তিনি "ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল"[৭] নামে নারী জাতির সর্বপ্রকার উন্নতি ও কল্যাণের পন্থা-নির্দেশক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আজও ইহা ভারতনারীর উন্নতিকল্পে ভারত ও ব্রহ্মের নানা শহরে, বিশেষত কলিকাতায় নানারূপ কার্য করিতেছে। উচ্চ আদালতের আদেশক্রমে যখন পণ্ডিত রামভজ তাঁহার উর্দু সাপ্তাহিক "হিন্দুস্থানের" সম্পাদন ভার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী স্বামীর সে ভার স্বহস্তে লইয়া অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত "হিন্দুস্থান" সম্পাদন করিয়াছিলেন। "হিন্দুস্থানের" ইংরেজি সংখ্যা প্রকাশ করা আর এক গৌরবময় কীর্তি।

রাজনৈতিক বিবিধ অশান্তির ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া তাঁহার স্বামীকে যখন নানা বিপদে ঘিরিয়াছিল, অসাধারণ সাহস ও তেজস্বিতার সহিত তিনি তখন স্বামীকে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর সহিত রাজনৈতিক কার্যে দীর্ঘকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম ও নানাস্থানে পরিভ্রমণ-জনিত অনিয়মের ফলে তিনি একবার সাঙঘাতিক পীড়াক্রান্তা হন। রোগশয্যায় সংসার ত্যাগের একটি দৈব প্রেরণা তাঁহার হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তিনি একবার ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসেন। তাঁহার বাণীই তাঁহার চিত্তকে প্রথমে আধ্যাত্মিক চিন্তামার্গে লইয়া যায়। হিমালয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত 'মায়াবতী আশ্রমে' তিনি কিছুকাল বাস করেন। এবার তাই রোগান্তে তিনি স্বামীর অনুমতি লইয়া সংসার-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্জনবাসে চলিয়া যান। হৃষীকেশের গঙ্গাকূলে এক আশ্রম নির্মাণ করিয়া তাপসীর ন্যায় তিনি সেখানে অধ্যাত্ম সাধনায় জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। হঠাৎ তাঁহার স্বামীর পীড়ার সংবাদে তাঁহার সেবার জন্য তিনি মুসৌরি পাহাড়ে যান এবং সেখানে স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি হৃষীকেশের আশ্রমে না ফিরিয়া নাবালক পুত্রের প্রতি জননীর কর্তব্য পালনের জন্য কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন।

অতি বিচিত্র ও কর্মময় জীবনের পথ বাহিয়া চিরদিন তাঁহাকে চলিতে হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেও বাণীর আরাধনাকে তিনি কোনোদিনই অবহেলা করেন নাই। সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মিয়াছেন; কাব্যে ও সঙ্গীতে তাঁহাব জন্মগত অধিকার। তাই,

---

দীপক দত্তচৌধুরী

এত বিভিন্ন দিকের অসংখ্য কার্যভার মাথার উপর থাকা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান নিতান্ত সামান্য নয়।

সরলাদেবীর সঙ্গীতগুলির মধ্যে যেমন আমরা তাঁহার অসামান্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাই, তাঁহার রচনা-চাতুর্য ও ভাষার মাধুর্যে তেমনই মুগ্ধ হই; আবার তেমনই বিস্মিত হই তাঁহার স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় মমতার অনুভূতি পাইয়া। তাঁহার কল্পনা দৃপ্ততেজে উজ্জ্বল, তাঁহার ভাব-বিলাস বীরত্বানুরাগী, তাঁহার প্রকাশভঙ্গি বলিষ্ঠ ও সুস্থ।

সর্বধর্ম ও সর্বজাতির সমন্বয়ে ভারতে সাম্য ও একতার আদর্শ জাগাইয়া তুলিতে তিনি জীবনব্যাপী সাধনা করিতেছেন। তাঁহার ধর্মে, কর্মে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও ব্যক্তিগত জীবনেও চিরদিন এই আদর্শকেই তিনি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। সকল ক্ষয়ক্ষতি, নিন্দা ও দুর্নামকে তুচ্ছ করিয়া তিনি আপন ব্রতোদ্যাপনে সত্যাশ্রয়ীর ন্যায় অবিচলিত আছেন। তাঁহার আদর্শ রক্ষার্থ কৃচ্ছ্রসাধনমূলক তাঁহার এই যে জীবন, এই যে সকল প্রকার বিপরীত অবস্থায় ঝঞ্ঝা ও তুফানের মধ্যেও তিনি আপন মহান্ চরিত্রবলে অবিচলিত আছেন—এই অসাধারণ চরিত্রবলই তাঁহাকে বাংলার তথা ভারতের নারীসমাজে চিরদিন বরণীয়া করিয়া রাখিবে।*

আব্দর রহিম

বাংলাদেশে চিরদিনই হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃভাবে বাস করিয়া আসিতেছে। সেজন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুরাও যেমন উচ্চতম শিক্ষা লাভের পর উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছেন, মুসলমানগণও তেমনই কোনো বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকেন নাই। আমরা এখানে যে মুসলমান বিজ্ঞের কথা আলোচনা করিব, তিনি খাঁটি বাঙালি এবং তাঁহার উন্নতিতে শুধু বাংলার মুসলমান সমাজের মুখ উজ্জ্বল হয় নাই, হিন্দু সমাজেরও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

স্যার আব্দর রহিমের পিতা মৌলবি আব্দর রউফ মেদিনীপুর জেলার জমিদার ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আব্দর রহিমের জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে[১] শিক্ষালাভের পর বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িতে গিয়াছিলেন ও ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া এদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি যে ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতি লাভ করিবেন, তাহার পরিচয় তাঁহার প্রথম জীবনেই পাওয়া গিয়াছিল।

ব্যারিস্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে ও অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি বাংলার ডেপুটি লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সারের পদ লাভ করেন। ঐ পদ প্রাপ্তিতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার কথা প্রমাণিত হইয়াছিল।

* মৃত্যু—১৮.৮.১৯৪৫

তাহার পর ক্রমে তিনি কলকাতার উত্তর বিভাগের প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট[২] নিযুক্ত হন। এই সকল কার্যে তাঁহার আইনজ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পায় ও ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ঠাকুর আইন অধ্যাপক[৩] নিযুক্ত করিয়া সর্বোচ্চ সম্মানে বিভূষিত করেন। ঠিক সেই সময়েই তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। এখনকার মত তখন সকল প্রদেশে প্রাদেশিকতা প্রসারিত হয় নাই, সেজন্য মাদ্রাজ প্রদেশে উপযুক্ত মুসলমানের অভাব দেখিয়া ভারত গবর্নমেন্ট বাংলাদেশ হইতেই জজ নির্বাচন করেন এবং পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় স্যার আব্‌দর রহিমই ঐ পদ লাভ করেন। স্যার আব্‌দর হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই পরম প্রীতির পাত্র ছিলেন, বলিয়াই বাংলার সকলে একযোগে তাঁহাকে এই উচ্চপদলাভের সাহায্য করিয়াছিল।

মাদ্রাজে যাইয়াও তিনি স্বীয় কার্যশক্তি প্রদর্শনে কার্পণ্য করেন নাই। অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্ডিকেট সভার সদস্য করা হয় ও তিনি সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যের সহিত নিজেকে সংযুক্ত করেন। তিনি যে সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ কাল মাদ্রাজে জজ পদে নিযুক্ত ছিলেন,তাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্মজীবন বলিয়া অভিহিত করা হয়। তাঁহার কার্যফলে মাদ্রাজের লোক এবং মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে দুইবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান[৪] করা হয়। একবার ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এবং পুনরায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই হইতে অক্টোবর পর্যন্ত তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির কার্য করিতে হইয়াছিল।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসেন এবং বাংলার গভর্নমেন্ট তাঁহাকে গভর্নরের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত করেন। মাদ্রাজ হইতে চলিয়া আসার পরও মাদ্রাজের লোক তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই। তাহারা তাঁহাকে একবার মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশন সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহার পর তাঁহাকে আর একবার মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশন সভায়ও বক্তৃতা করিবার জন্য যাইতে হইয়াছিল।

শাসন পরিষদের সদস্য পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর হইতে স্যার আব্‌দর রাজনীতি-ক্ষেত্রে কার্য করিতেছেন। তাহার পূর্বেও মুসলমানগণের মঙ্গলজনক বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে নিখিল ভারত মুসলমান উলেমা সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হইয়াছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঞ্জোরে যে নিখিল ভারত উলেমা সম্মিলন হয়, স্যার আব্‌দর তাহাতে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আহূত হন ও তাঁহার অভিভাষণে মুসলমান সমাজকে প্রীত করেন।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি ভারতে গভর্নমেন্টের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হইয়াছেন এবং গত নির্বাচনের পর পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাকে সভাপতি পদ প্রদান করিয়া ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ সম্মানজনক কার্য করিবার সুযোগ দান করিয়াছেন।

বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি অধিক দিন কার্য করেন নাই বটে, কিন্তু মুসলমান সমাজের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত বাংলার সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যেই তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করেন ও সকল অনুষ্ঠানে সাহায্য করেন। তাঁহার নেতৃত্ব লাভ করিয়া বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অনেক সময়েই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মীমাংসায় সমর্থ হইয়াছে। এই পরিণত বয়সেও তিনি দেশহিতকর কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতেছেন। ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহের পার্লামেন্টের কার্য পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সেই অর্জিত অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিষদের সভাপতির কার্য[৫] তিনি সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন।*

নিখিল ভারত মুসলমান নেতা হিসাবে ভারতীয় মুসলমানগণ স্যার্ আব্‌দর রহিমকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ট্রাস্টি এবং মাদ্রাজস্থ মোসলেম শিক্ষা বোর্ডের অন্যতম সদস্য পদে নির্বাচিত করিয়াছেন।

নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

আজ স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় শুধু বাংলা দেশে কেন, সমগ্র ভারতে তাঁহার অসাধারণ আইনজ্ঞান ও কর্মপ্রতিভার জন্য সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহাদের পরিবারের নাম গত শতাব্দীতে সকলের নিকটই বরেণ্য ও আদরণীয় ছিল। স্যার নৃপেন্দ্রনাথের পিতামহ স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারের[১] নাম কে না জানে? গত অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল প্যারীচরণের লিখিত ইংরেজি প্রথম শিক্ষার পুস্তকগুলি সমগ্র ভারতে পঠিত হইতেছে। যে ফার্স্ট বুক, সেকেণ্ড বুক, থার্ড বুক,[২] প্রভৃতি পাঠ করিয়া এ যুগের প্রায় সকলকেই ইংরেজি শিক্ষা করিতে হইয়াছে, সেই ফার্স্ট বুক প্রভৃতির গ্রন্থকার প্যারীচরণের পৌত্র বলিয়াই নৃপেন্দ্রনাথকে প্রথম জীবনে তাঁহার পরিচয় দিতে হইয়াছে। প্যারীচরণ শুধু ঐ সকল পুস্তকের রচয়িতাই ছিলেন না তাঁহাকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তকদিগের অন্যতমও বলা যাইতেপারে।

স্যার্ নৃপেন্দ্রনাথের পিতা নগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পুত্রও পিতার ন্যায় বাল্যজীবন হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বি. এ পরীক্ষায়[৩] নৃপেন্দ্রনাথ গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র তিন বিভাগেই সম্মান-সূচক অনার্স পাইয়াছিলেন। রসায়নে এম. এ পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি "প্রতিষ্ঠা-বৃত্তি" লাভ করিয়াছিলেন এবং বি.এল্[৪] পাশ করিয়া ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে

* পরলোকগমন—১৫.৮.১৯৫২

বিহারের ভাগলপুর শহরে ওকালতি করিতে গিয়াছিলেন। ওকালতিতে তখন ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুদৃষ্টি প্রদান না করায় তিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মুনসেফি চাকরি গ্রহণ করেন এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহাকে মুনসেফি করিতে হয়। কিন্তু ঐরূপ চাকরি করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। কাজেই চাকরি ছাড়িয়া তিনি বিলাতে ব্যারিস্টারি[৫] পড়িতে গমন করেন এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে লিঙ্কন ইন্ হইতে মাইকেলমাস টার্মে 'বার ফাইনাল' পরীক্ষা পাশ করেন—তিনি উক্ত পরীক্ষায় ফার্স্ট অনার্সম্যান ছিলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারিতে নৃপেন্দ্রনাথের সুনাম হয় এবং তিনি উক্ত ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে থাকেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে[৬] প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গত ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে ভারত গভর্নমেন্টের আইন-সচিব পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং অদ্যাবধি তিনি সেই সম্মানিত পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদানে সম্মানিত করিয়াছেন। দুর্গাদাস বসু[৭] মহাশয়ের কন্যা নবনলিনী বসুর সহিত নৃপেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের আটটি পুত্র সন্তান হইয়াছে।

নৃপেন্দ্রনাথকে যখনই রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা যাইত, তখন তিনি গভর্নমেন্ট পক্ষ সমর্থনেই প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তখন তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ী ছিলেন—গভর্নমেন্টের সহিত তাঁহার প্রায় কোন সম্পর্কই ছিল না। ভারতের শাসনসংস্কার-কল্পে সাইমন কমিশনের নির্ধারণানুসারে শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য বিলাতে যে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল, ভারতের প্রতিনিধিরূপে[৮] স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারকে তাহাতে যোগদান করিতে প্রেরণ করা হইয়াছিল—ঐ বৈঠকেই প্রধান মন্ত্রী প্রদত্ত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের কথা আলোচিত হয়। স্যার্ নৃপেন্দ্রনাথ উক্ত রোয়েদাদা যাহাতে পরিবর্তিত হয়, সেজন্য তথায় চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। নূতন শাসন-ব্যবস্থায় যে সকল ব্যাপারে বাংলার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, সে সকল বিষয়ে সুবিচার লাভের জন্যও স্যার নৃপেন্দ্রনাথ বিলাতে বাংলার পক্ষ লইয়া প্রবল আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার যে নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে বিলাতে যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি বসিয়াছিল, তাঁহার নিকটও স্যার নৃপেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ ভারত গভর্নমেন্টের চাকরি করেন বলিয়া কোথাও গভর্নমেন্টের স্বার্থরক্ষণের জন্য দেশের লোকের পক্ষে ক্ষতিজনক কোনো ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই।

বিলাতে ভারতীয় শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিতে নৃপেন্দ্রনাথ বাংলার স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। পাট বাংলার নিজস্ব সম্পদ—বাংলার

কৃষকদিগকে বর্ষায় জলে ভিজিয়া ও ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া পাট উৎপাদন করিতে হয়। অথচ সেই পাট বিদেশে রপ্তানি হইলে তাহার জন্য যে শুল্ক আদায় হয়, সেই শুল্কের টাকা ভারত গভর্নমেন্ট গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ টাকা বাংলা গভর্নমেন্টকে দেওয়া হইলে বাংলা দেশে বহু প্রকার জনহিতকর কার্য সম্পাদিত হইতে পারে। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের চেষ্টায় পাট-শুল্কের অর্ধেক টাকা এখন বাংলার গভর্নমেন্ট পাইতেছেন! ঐরূপ বাংলা হইতে সংগৃহীত আয়করের টাকাও বাংলাকে পূর্বে দেওয়া হইত না; সমস্ত টাকাই পূর্বে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের তহবিলে জমা হইত। এখন নৃপেন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় উহার একাংশ বাংলা পাইবে।* বাংলায় যাহাতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য গভর্নমেন্ট আরও অধিক অর্থ ব্যয় করেন, সেজন্য নৃপেন্দ্রনাথের চেষ্টার ত্রুটি নাই।

ভারতীয় কোম্পানি (লিমিটেড) গঠনের আইন ও ভারতীয় বীমা বিষয়ক আইনের[৯] বহু ত্রুটি থাকায় ভারতের জনসাধারণকে নানারূপ অসুবিধা ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত। আইনের ব্যবসায় করার সময় স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সে সকল ত্রুটির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। ভারত গভর্নমেন্টের আইন-সচিব নিযুক্ত হইয়া তিনি উক্ত উভয় আইনকেই ত্রুটিশূন্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বাংলার মনীষীরাই এককালে সমগ্র ভারতে প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ভোগ করিতেন। মধ্যে নানা কারণে ভারত গভর্নমেন্টের নিকট গুণী বাঙালিদের সম্মান কমিয়া গিয়াছিল। নৃপেন্দ্রনাথ সেই সম্মান পুনরায় অধিকার করিবার জন্য বহু কৃতবিদ্য ও বিশেষজ্ঞ বাঙালিকে সম্মানজনক পদ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া বাঙালি জাতির গৌরব বৃদ্ধি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বাংলা দেশের ও বাঙালি জাতির মুখ উজ্জ্বল করিতে থাকুন, তাঁহার দেশবাসীর ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।*

* এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

* ইনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

মানুষের যদি অসাধারণ প্রতিভা থাকে, তবে তাহাকে যে অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখা হউক না কেন, তাহার প্রতিভার স্ফুরণ না হইয়া যায় না। ডাক্তার স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনী ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জীবন সত্যই বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁহার পিতা নীলমণি[১] ব্রহ্মচারীও ডাক্তার ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন উপেন্দ্রনাথের জন্ম[২] হয়। তিনি হুগলি কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে[৩] শিক্ষালাভের পর মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। পরে কলিকাতাস্থ ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহাকে ঐ একই স্থানে কার্য করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা তাঁহাকে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র প্রদানে বিরত থাকে নাই। তাঁহার কর্মদক্ষতায় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেই পদে কার্য করিয়াচিলেন। চাকুরিজীবন[৪] হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায়[৫] নিযুক্ত রহিয়া বাংলার যশ বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বাঙালির গৌরব ভাজন হইয়াছেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ডাক্তার ব্রহ্মচারী গবেষণার কার্য পরিচালন করিতেছেন। মৌলিক গবেষণার ফলে তিনি 'ইউরিয়া স্টীবামাইন'' নামক যে কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার[৬] করেন, তাহা সমগ্র সভ্য জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। ইহার ফলে আমাদের দেশের যে কত ব্যক্তি ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। উপেন্দ্রনাথ বর্তমানে বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান সুচিকিৎসক বলিয়া পবিচিত।

উপেন্দ্রনাথ শুধু সরকারি বা গবেষণা কার্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন নাই। তিনি নানা বিভাগের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিতও সম্পর্ক রাখিয়াছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরূপে তিনি পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত ; বহু বৎসর কাল তিনি উক্ত সোসাইটির চিকিৎসা-বিভাগের সেক্রেটারি ছিলেন এবং ১৯২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে উক্ত সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াই তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহাকে উক্ত সম্মানসূচক পদ[৭] ও স্যার্ উইলিয়াম জোন্স্ স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও কর্মশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহার বহু উচ্চ সম্মান লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাইজার-ই-হিন্দ

স্বর্ণপদক লাভ করার পর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চিকিৎসা বিভাগে তাঁহাকে সভাপতি নির্বাচিত করা হইয়াছিল এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি উক্ত কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করেন।

কলকাতার প্রায় সকল চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগারের সহিত তিনি নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া দেশের বহু মঙ্গলজনক কার্য করিতেছেন। তাঁহার অর্থেরও তিনি সদ্‌ব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি দেশের বহু বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে নিজ অর্থ নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধির জন্য অধুনা সকলেই তাঁহার পরামর্শাদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

স্যার উপেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ, এম.ডি ও পি. এইচ. ডি উপাধিধারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিতও তাঁহার বিশেষ সংযোগ আছে। তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিলে দেশ তাঁহার দ্বারা বহু ভাবে যে উপকার লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।*

মেঘনাদ সাহা

বর্তমান যুগে বাংলা দেশ বিজ্ঞানে যে সমগ্র সভ্যজগতের নিকট উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ যুগে বিজ্ঞান অনুশীলনে বাংলাদেশ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। এ যুগের বৈজ্ঞানিক আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য মেঘনাদ সাহা, আচার্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ,[১] প্রভৃতির নাম শুধু ভারতের সকল স্থানে নহে, সমগ্র সভ্য জগতের নিকট সুপরিচিত। আমরা এখানে মাত্র চারিজন বৈজ্ঞানিকের নাম করিলাম। তাহা ছাড়াও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র[২] আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,[৩] আচার্য ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ[৪] প্রভৃতির কথাও সভ্যজগতের সর্বজনপরিচিত। তাঁহাদের দানে বর্তমান বাংলা ধন্য হইয়াছে- -বহু শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে—বাঙালি জাতির ধন ও মান উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ডাক্তার মেঘনাদ সাহার নাম শুধু বিজ্ঞানচর্চার জন্য নহে, জনহিতকর কার্য দ্বারাও সর্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে। যে সকল বাঙালি অধ্যাপক অধিকতর বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র প্রাপ্তির সুযোগে অন্যত্র যাইয়া চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, আচার্য মেঘনাদ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহাদের কলিকাতা ত্যাগের ফলে এক দিক দিয়া যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, অন্য দিক দিয়া তেমনই বাংলার বাহিরে বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে বাংলার সুযশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার ফলে সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষে তাহা গৌরবের বিষয় হইয়াছে।

* ইনি ৬. ২. ১৯৪৬-এ পরলোক গমন করেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে ডাক্তার মেঘনাদ সাহার জন্ম হয়। প্রথমে ঢাকা শহরে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আসেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন—তখন তিনি সবেমাত্র কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পি-আর. এস্ বৃত্তি লাভ করেন এবং পর বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ডি. এস্‌সি উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিলাতের বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত ডাক্তার সাহার বিবাহ হয় এবং বর্তমানে তাঁহাদের তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বিজ্ঞানচর্চা ছাড়াও পুরাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে ডাক্তার সাহা আলোচনা করিয়া থাকেন। সমাজেসেবা কার্যে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ আছে। প্রথম জীবনে তিনি কলিকাতার বহু সমাজসেবা প্রতষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় বঙ্গীয় যুবক সম্মিলনের যে প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল, ডাক্তার মেঘনাদ তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিলাতে যাইয়া লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল সায়েন্স কলেজে ও বার্লিনে বিজ্ঞানচর্চা করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৯২১ হইতে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ (খয়রারাজ) অধ্যাপকের কার্য করিয়াছিলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তদবধি তিনি তথায় সেই কার্যেই নিযুক্ত আছেন।

এলাহাবাদে থাকিয়া তিনি বহুবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এই সুদীর্ঘকাল তিনি যে-সকল গবেষণা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তাঁহার দ্বারা রচিত হইয়াছে; সে-সকল প্রবন্ধ শুধু ভারতে নহে, ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রেও স্থান লাভ করিয়াছে।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভল্টার যে শতবার্ষিক উৎসব সম্পাদিত হয়, ভারতের প্রতিনিধিরূপে ডাক্তার সাহা তাহাতে যোগদান করিতে গমন করিয়াছিলেন। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ডাক্তার সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীনের কার্য করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদে বরণ করা হইয়াছিল। এত অল্প বয়সে এরূপ উচ্চ সম্মান লাভ অতি অল্প বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। ১৯৩২-১৯৩৫ সন পর্যন্ত তিনি বাঙ্গালোরস্থ Indian Institute of Science-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন এবং ১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ পর্যন্ত ভারত গভর্নমেন্টের ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফন্ড এসোসিয়েশনের সদস্যের কার্য করিয়াছেন। ১৯৩০ সনে তাঁহার উদ্যোগে যুক্তপ্রদেশে

জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৫ সালে তিনি নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার কর্মসচিব ছিলেন। বর্তমানে তিনি এই পরিষদের সভাপতি।

তিনি ভারতের, ইউরোপের ও আমেরিকার কত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ভারতে প্রায় এমন কোনো প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান নাই, যাহার সহিত বর্তমানে বা অতীতে ডাক্তার সাহার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এখন তাঁহার বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর বটে, কিন্তু এই অল্প বয়সেই তাঁহার নাম চারিদিকে এত অধিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যে প্রায়ই তাঁহাকে কোনো না কোনো উৎসবে যোগদান করিবার জন্য ইউরোপে যাইতে হইয়া থাকে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কার্নেগী বৃত্তি লাভ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় গমন করেন এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিশত বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করেন।

কেতাবি বিজ্ঞানকে কি ভাবে ব্যবহারিক করা যায় সে বিষয়ে ডাক্তার সাহা প্রথমাবধি বিশেষ অবহিত আছেন। তিনি বহুদিন পূর্বেই বাংলা দেশে একটি জলবিজ্ঞান গবেষণার ল্যাবোরেটরী প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছিলেন। দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল কার্যে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য তিনি দেশের বহু শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি Science and Culture[৫] (বিজ্ঞান ও কৃষ্টি) এই নামে একটি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এলাহাবাদ-প্রবাসী কয়েকজন বাঙালির চেষ্টায় বিহার প্রদেশে শীতলপুরে যে বিরাট চিনি-কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ডাক্তার সাহা তাহার অন্যতম পরিচালক।

এখনও ডাক্তার সাহার জীবন-কথা রচনার সময় আসে নাই। তিনি অতিশয় ধীর ও স্থির প্রকৃতি এবং বিনয় ও সৌজন্যে তাঁহার ব্যবহার পরিপূর্ণ। সেজন্য তাঁহার বহুমুখী কার্যপ্রতিভার সকল কথা জানা বর্তমানে সম্ভবপর নহে। তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশের সেবা করিয়া দেশেকে ধন্য করুন এবং নিজেও ধন্য হউন, ইহার আমাদের একান্ত কামনা।*

* পরলোকগমন—১৬.২. ১৯৫৬

সরোজিনী নাইডু

ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার আগমন ও আলোচনার ফলে এদেশের শুধু পুরুষগণই যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় আদৃত হইয়াছেন তাহা নহে, এদেশের মহিলাগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভারতের বাহিরে স্বীয় অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দান করিয়া যশের মুকুট লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এইরূপ মহিলাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর নামই সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

সরোজিনীর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়[১] বাঙালি ছিলেন বটে, কিন্তু বহু বৎসর হায়দ্রাবাদে বসবাসের ফলে তাঁহার সহিত বাংলাদেশের প্রায় কোনো সম্পর্কই ছিল না। সেজন্য সরোজিনী বাঙালি মাতাপিতার সন্তান[২] হইয়াও কখনও বাংলা পড়িতে, বলিতে বা লিখিতে পারেন না। অঘোরবাবু নিজামরাজের অধীনে বড় চাকরি[৩] করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন এবং পুত্রকন্যাগণকে বাল্যকাল হইতেই বিলাতে পাঠাইয়া তথায় তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। পুত্রকন্যারাও সেজন্য কুসংস্কারমুক্ত ও স্বাধীনচেতা হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার এই কন্যাটি সর্বাপেক্ষা অধিক মেধাবী থাকায় তিনি প্রচুর জ্ঞানার্জন করিয়া তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সেই তিনি ইংল্যান্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তথায় লন্ডনস্থ কিংস কলেজে ও কেম্ব্রিজের গার্টন কলেজে তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। তিনি কবি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই ইংরেজিতে অতি চমৎকার কবিতা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার কবিতাগুলি তিন খণ্ডে[৪] প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেগুলি জগতের সকল স্থানের ইংরেজি ভাষাজ্ঞগণের দ্বারা আদৃত হইয়াছে। ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর কবিতা অনূদিত হইয়াছে। তিনি যদি শুধু কবিতা রচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলেও স্বর্গীয়া তরু দত্তের[৫] ন্যায় তাঁহার নাম ভারতের সাহিত্য-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত।

বিলাত হইতে শিক্ষালাভের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ডাক্তার নাইডু নামক এক মাদ্রাজি চিকিৎসককে[৬] বিবাহ করিয়াছিলেন। অঘোরবাবু সুদীর্ঘকাল হায়দ্রাবাদে বাস করার ফলে তাঁহাকে মাদ্রাজিদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিতে হইয়াছিল—সেজন্য তাঁহার পুত্রকন্যারা কেহই আর বাঙালিকে বিবাহ করেন নাই। অন্যসকল বিষয়ের ন্যায় বিবাহ ব্যাপারেও আঘোরবাবু পুত্রকন্যাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের শিক্ষালাভের পর স্বেচ্ছামত বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী শুধু গৃহধর্মপালন ও কবিতা রচনা লইয়াই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতে পারেন নাই। তিনি যখন প্রাপ্তবয়স্ক তখন দেশে রাজনীতির প্রবল বন্যা উপস্থিত হইয়াছে; সরোজিনীও সেই বন্যার জলে নিজেকে ভাসাইয়া দিলেন। উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় তিনি অনর্গল অতি মনোহর বক্তৃতা দিতে পারেন। তাহাই প্রথম তাঁহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে টানিয়া আনে। সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান আছে। তিনি একাল পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়া আসিতেছেন। যৌবনকালে তিনি কয়েকবার ইউরোপে যাইয়া ভারতের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর মধ্যে মধ্যে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইতেছে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশ যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিল, তখন শ্রীযুক্তা নাইডুও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহাকে যতই বিলাসী বলিয়া মনে হউক না কেন, তাঁহার প্রাণ দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে সর্বদাই উৎসুক ছিল। শ্রীযুক্তা নাইডু গান্ধীজির প্রবর্তিত আন্দোলনে যোগদান করিয়া সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া দেশবাসী সকলকে স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্মের জন্য দেশবাসীও তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে কোন দিন কার্পণ্য করে নাই। সরোজিনী প্রায় সমগ্র জীবনই কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনে যোগদান করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য কংগ্রেসে উপস্থিত সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু তাহাতে সভানেত্রী নির্বাচিতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য সুসম্পন্ন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে স্বর্গীয়া অ্যানি বেসান্ত ও শ্রীযুক্তা নেলি সেনগুপ্তা[৭] নাম্নী দুইজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা উহার সভানেত্রী হইয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ভিন্ন অপর কোন ভারতীয় মহিলার ভাগ্যে এই সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয় নাই।

শুধু রাজনীতিক আন্দোলন নহে, মহিলাপ্রগতি আন্দোলন পরিচালনেও শ্রীযুক্ত সরোজিনীকে সর্বদা অগ্রণী হইয়া কার্য করিতে দেখা গিয়াছে।

সরোজিনী হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করিয়া মাদ্রাজে পালিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বোম্বাই শহরেই চিরদিন তাঁহার কর্মক্ষেত্র। বোম্বাইয়ের মহিলাগণের মধ্যে আজ যে জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়, গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় বোম্বাইয়ের মহিলাবৃন্দ যে সাড়া দিয়াছিলেন, তাহার মূলে শ্রীযুক্তা নাইডুর প্রচারকার্য ছিল। তিনি বোম্বাইয়ে বহু মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া মহিলাগণের সর্ববিধ শিক্ষার ও উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতা দ্বারা তিনি সকল কার্যেই সাফল্য লাভ করিতে পারেন। সমাজনীতি ও ধর্মনীতির আন্দোলনেও তাঁহার দান অল্প নহে। সকল বিষয়ে তিনি উদারপন্থী বলিয়া তাঁহার মত সর্বত্র সাগ্রহে অনুবর্তিত হইয়া থাকে।

রাজনীতি-চর্চার জন্য শ্রীযুক্তা নাইডুকে লাঞ্ছনাও কম ভোগ করিতে হয় নাই। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে একবার এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। অবশ্য সেজন্য তিনি কোন দিন পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তাঁহার মত ধনী ও বিলাসী মহিলার পক্ষে কারাবরণ কিরূপ স্বার্থত্যাগের পরিচায়ক তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন এবং তথায় ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা সকলকে জানাইয়া আসিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও বহুবার তিনি ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় যাইয়া শত জনসভায় ভারতের অবস্থার কথা বিবৃত করিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর মত মহিলার জন্ম ভারতের সৌভাগ্যেরই সূচনা করিতেছে। তিনি সুদীর্ঘ জীবনলাভ করিয়া দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি-প্রচেষ্টায় রত থাকিয়া কার্য করিতে সমর্থ হউন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।*

* পরলোকগমন—২.৩.১৯৪৯

টীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

রামমোহন

১ **কনৌজ ঃ** উত্তর প্রদেশের ফরাক্কাবাদ জেলার শহর। প্রাচীন নাম কন্যাকুব্জ বা কান্যকুব্জ।

২. **কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ** রামমোহনের প্রপিতামহ। তিনি তদানীন্তন বাংলার রাজ সরকারে চাকরি করে 'রায়-রায়ান' উপাধি পান।

৩. **রামকান্ত রায় ঃ** রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় মুর্শিদাবাদ সরকারে জায়গা-জমি দেখাশোনা করতেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার পঞ্চম সন্তান। রামকান্তের দ্বিতীয় স্ত্রী তারিণীদেবীর দ্বিতীয়পুত্র রামমোহন।

৪. **ব্রজবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়) ঃ** রামমোহনের পিতামহ ব্রজবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় আলিবর্দী খাঁর শাসনকালে বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ছিলেন এবং সম্রাট দ্বিতীয় আলম যখন পূর্বদেশে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর অধীনে কর্ম করে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

ব্রজবিনোদের সাতপুত্র ঃ রামমোহনের পিতামহ ব্রজবিনোদের সাতটি পুত্র ছিল। নাম—নিমানন্দ, রামকিশোর রাধামোহন, গোপীমোহন, রামকান্ত (রামমোহনের পিতা), রামরাম ও বিষ্ণুরাম।

৫ **শ্যাম ভট্টাচার্য ঃ** রামকান্তের শ্বশুর। রামমোহনের মাতামহ।

৬. **সাতকাণ্ড রামায়ণ ঃ** মূল রামায়ণের মোট—কাণ্ড সাতটি বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড।

৭. **রাধাকান্ত দেববাহাদুর** (১০.৩. ১৭৮৩ - ১৯.৪. ১৮৬৭) : পিতা গোপীমোহন, পিতামহ মুনশি নবকৃষ্ণ (রাজা) শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রাথমিক শিক্ষা ক্যালকাটা অ্যাকাদেমিতে। পণ্ডিতদের কাছে ফারসি ও সংস্কৃত শেখেন। হিন্দুকলেজ পরিচালন কমিটির সঙ্গে প্রায় ৩২ বছর যুক্ত ছিলেন। গৌরমোহন বিদ্যালংকারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তিকাটি প্রণয়ন ও প্রচারে সাহায্য করেন। ৪০ বছরের পরিশ্রমে তৈরী ৮ খণ্ডে 'শব্দকল্পদ্রুম' তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সরকার কর্তৃক কে. সি. এস. আই এবং রায়বাহাদুর' প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হন।

৮. **ডিগবি সাহেব ঃ** জন ডিগবি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন ও অন্য সকল সিবিলিয়ানদের মতো সর্বপ্রথম কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন। তারপর তিনি কালেক্টর হন। ১৮০১ এ রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৮০৫-১৮১৪ পর্যন্ত রামমোহন ডিগবির অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। "তিনি জন ডিগবির সেরেস্তাদার ও দেওয়ান ছিলেন। রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর, রংপুর এই সব জায়গায় তিনি ডিগবির সঙ্গে ছিলেন।...ডিগবির মুনশি হয়েছিলেন রামমোহন বেশির ভাগ সময়। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্র ছিল দৃঢ়। লোকে রামমোহনকে বলত ডিগবির দেওয়ান"। (বিজিতকুমার দত্ত—আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন রায়। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ৩য় মুদ্রণ ২০০২। পৃ. ৪)

৯ **আত্মীয়সভা** : রামমোহন মানিকতলার বাগানবাটিতে ব্রহ্ম উপাসনার জন্য আত্মীয়সভা স্থাপন করেন ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। এই সভাটিই পরে ১৮২৮এ ব্রাহ্মসমাজ এ রূপান্তরিত হয়। ড. দিলীপকুমার বিশ্বাসের ভাষায় 'এই আত্মীয়সভার মাধ্যমে বিকশিত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের ঐতিহ্য অবশেষে সম্পূর্ণ রূপায়িত হয় ১৮২৮ সালে স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজ' নামক প্রতিষ্ঠানে।' (রামমোহন সমীক্ষা—পৃ.২৮৪)

১০. **ব্রহ্মসঙ্গীত ঃ** রামমোহন সংকলিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত'-এর প্রকাশকাল ১৮২৮। এতে রামমোহন ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু রচিত গান সংগৃহীত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত রামমোহন গ্রন্থাবলিতে ৩২টি গান রামমোহনের রচনা বলে গৃহীত।

১১. **রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ** : ইনি ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি গঙ্গাতীরে মালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। ইনি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়নের পর কাশী প্রভৃতি বিভিন্ন পশ্চিমাঞ্চল পরিক্রমা করেন। রামচন্দ্রের শব্দ অলংকার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও ধর্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে রামমোহন তাঁর কাছে এনে রাখেন। এসময় তিনি (রামচন্দ্র) শিবপ্রসাদ মিত্রের কাছে উপনিষদ, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন ও গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রামমোহন 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করলে তিনি সেখানে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যাখ্যা করেন। পরে তিনি হেদুয়ার পুষ্করিণীর দক্ষিণে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে বেদান্তসার অধ্যাপনা করতে থাকেন। তিনি 'জ্যোতিষ সংগ্রহসার' (১৮১৭) রচনা করেন এবং বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান (১৮১৮) সংকলন করেন।

১২. **রামমোহন রচিত বইয়ের সংখ্যা ঃ**

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সাহিত্যসাধক চরিতমালার' ১ম খণ্ডে রামমোহনের গ্রন্থাবলির যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ—

১. আরবি ফারসি—	১টি
২. বাংলা ও সংস্কৃত—	৩০টি
৩. ক্ষুদ্র পুস্তিকা—	২টি
৪. ইংরেজি রচনা	
(কলিকাতা থেকে প্রকাশিত)—	৩৮টি
বিলাত থেকে প্রকাশিত—	১৩টি
	৮৪টি

১৩ **ব্রাহ্মণ সেবধি** : রামমোহন 'শিবপ্রসাদ শর্মা' ছদ্মনামে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশ করেন। জানা যায় পত্রিকাটির মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৪. **সমাচার চন্দ্রিকা** : ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ (২৩ ফাল্গুন, ১২২৮) এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৫. **ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরি অ্যাডাম ঃ** ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসার পর ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরি উইলিয়াম অ্যাডাম রামমোহন রায়কে বেদ অনুবাদের কাজে

সহায়তা করেন। রামমোহন যখন ইউনিটেরিয়ান কমিটি স্থাপন করেন তখন তিনি এর সম্পাদক হন। রামমোহনের প্রভাবে তিনি তাঁর ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদ ত্যাগ করে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হন। পরে অবশ্য রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মনান্তর ঘটে। রামমোহন সম্পর্কে তাঁর লেখা বইটি হোল—"A Lecture on the life and labours of Rammohon Roy delivered at Boston, U.S.A. 1845; Second ed. Calcutta 1879. ১৮২৯—৩৫ তিনি 'India Gazette' সম্পাদনা করেন। ভারত ছেড়ে আমেরিকা, পরে ব্রিটেনে 'ফিরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির' মুখপত্র 'British India Advocate'- এর সম্পাদক হন।

১৬. **সতীদাহ :** এর অন্য নাম সহমরণ। একান্তভাবে স্বামী অনুগতা স্ত্রীকে সতী বলা হলেও এক সময়ে কিন্তু মৃত স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় যে স্ত্রী মৃত্যু বরণ করতেন—তাকেই সতী বলা হোত। পূর্বে স্ক্যান্ডিনেভিয়া, গ্রিস, মিশর, চিন, মিশর প্রভৃতি দেশে কোনো কোনো সময় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সহমরণ প্রথার উল্লেখও আছে। সম্রাট আকবর এক সময় এই প্রথা রদ করার বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের দেশে এক সময় এই প্রথার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সমাচার দর্পণ পত্রিকার ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ সংখ্যায় যে পরিসংখ্যানটি তুলে ধরা হয়েছিল, সেটি এরূপ—

	১৮১৫	১৮১৬	১৮১৭
কলকাতার অন্তঃপাতী	২৫৩	২৮৯	৪৪১
ঢাকা	৩১	২৪	৫২
মুরশেদাবাদ	১১	২২	৪২
পাটনা	২০	২৯	৩৯
বেনারস	৪৮	৬৫	১০৩
বরেলী	১৭	১৩	১৯

রামমোহনের একান্ত চেষ্টায়, ইংরেজ সরকারের আন্তরিক সমর্থনে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের উদ্যোগে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে একটি আইন পাশ করে ৪ ডিসেম্বর এই নিদারুণ প্রথা নিবারিত হয়।

১৭. **উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক** : ১৮২৮-৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। কয়েকটি সংস্কারমূলক কাজের জন্য ভারতে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। সতীদাহ নিবারণে আইন প্রণয়ন (১৮২৯), ভারতীয়দের বিচার বিভাগে উচ্চপদে নিয়োগ, ঠগী দমন, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন, কলকাতার মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে আপন কীর্তি রেখে গেছেন।

১৮. **কবি টমাস মুর (১৭৭৯-১৮৫২)** : কবি জাতিতে আইরিশ। জন্ম ডাবলিনে। ট্রিনিটি কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর ইনার টেম্পলে আইন পড়তে যান। তরুণী কবির মনে ফরাসি বিপ্লবের দোলা লেগেছিল। আয়ার্ল্যান্ডে বিপ্লবের ঝড় তুলতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি। বায়রনকে পেয়েছিলেন বন্ধু হিসেবে। 'আইরিস মেলোডি'

রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি শুধু বায়রনের জীবনী লেখেননি, তার রচনাবলিও সম্পাদনা করেছেন।

১৯. **মেরি কার্পেন্টার** : এই মহিয়সী নারী ব্রিস্টলে রামমোহনের অসুস্থতার সময়ে যথেষ্ট পরিচর্যা করেছিলেন এবং 'The last days in England of Raja Rammohun Roy' গ্রন্থ লিখে তাঁর ভারত প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে এলে কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিস্টলে গেলে তাঁর গৃহে আতিথ্য লাভ করেছিলেন।

২০. **মেরি ক্যাসল** : ব্রিস্টলের বিখ্যাত ক্যাসল পরিবারের বিদুষী তরুণী।

২১. **ডেভিড হেয়ার ও তার ভগিনী** : রামমোহন যখন ব্রিস্টলে অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তাঁর সেবা শুশ্রূষা করার জন্য মেরি কার্পেন্টার ছাড়াও ভারতবন্ধু হেয়ারের ভগিনী ও উপস্থিত ছিলেন। রামমোহনের জীবনীগ্রন্থে তাঁকে কোথাও তার মেয়ে, কোথাও বোন, কোথাও ভাইঝি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস মেরি কার্পেন্টারের উক্তি তুলে দিয়ে প্রমাণ করেছেন, "ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী জ্যানেট হেয়ার ইংল্যান্ডে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং মৃত্যুশয্যায় তাঁর সেবা করেছিলেন।"

২২. **দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১.৮.১৮৪৬)** : জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সন্তান। পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়াও নিজেও সম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন। আইন ব্যবসায় শুরু করেন। সরকার কর্তৃক ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগনার নিমক মহলের কালেক্টরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৪ খ্রিঃ সরকারি কাজ ছেড়ে দিয়ে 'কার ও ঠাকুর কোম্পানির' যুগ্ম মালিকানায় রেশম ও নীল রপ্তানি করে, কয়লা খনি কিনে, জাহাজি ব্যবসায়ের পত্তন করে, চিনির কল স্থাপন করে, যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচলের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। রামমোহনের বন্ধু ছিলেন, সতীদাহ রদ আইনের ও ব্রাহ্মসমাজের সমর্থক ছিলেন। 'বেঙ্গল হরকরা', 'বেঙ্গল হেরাল্ড', 'বঙ্গদূত' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর মালিকানা ছিল।

২৩. **আরনোস ভেল ঃ** ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩-এ রা৩ আড়াইটায় সময় রাজা রামমোহন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৮ অক্টোবর স্টেপলটন গ্রোভে তাঁকে সমাহিত করা হয়। দশ বছর পর দ্বারকানাথ ঠাকুর লন্ডনে গেলে তিনি স্টেপলটন থেকে রামমোহনের দেহ সরিয়ে এনে ব্রিস্টলের কাছাকাছি, 'আরনোস ভেল' নামে আর এক জায়গায় সমাধিস্থ করেন। তিনি তার ওপরে তৈরি করে দেন অপূর্ব এক মন্দির।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. **প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ঃ** (১৭৯৪—১.৮. ১৮৪৬)। জ্যেষ্ঠতাত রামলোচনের দত্তক পুত্র। শিক্ষক শেরবোর্ন সাহেবের স্কুলে ও উইলিয়াম অ্যাডামের কাছে ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ করেন। ফরাসি ভাষা ও জানতেন। আইন শাস্ত্র আয়ত্ত করে কিছুদিন আইন ব্যবসা করেছিলেন। সরকার কর্তৃক ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশপরগনার নিমক মহলের কালেক্টরের দেওয়ানের পদ লাভ করেন। দু' বছর পর তিনি শুল্ক, লবণ ও আফিং বোর্ডের দেওয়ান

পদ লাভ করেন। দেওয়ানের পদে থাকাকালীন স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৩৪ এ সরকারি কাজ ছেড়ে দিয়ে কার ও ঠাকুর কোম্পানির যুগ্ম মালিকানায় ব্যবসা করেন। ব্যাঙ্কের ব্যবসা, জাহাজ চালানো প্রভৃতি ব্যবসায় নানা সময়ে লিপ্ত থাকেন। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৩৫) ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৪২ এ তিনি বিলেত যাত্রা করেন ও তাঁর রাজকীয় আড়ম্বর ও জাঁকজমক পূর্ণ জীবনযাত্রা দেখে সম্ভ্রান্ত ইংরেজগণ তাঁকে 'প্রিন্স' বলে সম্বোধন করতেন। লন্ডন শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

২ **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৫.৫.১৮১৭-১৯.১.১৯০৫)** : পিতা দ্বারকানাথ ও দিগম্বরী দেবীর প্রথম সন্তান। বাল্যশিক্ষা রামমোহন প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো হিন্দুস্কুলে এবং ১৮৩১ থেকে কয়েক বছর হিন্দুকলেজে। পরে পিতার বিষয়কার্যে ও ব্যবসায়ে কর্তৃত্ব পেয়ে বিলাসী হয়ে ওঠেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে পিতামহী অলকাসুন্দরী (যিনি দ্বারকানাথের গর্ভধারিণী নন, রামলোচন ঠাকুরের পত্নী) অর্থাৎ সৎ পিতামহীর মৃত্যুতে জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে মনে প্রবল আধ্যাত্মিক পিপাসা জেগে ওঠে। ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য ১৮৩৯ এ 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা', পরের অধিবেশনে সেটি পরিবর্তিত হয়ে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন। ১৮৪০ এ প্রতিষ্ঠা করেন 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'। ১৮৬৭ তে ব্রাহ্মগণ তাকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর 'আত্মজীবনী' বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৃতী সন্তানদের অন্যতম।

৩ **আদি ব্রাহ্মসমাজ** : দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ সাধারণভাবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বলে পরিচিত ছিল। নানা কারণে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মতান্তর দেখা দেওয়ায় কেশবচন্দ্র অন্য একটি সমাজ গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের' নাম রাখা হয় 'আদি ব্রাহ্মসমাজ।'

৪ **উপনিষদের ছেঁড়া পাতা** : এই ছেঁড়া পাতাটি রামমোহন রায় সম্পাদিত ঈশোপনিষদের ছিন্নপত্র ছিল। রামমোহন রায়ের সমস্ত গ্রন্থ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়িতে সাদরে রক্ষিত ছিল। এ ছেঁড়া পাতাটিতে ছিল ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং"

৫ **সাধারণ জ্ঞানোপার্জন সভা** : এটির ঠিক নাম 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা।' হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ বিশেষত হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর শিষ্যগোষ্ঠী, একটি সভায় তাদের মিলন সাধনের জন্য সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (Society for the Acquisition of General knowledge' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় ইংরেজি ও বাংলায় বক্তৃতাদান ও প্রবন্ধ পাঠ চলত। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে তারিখে।

৬. **তত্ত্ববোধিনী সভা** : ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর, (১৭৬১ শক ২১ আশ্বিন) দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। দ্বিতীয় অধিবেশনে আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপদেশে নাম রাখা হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'।

৭ **কার ঠাকুর এ্যাণ্ড কোম্পানি ঃ** ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে দ্বারকানাথ স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালানোর উদ্দেশ্যে সরকারি চাকরি ছেড়ে 'কার ঠাকুর এ্যাণ্ড কোম্পানি' স্থাপন করলেন। দ্বারকানাথ, মি উইলিয়ম কার, ও মি. উইলিয়ম প্রিন্সেপ এই তিন জনকে অংশীদার করে 'কার ঠাকুর এ্যাণ্ড কোং স্থাপিত হয়। পরে ভিন্ন ভিন্ন অংশীদার গ্রহণ করা হয়। আসলে দ্বারকানাথই ছিলেন এই কোম্পানির প্রাণ। আর্থিক বিষয়ে তিনি সর্বময় কর্তা ছিলেন।

৮. **তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা** : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মজীবনী'তে' তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন এভাবে—"ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।" এই সভার উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ পর পর তিনটি উপায় অবলম্বন করলেন—১. তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ২. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং ৩. শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার ও তজ্জন্য বারাণসীতে বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য চারজন ছাত্র পাঠানো। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—১. সদ্য প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকলেজে পাঠশালার আদর্শে বাংলার মাধ্যমে সবরকম শিক্ষা দেওয়া হবে; ২. প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে; ৩. দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অক্ষয়কুমার দত্ত ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি লেখার ব্যাপারে স্থির হয়েছিল। অবশ্য 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' কলকাতায় তিনবছর (১৮৪০ জুন-১৮৪৩ এপ্রিল) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন এই পাঠশালার কাজ শুরু হয়েছিল।

৯. **অক্ষয়কুমার দত্ত (১৫.৭ ১৮২০-২৮.৫. ১৮৭৬)** : বর্ধমান জেলার চূর্ণীগ্রামে জন্ম। পিতা দিগম্বর দত্ত, মাতা দয়াময়ী। শিক্ষা-ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। প্রথমে 'অনঙ্গমোহন' (১৮৩৪) কাব্যগ্রন্থ এবং 'ভূগোল' (১৮৪২) পাঠ্যপুস্তক রচনা করে সুধীসমাজে পরিচিত হন। কিছুকাল 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা' (১৮৪২) সম্পাদনা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনা করেন (১৮৪৩—১৮৫৫) পর্যন্ত। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হোল "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" (১ম-১৮৫১, ২য় ১৮৫৩); 'চারুপাঠ' (তিন খণ্ডে—১৮৫৩-১৮৫৯), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম-১৮৭০, ২য়-১৮৮৩),' 'বঙ্গীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' (১৮৫৫), ও পরে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র রজনীনাথ দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদন ও প্রবর্ধন করে 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' (১৯০১) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।

১০. **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঃ** ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে এই বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশ।

সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮৫৫ পর্যন্ত এটি সম্পাদনা করেন তিনি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মনীষী রাজনারায়ণ বসু এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। যদিও এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের বিবরণীর প্রকাশ, তবুও সমাজ, সাহিত্য রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান বিষয়ক নানা রচনা এতে প্রকাশিত হোত। অবশ্য এটি সর্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা নয়।

১১. **হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় ঃ** মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফের অবৈতনিক বিদ্যালয় হিন্দু কিশোর ও যুবকদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথ সহ আরও কয়েকজন, মিশনারিদের এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে সিমলার মতিলাল শীলের বাড়িতে আহূত সভায় একটি প্রথম শ্রেণির ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক, আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব ধনাধ্যক্ষ ও রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সহ অনেকেই এর পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। প্রায় এক বৎসর উদ্যোগ আয়োজনের পর ১৮৪৬ এর ১ মার্চ চিৎপুর রোডে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বৈঠকখানায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় (Hindu Charitable Institution) প্রতিষ্ঠিত হয়। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক ও রাজনারায়ণ বসু বিদ্যালয়ের ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন। জানা যায় ১০/১২ বছর প্রতিষ্ঠানটি চলেছিল।

১২. **ভূদেব মুখোপাধ্যায় (২২.১.১৮২৭-১৫.৫.১৮৯৪)** : হুগলির নতিবপুরে পণ্ডিত বংশে জন্ম। শিক্ষা প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ও পরে হিন্দু কলেজে। কর্মজীবনে প্রথমে শিক্ষক ও পরে বিদ্যালয় পরিদর্শক। ভূদেব 'শিক্ষাদর্শন ও সংবাদসার' (১৮৬৪) এবং 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ', (১৮৫৬)-এই দুটি পত্রিকা পরিচালনা করতেন। দুটিই শিক্ষাবিষয়ক পত্রিকা। তিনি বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন। সেগুলি হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (১৮৫৮), পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮), ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস (১৮৬২) প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) এবং 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৫) সমাজ চিন্তার উৎকৃষ্ট ফসল। তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) বাংলা উপন্যাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৩. **ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কিত পুস্তক ঃ** এই নামে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক কোনো বই নেই। সম্ভবত লেখক তাঁর ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কিত বইগুলির কথা বলতে চেয়েছেন। মোটামুটি ভাবে তাঁর ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক বইগুলি হোল ঃ

১. ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ ১ম ও ২য় খণ্ড (১৮৫০)

২. আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৮৫২-৫৩)

৩. ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০)

৪. কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২)

৫. ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান। (প্রথম প্রকরণ। ১৭৮৩ শক/১৮৬১ খ্রিঃ.

দ্বিতীয় প্রকরণ। ১৭৮৮ শক ১৮৬৬ খ্রিঃ.

ব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট ১৮০৭ শক/১৮৮৫ খ্রিঃ.

৬. ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী। ১৭৮৫ শক (১৮৬৪ খ্রিঃ)

৭. ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি। ১৭৮৬ শক (১৮৬৫ খ্রিঃ) প্রভৃতি।

১৪. **সমদর্শী পত্রিকা** : সমদর্শী বা The Liberal (দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা) ১২৮১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একটি নূতন বিবাদের সূচনা হয়েছিল। মহাপুরুষবাদ প্রসঙ্গ নিয়ে কেশব সেনের বিরোধী একটি গোষ্ঠী তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করে লিখলেন যে, 'যেহেতু প্রচারকগণ ঈশ্বর নিযুক্ত, সুতরাং তাঁদের কার্য্যের বিচার মানুষ করতে পারে না।' ঐ সময় কেশবচন্দ্র সেনের বিরোধী গোষ্ঠী হয়ে যে যুবকরা ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে 'সমদর্শী' নামে একটি দল গঠন ও একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন এবং এর সম্পাদক হলেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী।

১৫. **দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১১.৩.১৮৪০-১৯.১.১৯২৬) :**

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। বাল্যশিক্ষার পাঠ বাড়িতেই; পরে সেন্ট পলস স্কুল ও হিন্দুকলেজে ভরতি হয়েও পাঠ শেষ করেন নি। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, বাংলায় শর্টহ্যান্ড ও স্বরলিপির উদ্ভাবক। সমকালীন মাসিকপত্র তত্ত্বোধিনী ভারতী, সাধনা, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকাতেও তার রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনিই প্রথম বাংলায় 'মেঘদূত' কাব্যগ্রন্থ অনুবাদ করেন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যগ্রন্থ বাংলাসাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন।

১৬. **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪.৫.১৮৪৯-৪.৩.১৯২৫)** : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। তিনি ছিলেন কবি, নাট্যকার ও অনুবাদক। ১৮৬৮ তে কাদম্বরীদেবীর সঙ্গে বিবাহ। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), 'অলীকবাবু' (১৯০০) তাঁর কৌতুকসৃষ্টি ক্ষমতার পরিচায়ক। তাঁর 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯), 'সরোজিনী' (১৮৭৫) প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এ ছাড়াও তিনি 'শকুন্তলা' (১৮৯৯), 'উত্তরচরিত' (১৯০০), 'রত্নাবলী' (১৯০০), 'মালতীমাধব' (১৯০০), 'মৃচ্ছকটিক' (১৯০১) প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন। বালগঙ্গাধর তিলকের 'গীতারহস্য' গ্রন্থের অনুবাদ তাঁর অন্যতম বিশেষ সাহিত্যকর্ম।

১৭. **স্বর্ণকুমারী দেবী (২৮.৮.১৮৫৫-৩.৭.১৯৩২)** : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও কবি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা। জানকীনাথ ঘোষাল এর স্বামী। ইনি প্রথম ভারতীয় মহিলা ঔপন্যাসিক। 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার প্রণয়কাহিনি নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন। এছাড়া 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯) 'মিবাররাজ' (১৮৭৭) 'বিদ্রোহ' (১৮৯৪), 'কাহাকে' (১৮৯৮) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। অনেকের মতে 'স্নেহলতা' (১৮৯২) তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তিনি কয়েকটি নাটকও রচনা করেন। দীর্ঘকাল 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তিনি বহু প্রবন্ধও রচনা করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১. **জগন্মোহন ন্যায়ালংকার ঃ** রোজগারের আশায় ঠাকুরদাস কলকাতায় চলে এলেন। আশ্রয় পেলেন জগন্মোহন ন্যায়ালংকারের বাড়িতে। কিন্তু ইংরেজি না শিখলে তো চাকরি জুটবেনা—তাই তার এক বন্ধুকে বলে কয়ে তিনি ঠাকুরদাসের ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু নানা কারণে ঠাকুরদাসের সেখানে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি।

২. **ভাগবতচরণ সিংহ ঃ** ১৩ নং দয়েহাটা, বড়বাজারের (বর্তমান ১৩ এ.বি. সি নং দিগম্বর জৈন (টেম্পল রোড) নিবাসী উত্তররাঢ়ী কায়স্থ জমিদার ভাগবতচরণ সিংহের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয়ের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঠাকুরদাসকে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে রাখলেন। তিনি ঠাকুরদাসকে আট টাকা মাইনের একটি চাকরিও জুটিয়ে দেন। আর দুবেলা খেতে পাওয়া যেত ভাগবতচরণের বাড়িতে। এই ভাগবতচরণের একপুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ ও এক কন্যা রাইমণি।

৩. **রামকান্ত তর্কবাগীশ ঃ** ২৩ কি ২৪ বছর বয়সে ঠাকুরদাসের বিয়ে হোল ভগবতী দেবীর সঙ্গে। ভগবতীর বাড়ি গোঘাটে, তাঁর বাবার নাম রামকান্ত তর্কবাগীশ। আসল নাম রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ভগবতীর মামা বাড়ি আরামবাগ মহকুমার পাতুলে, মাতামহের নাম পঞ্চানন তর্কবাগীশ।

৪. **ভবানন্দ শিরোমণি ঃ** ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন "তিনি (বিদ্যাসাগর), যখন জননীগর্ভে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন তাঁহার জননী উন্মাদিনী। নানাপ্রকার ঔষধাদি সেবন করাইয়া কেহ তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলনা। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই প্রসূতি আরোগ্যলাভ করিলেন, তাহার পূর্বজ্ঞান পূর্বভাব সমস্তই ফিরিয়া আসিল।....কথিত আছে যে, উদয়গঞ্জনিবাসী জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমণি মহাশয় এই আসন্নপ্রসবা বধূর কোষ্ঠী গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, বধূমাতার কোন প্রকার পীড়া হয় নাই। ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহারই তেজঃপ্রভাবে প্রসূতি অধীরা হইয়া পড়িয়াছেন।"

(চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর। আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৭৬ ঃ পৃ. ৬—৭)

৫ **রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ঃ** খানাকুল কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে পাতুল গ্রামনিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের (মুখোপাধ্যায়) চারপুত্র ও দুই কন্যা। চার পুত্রের নাম রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, রামধন তর্কবাগীশ, গুরুপ্রসাদ শিরোমণি, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও কন্যারা হলেন গঙ্গামণি দেবীও তারাসুন্দরী দেবী। গঙ্গামণি দেবীর সঙ্গে গোঘাট নিবাসী সিদ্ধতান্ত্রিক রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। এঁদের দুই কন্যা জন্মে-লক্ষ্মীমণি দেবী ও ভগবতী দেবী। ভগবতী দেবীর সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। তাই সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের বড় মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ। শৈশবে অসুস্থ হয়ে পড়লে ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় মাস ছয়েক পাতুলে গিয়ে থাকেন ও বড় মামা রাধামোহনের যত্নে আরোগ্যলাভ করেন। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনচরিতে তাঁর এই মাতুলের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

৬ **জগদ্দুর্লভ সিংহ ঃ** ভাগবতচরণের একমাত্র পুত্র। ভাগবতচরণ প্রয়াত হলে জগদ্দুর্লভ সংসারের কর্তা হন। ঠাকুরদাস তখন ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখাপড়ার জন্য কলকাতায় নিয়ে এসেছেন। জানা যায় ভ্রমবশত চোরাই কোম্পানির কাগজ কিনে সরকারের দ্বারা দণ্ডিত হন ও তাঁর বাড়ি কিছুকালের জন্য পুলিশ বেষ্টিত থাকে। মোকদ্দমায় তিনি বেশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

৭. **একুশ বছর বয়সে.....বিদ্যাসাগরে উপাধি লাভ ঃ** তথ্যটি ঠিক নয়। তিনি ১৮৩৯ এব ১৬ মে বিদ্যাসাগর উপাধি পান। তাই তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি পান ঠিক ২০ বছর ৭ মাস ১০ দিন বয়সের সময়। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর উত্তীর্ণ হন। এই বছরেই ঈশ্বরচন্দ্রের নামের সঙ্গে বিদ্যাসাগর উপাধি যুক্ত হয়।" This Certificate has been granted to the said Issurchunder Vidyasagur under the seal of Committee this 16th day of May in the year 1839..."

৮. **সতেরো বছর বয়সে.....**তথ্যটি ঠিক নয়। তিনি ২০ বছর ৭ মাস ও ১০ দিন বয়সকালে ল কমিটির পরীক্ষায় পাশ করে ত্রিপুরার জজ পণ্ডিত পদে নির্বাচিত হন কিন্তু নিযুক্ত হননি।

৯. **ত্রিপুরার জজ পণ্ডিতের পদ ত্যাগ ঃ** সেকালে যাঁরা আদালতে জজ-পণ্ডিত হতেন, তাঁদের হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় পাশ করতে হত। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল এই কমিটির পরীক্ষা দেন। এবং দেখা যাচ্ছে এই কমিটির সেক্রেটারী J.G.C. Sutherland ঐ সালের ১৬ মে তারিখে ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিচ্ছেন। এর পর থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের নামের শেষে বিদ্যাসাগর উপাধিটি যুক্ত হয়। এর কিছুদিন পর বিদ্যাসাগর ত্রিপুরার জজ পণ্ডিতের পদে প্রার্থী হন। চাকরিটি পাওয়া গেলেও বাবার অমতে তিনি কাজে যোগ দেননি।

১০. **কারসাহেব ঃ** চটিসহ পা উপরে তুলে হিন্দুকলেজের ডাকসাইটে অধ্যক্ষ কার সাহেবকে তারই অনুকরণে অভ্যর্থনা করে উচিত শিক্ষাই দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

১১. **দিনময়ী দেবী :** মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই গ্রামের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য ও তারাসুন্দরী দেবীর কন্যা দিনময়ী। দিনময়ী দেবীর জন্ম ১৫.১১.১৮২৯, বিবাহ ১৮৩৪ এ এবং কলকাতায় মৃত্যু ১৬.৮.১৮৮৮ এ।

১২. **১২৯৭ সালের ১০ শ্রাবণ ঃ** ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই রাত প্রায় দুটোর সময় বিদ্যাসাগর কলকাতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর ১০ মাস ৩ দিন। লিভারের ক্যানসারের দরুণ তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বলে চিকিৎসকরা অভিমত দেন।

কেশবচন্দ্র সেন

১. **রামকমল সেন (১৫.৩.১৭৮৩-২.৮.১৮৪৪) :** জন্মস্থান—চব্বিশপরগনার গরিফা। পিতার নাম গোকুলচন্দ্র। গ্রামে এক পাদরির স্কুলে ও কলকাতায় রামজয় দত্তের স্কুলে ইংরেজি ও বাড়িতে সংস্কৃত শেখেন। ১৮১৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে কেরানির

কাজে নিযুক্ত হয়ে আপন বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় সম্পাদকের পদ লাভ করেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি প্রভৃতি নানা সম্মানিত পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর সংকলিত 'ইংরেজি বাংলা অভিধান' এদেশের মানুষের দ্বারা সম্পাদিত প্রথম অভিধান। তাঁর 'ঔষধসার' (১৮১৬), 'নীতিকথা' (১৮১৮), হিতোপদেশ (১৮২০) তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁর পৌত্র ছিলেন।

২. **প্যারীমোহন সেন** : রামকমল সেনের চারপুত্রের মধ্যে প্যারীমোহন দ্বিতীয়। তিনিও পিতার ন্যায় ট্যাঁকশালের দেওয়ান ছিলেন। পিতার মতই তিনি ধর্মপরায়ণ ও বদান্য ছিলেন। পরম বৈষ্ণবসুলভ গুণগুলি ছিল তাঁর মধ্যে। গোপনে তিনি বহু গরিবদুঃখীকে সাহায্য করতেন। তাঁর হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল ও দয়ার্দ্র।

৩. **এলবার্ট হল বা অ্যালবার্ট হল** : ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান অ্যালবার্ট হল। এটিকে অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট ও বলা হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের নাম অনুসারে এটির নামকরণ হয়। এই হলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু মুসলমান ও খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের মিলন ক্ষেত্র হিসেবে। কোনো বিশেষ ধর্ম বা রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠান এটি ছিল না। তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল এই হলের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। দ্বারোদ্‌ঘাটন কালে তিনি এই হল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। টেম্পলের বক্তৃতায় চারটি উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে। (১) সঙ্গীত, জলসা ও নির্দোষ আমোদ প্রমোদ (২) সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা ও বিতর্ক (৩) গ্রন্থাগার বা জনসাধারণের পঠনের ব্যবস্থা (৪) জনহিতকরী বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা আহ্বান। বর্তমানে অ্যালবার্ট হলের অস্তিত্ব লুপ্ত।

৪. **গুডউইল ফ্রেটারনিটি : (Goodwill Fraternity)** : ১৮৫৭ সালের পূর্ব থেকেই কেশবচন্দ্র ড. চামার (Chalmer) এবং থিয়োডোর পার্কারের (Theodore parker) এর রচনাবলি পড়ে সেগুলি দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। ঐ সময় তিনি তাঁর আপন বাড়িতে গুডউইল ফ্রেটারনিটি (Goodwill Fraternity) নামে একটি ক্ষুদ্র সভা বা সমাজ স্থাপন করেছিলেন। ঈশ্বর আমাদের পিতা আমরা পরস্পর ভাই। এইরকম একটি মত দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উক্ত সভায় তিনি চামার ও পার্কারের রচনাবলি পড়ে শোনাতেন। কেশবচন্দ্রের অনুরোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও দুএকবার ঐ সভায় সভাপতিত্বও করেছেন।

৫. **ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি** : কেশবচন্দ্র সেন প্রথম থেকে ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষার উপরে জোর দিতেন। আমরা জানি ১৮৫২ সালের পূর্বে হিন্দু স্কুলে কেবল হিন্দু ছাত্ররাই লেখাপড়া করতে পারতো, কিন্তু ১৮৫২ সালের নভেম্বর মাস থেকেই এটি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত হয়। পরে এটি এর প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগেই হেয়ার স্কুলে পরিণত হয়। স্কুলটি সব সম্প্রদায়ের ছাত্রের মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। কেশবচন্দ্র সেন যৌবনে সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে সভা সমিতির অনুষ্ঠান করতেন। এই স্কুলে ১৮৫৮ সাল নাগাদ তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি ছাড়াও ধর্মবিষয়ক আলোচনাও এতে স্থান পেতো।

৬. **১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি চাকুরি ছাড়িয়া দিলেন।** জানা যায় ১৮৬১ এর জুলাই মাসে তিনি এই চাকুরি ছেড়েছেন।

৭. **কেশবচন্দ্রের পত্নী** : কেশবচন্দ্রের পত্নীর নাম জগন্মোহিনী দেবী। তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে কিছুদিন লেখাপড়া করেছিলেন। ১৮৫৫ এর এপ্রিল মাসে বালিগ্রামের চন্দ্রনাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠাকন্যা জগন্মোহিনী দেবীর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয়।

৮. **ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদ গ্রহণ ঃ** ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদ গ্রহণ করেন।

৯ **মোক্ষমূলর ঃ** (Maxmuller, Friedrich), ১৮২৩-১৯০০) বহুভাষাবিদ্ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ এই জার্মান পণ্ডিতটি মাত্র ২০ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে দীর্ঘদিন প্রধান অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। ৬টি খণ্ডে ঋগ্বেদের অনুবাদ (১৮৪৯-১৮৭৩) তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এছাড়া তিনি ৫১টি খণ্ডে বিশেষজ্ঞ কুড়ি জন পণ্ডিতের সহায়তায় 'Sacred Book of the East' সম্পাদনা করেন। ৪৮টি খণ্ড তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতীয় দর্শনের নানা গ্রন্থ ছাড়াও তিনি Ramakrisha : His life and Teachings' নামেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

১০. **জন, স্টুয়ার্ট মিল ঃ** (১৮০৬-১৮৭৩) বিশিষ্ট দার্শনিক, ঐতিহাসিক জেমস মিলের পুত্র। অতি অল্প বয়সেই পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'ইণ্ডিয়া হাউসের' সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আজীবন সাংবাদিকতা ও গ্রন্থরচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। মিল গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। মানব সমাজে ব্যক্তির অবদানই প্রধান এবং সামজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোন ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক নয়—এই ছিল তাঁর মতবাদের মূল কথা। 'Principles of political Econony' এবং 'Essay on Liberty তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

১১. **ফ্রান্সিস, নিউম্যান** (F.W. Newman) ঃ বিখ্যাত একেশ্বরবাদী। জন্ম ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে। ম্যাঞ্চেস্টার নিউ কলেজ ও পরে লন্ডন ইউনিভারসিটি কলেজের অধ্যাপক হন। তিনি অধ্যাপনা কার্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক সমন্বয়বাদী বিশ্বধর্মমতের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রধান গ্রন্থ Phases of Faith প্রকাশিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী তার 'History of the Brahmo Samaj-এ অধ্যাপক নিউম্যানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "Professor F.W. Newman, the eminent and wellknown English theist, who was a regular contributor in aid of our funds, died in England this year (1897)." p. 339

১২ **গ্ল্যাডস্টোন, উইলিয়াম ইউয়ার্ট' (১৮০৯-১৮৯৮) ঃ** ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর ল্যাঙ্কশায়ারের অন্তর্গত লিভারপুল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ২০ বছর বয়সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ থেকে

সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ইনি ইংল্যান্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে ৬০ বছর কাল অতিবাহিত করেছিলেন। ইনি ১৮৬৮, ১৮৮০ এবং ১৮৮৬ এই তিনবার ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি গ্রিক, ল্যাটিন, ফরাসি প্রভৃতি বহু ভাষা জানতেন। তিনি ইংল্যান্ডের রাজনীতির উজ্বল নক্ষত্র ছিলেন।

১৩. **ডিন স্ট্যানলি ঃ** প্রধান পাদরি বা ধর্মযাজক। কেশবচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

১৪. **মহারাণী ভিক্টোরিয়া (১৮১৯—১৯০১) ঃ** ভূতপূর্ব ভারতেশ্বরী। জন্ম ১৮১৯ এর ২৪ মে। পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়ম নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে, ইনি আইন অনুসারে ১৮৩৭ এর ২১ জুন সিংহাসন লাভ করেন ও তাঁর অভিষেক হয় ২৮ জুন তারিখে। প্রিন্স অ্যালবার্টের সহিত ১৮৪০ এর ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর বিবাহ হয়। সিপাহি বিদ্রোহের পর তিনি ভারতের শাসনভার আপন হস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতেশ্বরী উপাধিগ্রহণ করেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। সুদীর্ঘ ৬৪ বছর তিনি রাজ্যশাসন করেন। ১৯০১ এর ২২ জানুয়ারি তিনি লোকান্তরিতা হন।

১৫. **কুচবিহারের মহারাজা :** ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হয় যে, কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতিদেবীর (১৩) সঙ্গে কুচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের (১৫) বিবাহ হবে। এই বিবাহ ১৮৭৮ এর ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়।

১৬. **অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা :** এখানে কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭. **ভিক্টোরিয়া কলেজ :** ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত সংস্কার সভার অধীনে কেশবচন্দ্র মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র নারীজাতির স্বাধীনতা ও উন্নতির সমর্থক হলেও ছেলেমেয়েদের একই ধরনের শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। এজন্য স্ত্রীদের উপযোগী বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১মে ১০ নং আপার সার্কুলার রোডে একটি স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই দ্বিতীয় বছর থেকে 'ভিক্টোরিয়া কলেজ' নামে অভিহিত হয়।

১৮. **ভারতসংস্কার সভা :** ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ভারতসংস্কার সভা (Indian Reform Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবাসীর সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভায় ছিল পাঁচটি বিভাগ—(১) সুলভ সাহিত্য প্রকাশ (২) দুঃস্থ ব্যক্তিদের দান (৩) নারীজাতির উন্নতি সাধন (৪) সাধারণ শিক্ষা, শিল্পবিদ্যালয়ও শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় (৫) সুরাপান নিবারণ। মূল সভার সভাপতি ছিলেন কেশবচন্দ্র স্বয়ং, সম্পাদক ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র ধর, আর প্রত্যেকটি বিভাগের একজন করে সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১. **প্যারীচাঁদ মিত্র (২২.৭.১৮১৪-২৩.১১.১৮৮৩)** : ডিরোজিওর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম হিন্দু কলেজের ছাত্র। উনিশ শতকের চিন্তাশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক হয়েছিলেন। রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে যৌথভাবে 'মাসিক পত্রিকা' (১৬ আগস্ট, ১৮৫৪) সম্পাদনা করেন। টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে লেখা 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত। 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), অভেদী' (১৮৭১), প্রভৃতি কয়েকটি কাহিনি রচনা করেন।

২. **বঙ্কিমের জন্ম ঃ** ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ আষাঢ় (ইং ১৮৩৮ এর ২৬ জুন) মঙ্গলবার রাত ৯টার সময়।

৩. **যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** : বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২০১ বঙ্গাব্দের ১৮ পৌষ (ইং ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বে এঁদের পৈতৃক ভিটে ছিল কোন্নগরের নিকটবর্তী দেশমুখোয়। এঁদের এক বংশধর মাতামহের সম্পত্তি লাভ করে কাঁটালপাড়ায় বসবাস শুরু করেন। যাদবচন্দ্র ফারসি ও ইংরেজিতে দক্ষতা লাভ করেছিলেন। সরকারি চাকুরি সূত্রে তিনি ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হন। যাদবচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে দুর্গাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি ছিলেন হুগলির বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের কন্যা, ইনিই বঙ্কিমের মা। যাদবচন্দ্র ছিলেন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ, খড়্গনাসা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, তেজোদীপ্ত পুরুষ। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি (১৩ মাঘ ১২৮৭) সাতাশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি নিজে সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিখেছিলেন।

৪. **জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ** বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাই। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ, মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র, তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও চতুর্থ পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিমের ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে পিতা যাদবচন্দ্র ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে অনেক কথা লিখেছেন। সেটি এরূপ "আমাদের জ্যেষ্ঠতাত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাজপুরের নিমকপোক্তানের দারোগা ছিলেন। সেকালে ওইটি একটি লোভনীয় পদ ছিল; কেননা ঐ পদের মর্যাদাও খুব ছিল এবং বেতনও ভাল ছিল। জ্যাঠামহাশয় ঐ স্থানে বহুকাল ছিলেন এবং সে দেশের লোকের নিকট তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি উহা কাশীনাথ মন্দির বলিয়া খ্যাত।"....(সূত্র ঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী। আনন্দ পাব, ১৯৯১। পৃ. ৫৪১)

৫. **যাদবচন্দ্রের পুনর্জীবন লাভ ঃ** পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

৬ **রামজয় সরকারের পাঠশালা ঃ** পাঠশালার গুরুমশায়ের নাম রামজয় সরকার নয় 'রামপ্রাণ সরকার'।

৭. **সাত বৎসর বয়সে মেদিনীপুরে ইংরেজি স্কুলে ভরতি :** জানা যায় ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ৬ বছর বয়সে তিনি মেদিনীপুরে ইংরেজি স্কুলে ভরতি হন—সাত বছর বয়সে নয়।

৮. **বঙ্কিমের প্রথমা স্ত্রী :** দশবছর আটমাস বয়সে অর্থাৎ ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কাঁটালপাড়ার নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামের নবকুমার চক্রবর্তীর পাঁচবছর বয়সের মেয়ের সঙ্গে বঙ্কিমের বিয়ে হয়। কন্যার নাম মোহিনী দেবী। যথার্থ অর্থে তিনি সুন্দরী ছিলেন। সুন্দরী দেখে অগ্রজ শ্যামাচরণ এখানেই বঙ্কিমের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৯ **দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ :** প্রথমা স্ত্রী বিয়োগের আটমাস পর বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের নেগুয়াঁর (কাঁথি) বদলি হয়ে এসেছেন সেই বছরই অর্থাৎ ১৮৬০ সালের জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরী বাড়ির দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে বঙ্কিমের বিয়ে হয়। এই স্ত্রীর প্রভাব বঙ্কিমের জীবনে খুব বেশি ছিল।

১০. **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (৯.৩.১৮১১—২৪.১.১৮৫৯) :** চব্বিশ পরগনার কাঁচড়াপাড়ায় জন্ম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব একটা পাননি। 'সংবাদ প্রভাকর' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে খ্যাতনামা হন। এ ছাড়া 'পাষণ্ডপীড়ন', সংবাদরত্নাবলী' ও সংবাদ সাধুরঞ্জন' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'কালীকীর্ত্তন' (১৮৩৩), 'ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫৫), 'বোধেন্দুবিকাশ' (১৮৬৩) 'ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্র' (১৮৬৩) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

১১. **সংবাদ প্রভাকর :** ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৮৩৬ খ্রিঃ বারত্রয়িক অর্থাৎ সপ্তাহে ৩ বার করে বেরুতে থাকে। ১৮৩৯ এ বাংলাভাষায় প্রথম দৈনিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ লেখক এই পত্রিকায় লিখতেন। সম্পাদক এই পত্রিকাতেই প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত প্রকাশ করেন। ১৮৫৯ এ সম্পাদকের প্রয়াণের পর তাঁর ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত এই পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন।

১২. **সংবাদ সাধুরঞ্জন :** ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে (আগস্ট ১৮৪৭) তে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি প্রতি সোমবার প্রভাকর যন্ত্র থেকে প্রকাশিত হোত। পত্রিকাটি ১২৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ পর্যন্ত জীবিত ছিল। এই পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পেত।

১৩. **দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১.১১. ১৮৭৩) :** নদিয়া জেলার চৌবেড়িয়ায় জন্ম। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লেখার মধ্য দিয়েই সাহিত্য জগতে প্রবেশ। তাঁর প্রথম বিতর্কিত নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। সমকালীন নীলকরদের অত্যাচারে লাঞ্ছিত দেশীয় চাষীদের দুরবস্থা অবলম্বন করে তিনি এই নাটকটি লেখেন। এটিই প্রথম বিদেশী ভাষায় অনূদিত বাংলা নাটক। ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা এই নাটকটি দিয়ে। তাঁর রচিত 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'লীলাবতী'

(১৮৬৭) 'জামাই বারিক' (১৮৭২) এবং 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) প্রভৃতি নাটক তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তিনি 'সুরধুনী' (১ম-১৮৭১, ২য়-১৮৭৬) নামে একটি দীর্ঘ কাব্য লিখেছিলেন।

১৪. **দ্বারকানাথ অধিকারী** : বিস্মৃত কবি ব্যক্তিত্ব। ১৯ শতকের কবি। নদিয়ার কৃষ্ণনগরে বাড়ি। ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। একবার 'বুনো কবি' ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুকে উপলক্ষ করে 'সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ' নামে কবিতা প্রকাশ করলে তাদের মধ্যে কবিতা যুদ্ধ শুরু হয়। এই কবিতাগুলি কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' নামে সংবাদ প্রভাকরে এক বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৫. গুপ্ত কবির কাগজে-কবিতা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বঙ্কিমের কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিম যখন হুগলি কলেজের ছাত্র তখন তিনি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরের হয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন ও সম্পাদক তাকে যথেষ্ট উৎসাহও দেন। গবেষকদের মতে শ্রী ব.চ.চ. স্বাক্ষরিত ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১৪ ফাল্গুনে প্রকাশিত নিম্নোক্ত পদ্যটিই সংবাদ প্রভাকর-এ প্রকাশিত বঙ্কিমের প্রথম মুদ্রিত কবিতা।

কবিতাটি হল ঃ চন্দ্রাস্য সহাস্য করে ঊষাকালে সতী।
প্রিয় করে করি করে, কহে পতি প্রতি।।
প্রিয়া প্রতি পতি তার করিছে উত্তর
চরণে চরণে দেয়, উত্তর সত্বর।।

প্রথম চরণে স্ত্রীর উক্তি।
দ্বিতীয় চরণে পতির উক্তি।

এছাড়া, 'জীবন ও সৌন্দর্য অনিত্য' (২৮ মে, ১৮৫২), 'হেমন্ত বর্ণনাদৃষ্ট স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন' (২০ জানুয়ারি, ১৮৫৩), 'শিশির বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রী-পতির কথোপকথন' (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩), ছাড়াও বহু কবিতা এবং গদ্য (ছাত্র হইতে প্রাপ্ত), ২৩ এপ্রিল ১৮৫২ ও বর্ষাঋতু (গদ্য) ১০ জুলাই, ১৮৫২ প্রকাশিত হয়।

১৬. **যদুনাথ বসু (১৩. ১০. ১৮৩৬-২.৫. ১৯০২) ঃ** ২৪ পরগণা জেলার শুকদেবপুরে জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম গ্রাজুয়েট (১৮৫৮)। অপরজন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারি মি. ইয়ং দুই গ্রাজুয়েটকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি দেন। ৩৪ বছর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে অবসর গ্রহণ করেন।

১৭. **কাঁথিতে অবস্থানকালে ঃ** বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট লেফটেনান্ট গভর্নমেন্টের আদেশে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টররূপে নিযুক্ত হন। ঐ পদে তিনি ১৮৬০ এর ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত বহাল ছিলেন। বদলির আদেশে তিনি ১৮৬০ এর ৭ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুরের নেগুয়াঁয় (কাঁথি) মহকুমায় পৌছে ৯ তারিখে কার্যভার গ্রহণ করেন। এই বছরের জুনমাসে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। গত বছর তাঁর প্রথমা

স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে। ঐ বছরের ৯ নভেম্বর তিনি খুলনাতে বদলি হয়ে আসেন। নেগুয়াঁতে তাঁর কার্যকাল হোল মাত্র ৯ মাসের।

১৮. **অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদে ঃ** 'বঙ্কিমজীবনী' থেকে জানা যায়—১৮৭১ এপ্রিল, থেকে মে এক মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরস্থ রাজসাহী কমিশনারের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের পদে কাজ করেন। ২৫ এপ্রিল (মতান্তরে ১৫ এপ্রিল অ্যাসিস্টান্টের কাজে নিযুক্ত হন ও পরের মাসে ২৮ মে তারিখে পুনরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের দায়িত্বে ফিরে আসেন।

১৯. ২০. **রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই খেতাব ঃ** ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র তার পরিণত বয়সে প্রথম সরকারি খেতাব লাভ করেন। এই উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে সে সময় যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ঠিক দু'বছরের পর অর্থাৎ ১৮৯৪ এর জানুয়ারিতে তিনি ইংরেজ সরকার কর্তৃক সি. আই. ই অর্থাৎ কম্প্যানিয়ান অফ দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার (Companion of the Indian Empire) উপাধি লাভ করেন। এটা আরও একটু বেশি সম্মানের।

২১. **বঙ্কিমের উপন্যাস সমূহ** : বঙ্কিমচন্দ্র ছোটোবড় করে ১৪টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বিষয়বস্তুর ওপর লক্ষ রেখে সেগুলির এরূপ শ্রেণিবিন্যাস করা যেতে পারে।

ক ঐতিহাসিক—দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), মৃণালিনী (১৮৬৯), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) রাজসিংহ (১৮৮২)

খ. সামাজিক বা গার্হস্থ্য : বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) ইন্দিরা (১৮৭৩), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)

গ. ক্ষুদ্রাকার রোমান্টিক প্রেমকাহিনি ঃ রাধারাণী (১৮৭৫), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪)

ঘ. সমস্যামূলক-কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)

ঙ. তত্ত্বমূলক ঃ আনন্দমঠ (১৮৮৪), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)

২২. **ধর্মতত্ত্ব** : বঙ্কিমচন্দ্র রচিত নিবন্ধ। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অর্থাৎ বেন্থাম, মিল, কোঁৎ প্রভৃতি দার্শনিকদের মতের অনুসরণে গীতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটির প্রকাশকাল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

২৩. **বিবিধ প্রবন্ধ** : বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রবন্ধগুলির সংকলন 'বিবিধ প্রবন্ধ' দুটি খণ্ডে (১ম-১৮৮৭) এবং ২য় (১৮৯২) প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম খণ্ডের বিষয়বস্তু হল সাহিত্য কেন্দ্রিক ও দ্বিতীয়খণ্ডের বিষয় মূলত ধর্ম, সমাজ ও ইতিহাস।

২৪. **কমলাকান্তের দপ্তর** (১৮৭৫): বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন। কমলাকান্ত নামক এক আফিংখোর খ্যাপাটে কিন্তু চিন্তাশীল ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে কবিত্ব, দেশপ্রেম, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপশক্তি সমস্তই তিনি একাধারে পরিবেশন করেছেন। অনেকের মতে এটিই বঙ্কিমের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

২৫. **বঙ্গদর্শন ঃ** ১২৭৯-র বৈশাখে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হোল। ১২৮২-র চৈত্র মাসের পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৪-র বৈশাখে আবার

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১২৮৫-র চৈত্রসংখ্যাটি প্রকাশের পর এটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৭-র বৈশাখ থেকে আবার বেরুতে শুরু করে। ১২৮৮ তে আবার অনিয়মিত হয়ে পড়ে। আশ্বিন সংখ্যা বেরুতে চৈত্র গড়িয়ে যায়। ১২৮৮-র কার্তিক থেকে চৈত্র কোনো সংখ্যাই প্রকাশিত হয়নি। ১২৮৯ এর বৈশাখ সংখ্যাটি নবম বর্ষের ১ম সংখ্যা হিসেবেই প্রকাশিত হয়। ১২৮৯ এর চৈত্র সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর সঞ্জীবচন্দ্র পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেন। ১২৯০-র কার্তিক মাস থেকে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। চন্দ্রনাথ বসু তাঁকে সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতেন। ১২৯০-র পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

(তথ্যসূত্র—সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ। ২য়-স্বপন বসু)

২৬. **বন্দেমাতরম্** : বন্দেমাতরম্ গানটির রচনাকাল কবে তা স্থির করা কঠিন। তবে গবেষক অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, "বঙ্গদর্শনে ১২৮১ এর কার্তিক সংখ্যায় কমলাকান্তের দপ্তরের অন্তর্গত 'আমার দুর্গোৎসব', শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে মাতৃমূর্তিকে যেভাবে বন্দনা করা হয়েছে তারই কি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ নয় 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রখানি? বোধহয় 'আমার দুর্গোৎসব', রচনার স্বল্পকালের মধ্যেই বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত রচিত হয়েছিল।" (বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী পৃ. ৩৩২) শ্রীঅরবিন্দও তার একটি লেখায় বলেছিলেন বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত ১৮৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল।

২৭. **প্রয়াণ ঃ** ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র অর্থাৎ ১৮৯৪ এর ৮ এপ্রিল অপরাহ্ন তিনটে পঁচিশ মিনিটের সময় স্বগৃহে তিনি লোকান্তরিত হন।

কৃষ্ণদাস পাল

১-২. **ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও গৌরমোহন আঢ্য** : মধ্য কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলে সামান্য লেখাপড়া জানা অথচ বিদ্যোৎসাহী গৌরমোহন আঢ্য ছোট আকারে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। পরে এটি বটতলার চন্দ্র মিত্রের বাড়ি থেকে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। এদেশীয়রা যাতে ইংরেজি শিক্ষা পান, সেজন্য তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজি শিক্ষার জন্য এদেশের ছাত্রদের খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে যেতে হোত। সেখানে মিশনারিদের প্রচারিত ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট পড়ত। তাই ধর্মপ্রভাব মুক্ত উচ্চ ইংরেজি স্কুল স্থাপন বাংলা দেশের শিক্ষা জগতে গৌরমোহনের এক বিশেষ অবদান। তখনকার দিনের বিশিষ্ট মনীষীবৃন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণদাস পাল, সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গৌরমোহন নিচের ক্লাসে ফিরিঙ্গি, মাঝের ক্লাসে বাঙালি ও উঁচু ক্লাসে উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ ও বাঙালি শিক্ষক নিযুক্ত করতেন।

৩. **রেভারেণ্ড মরগ্যান ঃ** পেরেন্টাল অ্যাকাডেমির (ডভ্‌টন কলেজের) অধ্যক্ষ ছিলেন মি মরগ্যান। সম্ভবত পুরো নাম রেভারেণ্ড অ্যান্ড্রু মরগ্যান।

৪. **হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ** : ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে শীলস্ ফ্রি কলেজের জীবনে একটি ঘটনা ঘটে। এই বছরের প্রথম দিকে সরকারি শিক্ষা সমাজ ও হিন্দুপ্রধানদের মধ্যে হিন্দু কলেজে হীরা বুলবুল নামক এক পশ্চিমা গণিকার পুত্রকে ভরতি করা নিয়ে বিবাদ বাধে। এতে হিন্দুসমাজ খেপে যান। হিন্দু সমাজের নেতারা ১৮৫৩ এর ২মে বড়বাজারে সিন্দুরিয়া পটিতে রামগোপাল মল্লিকের সুবৃহৎ বাস ভবনে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. **সিপাহী বিদ্রোহ** : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। তাতে ভারতীয় সিপাহিদের ভূমিকা যথেষ্ট ছিল বলে এটি 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে বহু ঐতিহাসিক ঐ বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেছেন।

৬. **ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি** : লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষ থেকে চলে গেলে স্থায়ী বড়লাট নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত মেটকাফ অস্থায়ীভাবে এই পদে নিযুক্ত হন। এই পদে বসেই তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হন এবং এই মর্মে আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮৩৫ এর ৩ আগস্ট এবং কাজ শুরু হয় ১৫ সেপ্টেম্বর। কলকাতাবাসী মেটকাফকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য 'মেটকাফ লাইব্রেরি বিল্ডিং' নামে একটি গ্রন্থাগার ভবন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটি পরে 'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি' নামে পরিচিত হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। বড়লাট লর্ড কার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি একত্রিত হয় ১৯০৩ এর ৩০ জুন। তখনই এর নাম হয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। প্রথম কুড়ি বছর এর কাজকার্য মেটকাফ হলেই চলতে থাকে। তারপর এসপ্ল্যানেড রো ইস্ট ও জবাকুসুম হাউসে কিছুদিন থাকার পর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ন্যাশানাল লাইব্রেরি নাম গ্রহণ করে প্রাক্তন বড়লাটের প্রাসাদ বেলভিডেয়ারে উঠে আসে।

৭. **কার্কপ্যাট্রিক, উইলিয়াম ঃ (১৭৫৪-১৮১২)** ঃ কর্নেল জেমস কার্কপ্যাট্রিকের পুত্র উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক ১৭৭৩ এ বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রিতে যোগ দিয়ে ১৮১১-এ মেজর জেনারেল হন। পরে কমান্ডার-ইন চিফ জেনারেল Stibbert এর কাছে পারসি ব্যাখ্যা করার কাজ পান। গোয়ালিয়রে থাকাকালীন লর্ড কর্নওয়ালিসেরও পারসি অনুবাদকের কাজ করেন। দীর্ঘকাল ধরে নানা দায়িত্বশীল পদে ছিলেন। তিনি ভারতীয় বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন ও প্রাচ্যের বহুভাষা জানতেন। টিপুসুলতানের ডায়েরি ও চিঠির পারসি থেকে অনুবাদ করেন। ১৮১২ এর ২২ আগস্ট তিনি লোকান্তরিত হন। তিনি কৃষ্ণদাস পালের সমিতিতে জুরির বিচার (Trial by Jury) নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৮. **মি. কাওয়েল ঃ** পুরো নাম Cowell, Edward Byles (১৮২৬-১৯০৩)

যৌবনে স্যার উইলিয়ম জোন্সের গ্রন্থরাজি পড়ে ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হন। ভারতে এসে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস এবং পলিটিক্যাল ইকোনমির অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে ১৯৫৮-তে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষও হয়েছিলেন। ১৮৬৪

সালে ভারত ত্যাগ করেন ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ লেখা ছাড়াও তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। ভারতপ্রেমিক এই মানুষটি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণদাসের অনুরোধে সেই সমিতিতে কাউয়েল সাহেব গ্রিসের ইতিহাস (History of Greece) শীর্ষক বক্তৃতা দেন।

৯. **ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া** : ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে শ্রীরামপুর মিশনারিদের উদ্যোগে মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার' প্রকাশ। ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের এই পত্রিকাটির প্রকাশের পিছনে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর (কেরি, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান) বিশেষ ভূমিকা ছিল। মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশের কিছুদিন পর ১৮২০ সেপ্টেম্বর মাস থেকে জোশুয়া মার্শম্যানের উদ্যোগে পত্রিকাটির একটি ত্রৈমাসিক সংস্করণ বেরোতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও নানা বইপত্রের সমালোচনা এতে স্থান পেতো। এই সংস্করণের ১৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মাসিক ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া ১৮২৮ এর সেপ্টেম্বর সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৮৩৫ এর ১ জানুয়ারি থেকে সাপ্তাহিক ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার পুনরাবির্ভাব। ১৮৮৩ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে স্টেটসম্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

১০. **ডি. এল. রিচার্ডসন, ক্যাপটেন** (David Lester Richardson) ১৮০১— ১৮৬৫) ভারতে এসে ১৮১৯-এ বেঙ্গল আর্মিতে যোগদান। ১৮২৩ এ লেফটেন্যান্ট। ১৮২৯-এ মিলিটারী পেনসনার্স লিস্টের অন্তর্ভুক্ত হন। ১৮৩৭ এর ১ এপ্রিল হিন্দুকলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক এবং ৩ এপ্রিল ১৮৩৯ এ হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ হন। চারমাসের ছুটি নেন ও ১৮৪৩ এর ১৯ এপ্রিল কাজে ইস্তফা দিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান। পরে ফিরে এসে ১৮৪৬ এর ১ জানুয়ারি কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন। হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ হন ১ ডিসেম্বর ১৮৪৬ এ। ১৮৪৮ এর ২৯ অক্টোবর আবার মি. কার (Mr. kerr) এর সঙ্গে বিনিময় করে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে চলে আসেন। ১৮৬০ এর ১৪ এপ্রিল প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। ১৮৬১ তে ভারত ছেড়ে চলে যান। ১৮৬৫ এর ২৭ নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি নিজে কবি ও সমালোচক ছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য Miscellaneous poems কলকাতা থেকে ১৮২২-এ, Sonnets and other poems লন্ডন থেকে ১৮২৫-এ, Literary leaves ১৮৩৬-এ, Literary Chitchat এবং Selection from the British poets from the time of Chauser to the present day with Biographical notes and critical notes (in one volume) ১৮৪০ সালে, কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছিলেন। এটি ছিলো ১৯২১ পৃষ্ঠার বই। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি বেশ কয়েকটি কাব্য ও কাব্য সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর শেক্সপিয়র পঠন সেকালে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল।

১১. **ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান**-British Indian Association : ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর (মতান্তরে ৩১ ডিসেম্বর) British Indian Association নামে

একটি নূতন সভা স্থির করা হয়। প্রথম সভাপতি হলেন রাজা রাধাকান্ত দেব এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, আশুতোষ দেব, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি এর সভ্য ছিলেন এবং সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২. **দিগম্বর মিত্র, রাজা (১৮১৭-২০.৪.১৮৭৯)** : জন্ম হুগলির কোন্নগরে। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র, ডিরোজিওর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম। কর্মজীবনে বহুবিধ বৃত্তিগ্রহণ করেছিলেন। শেয়ার ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ রোজগার করে জমিদার হন। ভারত সভার সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন। অবৈতনিক বিচারক, জাস্টিস অফ্ পিস, ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য ও কলকাতার প্রথম বাঙালি শেরিফ নির্বাচিত হন। অবশ্য তিনি বহুবিবাহ রদ আইন প্রবর্তনের ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরোধিতা করেন।

১৩. **প্রসন্নকুমার ঠাকুর (২১.১২.১৮০১—৩০.৮.১৮৬৮)** : কলিকাতা হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রক্ষণশীল হিন্দু গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিলেও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন ও বহু বিবাহ রোধে উৎসাহ দেখাননি। 'Reformer' নামে এক ইংরেজি সাপ্তাহিক ও 'অনুবাদক' নামে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। বাঙালির নিজস্ব প্রথম নাট্যশালা হিন্দু থিয়েটার এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর বহু দানের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনলক্ষ টাকা দান ও ঐ টাকার সুদে বিশ্ববিদ্যালয়ে ল-অধ্যাপক পদের প্রবর্তন হয়। সরকার কর্তৃক সি. এস. আই উপাধিতে ভূষিত হন।

১৪. **হিন্দু প্যাট্রিয়ট** : ১৮৫৩ সালের ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে হিন্দু প্যাট্রিয়টের আবির্ভাব। পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন মধুসূদন রায়। এই সময় পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। শুরু থেকেই পত্রিকাটির সঙ্গে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যোগ ছিল। পরে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে এই পত্রিকাটির সমস্ত স্বত্ব কিনে নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে সম্পাদনার দায়িত্ব তুলে দেন। এ সময় গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরে এই শম্ভুচন্দ্রের ওপর সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়ে। এ সময় পত্রিকাটির অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলে কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। বিদ্যাসাগরের পরামর্শ অনুযায়ী পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব কৃষ্ণদাস পালের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১৮৬১ এর ২১ নভেম্বর থেকে কৃষ্ণদাসের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৮৮৪) পত্রিকাটি কৃষ্ণদাস সম্পাদনা করতেন। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পরও পত্রিকাটির প্রচার থাকে অব্যাহত। ১৮৯২ এর মার্চ মাসে হিন্দু প্যাট্রিয়ট দৈনিকপত্রে রূপান্তরিত হয়। আরও বেশ কিছুদিন অর্থাৎ ১৯২৩ পর্যন্ত চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৫. **হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এপ্রিল ১৮২৪—১৬.৬.১৮৬১)** : আদিনিবাস শ্রীধরপুর বর্ধমানে। কলকাতায় ভবানীপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। স্কুলের পড়া শেষ করে বাধ্য হয়ে একটি চাকরিতে যোগ দিতে হয়। পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে মিলিটারি অডিটর জেনারেলের অফিসে কেরানির পদ পান।

প্রকাশকাল থেকেই 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁর সম্পাদনা কালে পত্রিকাটি খ্যাতির শীর্ষে পৌছায়। প্রগতিধর্মী যে কোনো আন্দোলনকে পত্রিকাটি সমর্থন জানাতো। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, বিধবা-বিবাহের পক্ষে ও কৌলিন্য প্রথার বিপক্ষে পত্রিকাটির ভূমিকা স্মরণীয়। ব্রিটিশ শাসন বিষয়ে হরিশচন্দ্রের উঁচু ধারণা থাকলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার ও অপশাসন ব্যাপারে তিনি ছিলেন সমালোচক। তবে নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে ও মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন।

১৬. **কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-২৪.৭.১৮৭০)** : জোড়াসাঁকো নিবাসী শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র এবং নন্দলাল সিংহের পুত্র। তেরো বছর বয়সে বিদ্যোৎসাহিনী সভার (১৮৫৩) প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার (১৮৫৫) এবং বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার এর (১৮৫৬) মাধ্যমে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবেশ। রামনারায়ণ অনূদিত 'বেণীসংহার' নাটকে অভিনয় করেন। 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' (প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, শিল্প ও সাহিত্যবিষয়ক), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'হুতোম প্যাচার নক্শা' (১৮৬১-৬২) তাঁর স্মরণীয় সাহিত্য কীর্তি। সমকালীন পণ্ডিতদের নিয়ে সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদও (১৮৬০-৬৬) তাঁর অক্ষয় কীর্তি। মাত্র ৩০ বছর তিনি বেঁচেছিলেন।

বিবেকানন্দ

১. **হার্বার্ট স্পেনসার (এপ্রিল ২৭, ১৮২০—ডিসেম্বর ৮, ১৯০৩)**। ইংরেজ দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববাদী ও ডারউইনের তত্ত্বের প্রবল সমর্থক। বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক স্বামীজি তাঁর "The Science of the First Principles" দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ কীর্তি ৯টি খণ্ডে রচিত "System of Synthetic philosophy' (1855-96)। স্পেনসার ডারউইনের 'Origin of Species' এই তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে Survival of the fittest'-এই ধারণার জন্ম দিলেন। "স্পেনসার ব্যাখ্যা করলেন যে শক্তিশালী সে তার প্রজাতির দুর্বলদের মেরে-ধরে, কেড়ে বিগড়ে, খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে। আমাদের ধারণাতেও এই ভুলটুকু চলে আসছে। ফিবলম্যান, এই শতকের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ লিখলেন, "This theory has come to be Called "Social Darwinism' has had a diastrous effect. Because it seemed to justfy strong-arm methods of winning the struggle for existence, it has been used by ruthless seekers after power, for instance by those modern bully-boys, the fascists"—অর্থাৎ এই সর্বনাশা মতবাদ যা ডারউইনের 'সামাজিক মতবাদ' বলে পরিচিত, তার সর্বনাশা ফল ফলেছিল। কারণ 'জীবনসংগ্রামে' জেতার নামে তা দমন নীতিকে সমর্থন করত। নির্মম ক্ষমতালোভীরা এটা ব্যবহার করেছে, যেমন করেছে আজকালকার গুণ্ডারা ও ফ্যাসিস্টরা।"

আর একটা কথা, ডারউইন কিন্তু strongest individual' বলেননি, বলতে চেয়েছেন 'strongest species'/ অর্থাৎ একজন নয়, একটি প্রজাতি।"

(সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়—স্বামীজির ভারত পরিভ্রমণের প্রেক্ষাপট (প্রবন্ধ) উদ্বোধন প্রকাশিত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ (১৯৯৩) গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃত/পৃ. ৪৫৭)

২. **রামকৃষ্ণদেব (১৮.২.১৮৩৬-১৬.৮. ১৮৮৬)** : হুগলির কামারপুকুরে জন্ম। বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। বাল্যকালে নাম ছিল গদাধর। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তেমন হয়নি, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। যৌবনে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পুরোহিত নিযুক্ত হন। এখানেই তিনি কালীসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর ভক্তশিষ্য মহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রীম) তাঁর বাণী ও উপদেশ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' সংকলন করে গেছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে আসেন। রামকৃষ্ণদেবের মতে সব ধর্মই সত্য, 'যত মত তত পথ'। মনীষী রম্যা রঁলা শ্রীরামকৃষ্ণকে 'ত্রিশ কোটি মানুষের দু'হাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের সার' বলে বর্ণনা করেছেন।

৩. **আলোয়ারের রাজা** : ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে স্বামীজি আলোয়ার রাজ্যে গমন করেন। সেখানে বাঙালি ডাক্তার গুরুচরণ লস্কর ও এক মৌলবি সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আলোয়ার দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজির আমন্ত্রণে স্বামীজি সেখানে আসেন ও আলোয়ারের মহারাজা মঙ্গলসিংহের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। পরে মহারাজের সঙ্গে স্বামীজির সন্ন্যাসগ্রহণের তাৎপর্য, সন্ন্যাসের বেশে দেশে দেশে ফেরা ও পৌত্তলিকতার তাৎপর্য সম্বন্ধে নানা তর্কবিতর্ক হয়। এখানেই মহারাজের ফটোর ওপর থুতু ফেলার ঘটনা ঘটে। পরে আলোয়ারের রাজা স্বামীজির কৃপাপ্রাপ্ত হন।

৪. **খেতরির রাজা** : খেতরির রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে স্বামীজির আলাপ হয় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন। প্রাথমিক অভিবাদন ও কুশল প্রশ্নাদির পর স্বামীজির সঙ্গে রাজার নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয়। স্বামীজির ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে রাজা তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলেন। ধীরে ধীরে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়। রাজা স্বামীজিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন—স্বামীজির সামনে তিনি করজোড়ে জানু পেতে অভিবাদন করতেন ও তাঁর সেবার জন্য তৈরি থাকতেন। স্বামীজিও মনে করতেন তাঁর এই শিষ্যটির দ্বারা জগতের বহু কল্যাণ সাধিত হবে। তিনি শুধু তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে সাহায্য করেননি, লৌকিক জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হয়েছিলেন। খেতরিতে প্রায় তিনমাস অবস্থান কালে (৭ আগস্ট থেকে ২৭ অক্টোবর) রাজা তাঁর কাছে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং নক্ষত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চ কক্ষে একটি ল্যাবোরেটরি প্রতিষ্ঠা করে গুরু শিষ্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা গবেষণায় মেতে থাকতেন। গীতবাদ্য ও চলতো মাঝে মাঝে।

স্বামীজিরও বেশ লাভ হয়েছিল। রাজস্থানের অগ্রণী বৈয়াকরণ নারায়ণ দাসজির কাছে তিনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য আয়ত্ত করেছিলেন।

৫. **মুদালিয়র পি. সিঙ্গারভেলু** : পি. সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজের বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন নিরীশ্বরবাদী ও স্বামীজির জ্ঞান পরিমাপ করতে বসে নিজেই তাঁর সুগভীর জ্ঞান সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। তিনি কিছুদিন শুধু ফল ও দুধ খেয়েছিলেন সেজন্য তাঁকে সকলে কিডি বা টিয়াপাখি বলে ডাকত। তিনি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও বালক স্বভাব ছিলেন ও কথা বলতে বলতে অনেক সময় কেঁদে ফেলতেন। কর্ম ও জ্ঞান ভাবের চেয়ে সেবাভাবটা তার মনে প্রবল ছিল। ইনি শেষ পর্যন্ত সব ত্যাগ করে স্বামীজির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বামীজির ইচ্ছায় মাদ্রাজে যখন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়, তিনি হন তার অবৈতনিক কার্যাধ্যক্ষ। স্বামীজির পূতস্পর্শে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। পরে ঠাট্টা করে স্বামীজি বলতেন "সিজার এল, সিজার দেখল ও সিজার জয় করল; কিন্তু কিডি এল, কিডি দেখল, আর কিডি বিজিত হল।"

৬. **রাইট, জন হেনরি** : আমেরিকার গ্রিক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন জন হেনরি রাইট। তাঁর একটি পরিচয়পত্র স্বামীজিকে ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দেবার সুযোগ করে দিয়েছিল। অধ্যাপক রাইট তাঁর শংসা পত্রে লিখেছিলেন 'এই তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য আমাদের সমস্ত অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যের সমষ্টির চেয়ে বেশি। তিনি সূর্যতুল্য, তাঁর পরিচয়পত্রের দরকার হয় না।" স্বামীজিকে তিনি শুধু পরিচয়পত্র দেননি অধ্যাপক রাইটের পল্লিবাস অ্যানিস্কোয়ামে অতিথি হিসাবে কয়েকদিন কাটাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অ্যানিস্কোয়াম বোস্টন শহর থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত সমুদ্র তীরবর্তী একটি গ্রাম।

৭ **মি. বনি বা বনি চার্লস ক্যারল** (Bonney Charles Carrol): কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমেরিকা এক অভূতপূর্ব বিশাল উৎসবের আয়োজন করেছিল। সেই উৎসবের নাম দেওয়া হয়েছিল—বিশ্ব কলম্বীয় প্রদর্শনী—World's Columbian Exposition। এর উদ্দেশ্য ছিল, সারা বিশ্বে যত কিছু উন্নতি হয়েছে তার ফলাফল এক জায়গায় এনে দেখানো, যাতে মানুষ নিজের কত ক্ষমতা তা স্বচক্ষে দেখতে পায়। সব কিছুর সাথে মানুষের চিন্তাজগতেও কতটা উন্নতি হয়েছে তা দেখাতে হবে, শোনাতে হবে। সত্যিই অদ্ভুত এক পরিকল্পনা! এ ব্যাপারে একজন খ্যাতিনামা আইন ব্যবসায়ী চার্লস ক্যারল বনি প্রস্তাব দিলেন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মে ধর্ম মহাসম্মেলনের আয়োজন করার। বনি শুধু ব্যবহারজীবীই ছিলেন না তিনি আমেরিকার সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ও একজন নেতা ছিলেন। তিনি বিশ্বমেলার আয়োজকদের সমর্থন পেলেন। মূল বিশ্বমেলা আর একটি কমিটি গড়ল যার সভাপতি হলেন বনি। কমিটির নাম দেওয়া হোল—World's Congress Auxiliary of the Columbian Exposition'

৮. **ভগিনী নিবেদিতা** (২৮. ১০. ১৮৬৭-১৩. ১০. ১৯১১) ঃ আয়ার্ল্যান্ডের ডানগ্যাননে জন্ম। পূর্বনাম-মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। স্কুলের পাঠ শেষ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কাজ নেন। আপন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনি ও রাশিয়ার বিপ্লব কাহিনি পড়তে পড়তে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ছোটছোট ছেলেমেয়েদের বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চারিত করে দেবার জন্য ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রাস্কিন স্কুল স্থাপন করেন। ঠিক এ সময় অর্থাৎ ১৮৯৫ তে স্বামীজি ইংল্যান্ডে আসেন ও একটি আলোচনা চক্রে তিনি প্রথম বিবেকানন্দের বাণী শুনে মুগ্ধ হন। ১৮৯৮ তে তিনি স্বামীজির আহ্বানে ভারতে চলে আসেন এবং ২৫ মার্চ স্বামীজি তাঁকে দীক্ষা দিয়ে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে অভিহিত করেন। কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে তিনি রামকৃষ্ণসংঘের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তিনিও সেবাকার্যে ব্রতী হন। স্বামীজির পরিকল্পনা মাফিক বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ৪.৭. ১৯০২ তে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর তিনি ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৩ এর জানুয়ারিতে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, এই অপরাধে তাঁকে মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করতে হয়। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ও কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। অত্যধিক পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়লে দার্জিলিং-এ জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুর আতিথ্য গ্রহণ করেন ও সেখানেই লোকান্তরিতা হন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হল ঃ The Web of Indian life, 'The Master as I saw Him', Notes of some Wanderings with Swami Vivekananda. প্রভৃতি।

৯. **কাপ্তেন সেভিয়ার** : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্য দেশে বিদেশে কয়েকজন মানুষ সত্যবদ্ধ হলেন। ব্যারোজ, স্টার্ডি, ম্যাকস্‌মূলার, ডয়সন পশ্চিমে প্রচার করলেন, আর ক্যাপটেন সেভিয়ার এলেন আলমোড়ায়, গুডউইন মাদ্রাজে, নিবেদিতা কলকাতায়।

১০. **গুডউইন, জে. জে.** : আমেরিকায় স্বামীজির বক্তৃতাসমূহ ও ক্লাসনোটগুলি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য শ্রুতিলিখনে পারদর্শী জে. জে. গুডউইন নামক এক ইংরেজ যুবককে নিযুক্ত করা হয়। গুডউইন স্বামীজির ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও বিনা বেতনে শ্রুতিলিখনের কাজ ছাড়াও ব্রহ্মচারী হিসাবে স্বামীজির ব্যক্তিগত কাজও করতে থাকেন। শ্রুতিলিখনে অসামান্য পারদর্শী ও নিরলস এই ইংরেজ যুবকটির জন্যই স্বামীজির বক্তৃতাগুলি পরবর্তীকালে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। Marie Louise Burke তাঁর Swami Vivekananda : His second visit to the west : New Discoveries. গ্রন্থে বলেছেন "Josiah J. Goodwin, whose passage through Swamiji's Mission coincided almost exactly with the deliverance in New York, London, and India of his main message to the world had died in 1898." p. 643-44.

১১. **অদ্বৈত আশ্রম** ঃ হিমালয়ে একটি আশ্রম স্থাপনের স্বপ্ন স্বামীজির বহুদিনের।

১৮৯৬-এ ক্যাপ্টেন জে এইচ সেভিয়ার ও মিসেস শার্লট এলিজাবেথ সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তাঁরা অদ্বৈত সত্য উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। সেভিয়ার দম্পতি তাঁর অদ্বৈত সত্যকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। "বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এই সত্যের একটি স্থায়ী যজ্ঞকুণ্ড স্থাপিত হোক, সেখান থেকে নিত্যবিচ্ছুরিত হবে আলোক। আদর্শ যজ্ঞস্থলী হিমালয়। অধ্যাত্মস্বভাবে বিবেকানন্দ সমতলের নন-হিমালয়ের সন্তান। হিমালয়ের অদ্বৈতকে সমতলের দ্বৈতের মধ্যে স্থাপন করাই ছিল তাঁর জীবনব্রত।"

১৮৯৬ এর গ্রীষ্মে স্বামীজি যখন ইউরোপে, সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে আলপ্‌স পর্বতে তুষারভূমিতে বিচরণ করেছিলেন, তখন তাঁর মন আচ্ছন্ন ছিল হিমালয়ের স্মৃতিতে। স্বামীজি ভেবেছিলেন, জীবনের কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে—তখন তিনি চলে যাবেন হিমালয় আশ্রমে শান্তির মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে। তিনি আরও ভেবেছিলেন "এখানে প্রাচ্যও পাশ্চাত্য শিষ্যেরা থাকবে একসঙ্গে—তাদের তিনি শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে দেবেন। তারপর ভারতীয় শিষ্যেরা যাবে পাশ্চাত্যে বেদান্ত শিক্ষা দিতে আর পাশ্চাত্য শিষ্যরা ভারতে থেকে যাবে এখানকার মানুষের কল্যাণকর্ম সম্পাদনে।"

সাত হাজার ফুট উঁচু পাহাড়, আরও কয়েকশো ফুট উঁচুতে আছে একটি সুন্দর অগভীর হ্রদ, সামনে তুষার শৃঙ্গমালা, অসীম নির্জনতা, দীর্ঘ উন্নত দেওদারের গভীর নিশ্বাসে মথিত হয় দিনে রাতে—এমনই স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মদিনে ১৮৯৯ সালের ২১ মার্চ অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হোল। জায়গাটির নাম ছিল মায়ীপট, বদলে করা হোল 'মায়াবতী। নিকটতম রেলস্টেশন ৬০ মাইল দূরে।

(তথ্যসূত্র ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু : বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৫ম) ১৯৮১। পৃ. ৩৩১-৩২)

১২. **ব্রহ্মবাদিন ঃ** স্বামীজির এক সহযোগী, তাঁর বিদেশ গমনের প্রধান উদ্যোক্তা আলসিঙ্গা পেরুমলের সক্রিয় সহযোগিতায় বেদান্তভিত্তিক একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্বামীজি মনে মনে এরকম একটি ব্যাপার চেয়েছিলেন। স্বামীজি টাকা সংগ্রহের শুধু প্রতিশ্রুতি দিলেন না আগেভাগে বেশ কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলেন।১৮৯৫ এর ৩০ জুলাই এর পত্রে তিনি পত্রিকার নাম 'ব্রহ্মবাদিন' এবং মটো "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" অনুমোদন করে, উৎসাহ দিয়ে লিখলেন 'সন্ন্যাসীর গীতি'—এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ।"

অবশেষে 'ব্রহ্মবাদিন' প্রকাশিত হোল ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫। তখন এটি পাক্ষিক পত্র। এটি আলসিঙ্গা পেরুমলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলেও সম্পাদনার কাজ করতেন তাঁর ভগ্নীপতি অধ্যাপক এম. রঙ্গাচার্য। ২৪ অক্টোবরের ভিতরে স্বামীজি দুটি সংখ্যা হাতে পেয়ে মন্তব্য করেন 'বেশ হয়েছে এইরূপ করে চলো। কাগজের কভারটা একটু ভাল করবার চেষ্টা করো, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাষাটা আর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি একটু উজ্জ্বল করবাব চেষ্টা করো। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলোর জন্য রেখে দাও।"

'ব্রহ্মবাদিন'-এ কি জাতীয় রচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত—সে বিষয়ে স্বামীজি এই সালের ১৮ নভেম্বরের একটি চিঠিতে লিখলেন "ব্রহ্মবাদিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুনো দরকার। দ্বিতীয়ত লেখার ধাঁজটা ভারি খটমটে হচ্ছে। একটু যাতে স্বচ্ছ, সরস ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা করো।" এদিকে 'ব্রহ্মবাদিন'-এ অ্যানি বেশান্তের থিয়োজফির প্রভাব খুব বেড়ে যাওয়ায় তিনি আলসিঙ্গাকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। আলসিঙ্গার প্রয়াণের কয়েক বৎসর পর ১৯১৪ তে 'ব্রহ্মবাদিন' বন্ধ হয়ে যায়।

Indian Mirror, July 27, 1895 লিখেছিল—"The Main object of the Journal is to propagate the principles of the Vedantic Religion of India and to work towards the improvement of the Social and Moral Conditions of man by steadily holding aloft the sublime and universal ideal of Hinduism."

১৩. **প্রবুদ্ধ ভারত ও তার দুই পর্ব** ঃ ব্রহ্মবাদিন-এর ভাষা কড়া ছিল বলে স্বামীজি নানাস্থানে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। আর একটু সহজ করে দ্বিতীয় আর একটি পত্রিকা বার করা যায় কিনা চিন্তাভাবনা শুরু হোল। শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন, "এই পত্রিকা এখন ইংরেজিতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মাসিকপত্র এবং অনেকের মতে ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৫ম), ১৮৯৬। পৃ. ২৫) এই পত্রিকার ভাবনাটা আলসিঙ্গার মাথায় উঠেছিল। তবে স্বামীজির পত্রাবলি থেকে জানা যায় প্রারম্ভিক পরিকল্পনা করেছিল ডাঃ ননজুন্ডা রাও। নিউইয়র্ক থেকে ডাঃ রাওকে স্বামীজি লিখছেন ১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬ এর একটি চিঠিতে "ছেলেদের জন্য প্রস্তাবিত কাগজে বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং তার জন্য আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।...তবে ভাষা ও লেখাগুলো যাতে সহজতর হয় সেদিকে নজর দেবেন। ধরুন, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে সে সব গল্প ছড়ানো আছে তা সহজবোধ্য ভাষায় আবার লিখে জনপ্রিয় করা দরকার।...গল্পের ভেতর নীতি ও আদর্শ ঢুকিয়ে দেওয়াই হবে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।" ২৮ অক্টোবর, ১৮৯৬ তে তিনি লিখছেন, "প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য একটি গল্প আরম্ভ করেছি শেষ হলেই পাঠিয়ে দেব।"

'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটি স্বামীজির কাছ থেকে পাওয়া। তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে একটি সংঘ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সেই সংঘ নামটি তিনি পত্রিকার নাম হিসেবে বেছে নিলেন।

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রসপেক্টাস জুন, ১৮৯৬ তে বিভিন্ন পত্রিকায় দিয়ে দেওয়া হয়। জুলাই ১৮৯৬ এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ বলে মনে করি। (কারণ অধ্যাপক বসুর প্রবন্ধে কোন্ মাস থেকে প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশিত হয় তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই।) সমকালীন বিভিন্ন ধর্মীয় পত্রিকা ধর্মীয় উদারতার কথা বলেছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার

এক বছরের মধ্যেই সেটি "সমগ্র ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা' রূপে গণ্য হয়।

এতো ভালো চললেও মাত্র দু'বছরের মাথায় (জুন ১৮৯৮) পত্রিকাটি বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। কারণ পত্রিকাটির সম্পাদক মিঃ বি. আর. আজম আয়ারের ২৬ বছর বয়সে অকালমৃত্যু।

দ্বিতীয় পর্বের শুরু ১৮৯৮ এর জুলাই সংখ্যা বাদ দিয়ে আগস্ট সংখ্যা থেকে। একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে 'ব্রহ্মবাদিন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে পরিচালিত হলেও বিবেকানন্দ স্থাপিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকা ছিলনা। মালিক ছিল অন্য। নবপর্যায়ের প্রবুদ্ধভারতে আগেকার প্রচ্ছদ ও মটো বদলে দেওয়া হোল। এবং করা হোল কঠোপনিষদের "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত"—স্বামীজি কৃত অনুবাদ "Arise and Awake, and stop not till the goal is reached."

আলমোড়া শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে মায়াবতীতে স্থায়ীভাবে হিমালয় আশ্রম তৈরি হয়েছিল, 'অদ্বৈত আশ্রম' নাম দিয়ে ১৮৯৯, ২১ মার্চ। সেখানে স্থাপিত হয় প্রবুদ্ধভারতের কার্যালয়। সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটি ছোট প্রেস ও কয়েকজন কর্মী। সম্পাদক হলেন এক কট্টর অদ্বৈতবাদী স্বামী স্বরূপানন্দ। তিনি পূর্বাশ্রমে ছিলেন ডন পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক—রামকৃষ্ণ-ভক্ত হয়েও রামকৃষ্ণ মূর্তির পুজো করেননি। এই স্বরূপানন্দ ও দীর্ঘজীবী হননি। ১৯০৬ তে তিনি দেহ রাখেন। স্বরূপানন্দের পর নিবেদিতা, পরে বিরজানন্দ, প্রেমানন্দ ও অশোকানন্দের মত প্রাজ্ঞ সাধুদের হাত বেয়ে পত্রিকাটি তরতর করে এগিয়ে চলেছে।

পত্রিকার নবজন্ম উপলক্ষে স্বামীজি "To the Awakened India (আগস্ট ১৮৯৮) এবং ঐ সময়েই তাঁর শিষ্য গুডউইনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত "Requiescat in peace"— এই দুটি কবিতা পত্রিকার ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৪. **উদ্বোধন ঃ** স্বামীজির প্রতীক্ষিত ও বহু আকাঙ্ক্ষিত 'উদ্বোধন' আত্মপ্রকাশ করল ১ মাঘ, ১৩০৫ সন (১৪ জানুয়ারি ১৮৯৯)। পাক্ষিক পত্ররূপে আত্মপ্রকাশ। কিছুদিনের মধ্যে তা মাসিক রূপে প্রকাশ পায়। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল যাতে এটি দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়।

'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ

বাঙালা পাক্ষিক-পত্র

১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা। ১ মাঘ। ১৩০৫ সাল

"তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো!" উদ্বোধন "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!"

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত—সম্পাদক

সূচী

প্রচ্ছদের ওপরে আরও লেখা ছিল ঃ

ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক বাঙ্গালা পাক্ষিক পত্র ও সমালোচনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ডাকমাশুল সমেত। কলিকাতা, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কম্বুলেটোলা', নং ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, উদ্বোধন প্রেস হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। উদ্বোধন এর প্রতিসংখ্যার নগদ মূল্য দুই আনা মাত্র।''....

বাংলা গদ্যসাহিত্যে বিবেকানন্দের আবির্ভাব এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই। উদ্বোধনে চার বছরে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্বোধনের প্রধান আকর্ষণ ছিল বিবেকানন্দের রচনাগুলি। ভাষা ও রচনাশৈলির দিকে দিয়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এগুলি যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। দশম বর্ষ থেকে উদ্বোধন মাসিক পত্রিকায় পরিবর্তিত হয়। পত্রিকাটি আজ শতবর্ষ অতিক্রম করেছে।

১৫. **পাণিনি ব্যাকরণ**—সংস্কৃত ভাষায় বিখ্যাত ব্যাকরণ। পাণিনির রচিত ব্যাকরণ আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত বলে অষ্টাধ্যায়ী নামেও পরিচিত। এ যাবৎ পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই অষ্টাধ্যায়ীর মতো সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ ব্যাকরণ রচিত হয়নি। বার্তিক, ভাষ্য, বৃত্তি ও টীকাসমৃদ্ধ পাণিনি ব্যাকরণের পঠন পাঠন ও জনপ্রিয়তা সারাভারতে আজ পর্যন্ত অব্যাহত। ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর কাল খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০। (ভারত কোষ—৪র্থ, পৃ. ৩৫৩)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১. **চণ্ডীদাস** : বাংলাসাহিত্যের চণ্ডীদাস আলোচনা যথেষ্ট বিতর্কিত ব্যাপার। বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি নানা চণ্ডীদাসের পরিচয় মেলে। তবে এই নামে বহু পদকর্তার মধ্যে দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস এ দুজনকে মোটামুটিভাবে চিহ্নিত করা যায়। বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস আর দেবী বাশুলীর সেবক রামী রজকিনীর প্রেমিক আর এক চণ্ডীদাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত। দ্বিজ, বড়ু, দীন ও নিছক চণ্ডীদাস ইত্যাদি নানা ভণিতায় কতজন পদকর্তা যে পদরচনা করেছেন তা এখনও অনির্ণীত।

২. **কৃত্তিবাস** : কৃত্তিবাস ওঝা বাংলা রামায়ণ রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিকদের মতে কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়ণ কতটুকু যে কৃত্তিবাসের তা বলা কঠিন। তবে এই কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতকের কোনো এক সময়ে বর্তমান ছিলেন।

৩. **কাশীরাম দাস** : ইনি সপ্তদশ শতকের কবি। মহাভারত রচয়িতা। ভাগীরথী তীরে

ইন্দ্রাণী পরগনার সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূল মহাভারতের ভাবানুবাদ করেন। অনেকের মতে তিনি বিরাটপর্ব পর্যন্ত লিখেছিলেন, শেষ করেছিলেন তার ভাইপো নন্দরাম। আসলে কাশীরাম দাস নামক কোনো একজন ব্যক্তির লেখা মহাভারতের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, অষ্টাদশ শতকে লেখা বিভিন্ন রচনা মিলেমিশে কাশীরামের নামে এক মহাভারত গড়ে ওঠে। এই মহাভারত প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০২ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে।

৪. **ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০)** : হাওড়ার পেঁড়ো অঞ্চলে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। স্বেচ্ছায় বিবাহ করে ও সম্পত্তির কারণে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে থাকতে হয়। পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজার আদেশে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করে রায়গুণাকর উপাধি পান।

৫ **রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'পদ্মিনী উপাখ্যান'** : রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (৯.১২.১৮২৭—১৩.৫. ১৮৮৭) বর্ধমানের কালনার কাছে বাকুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। রঙ্গলালের শিক্ষাদীক্ষা কলকাতায়। অল্প সময়ের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। পরে ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)। এটি রাজস্থানের ইতিহাস নির্ভর এক বীররসাত্মক কাব্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় রচনা।

৬ **জ্ঞানান্বেষণ** : ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্র জ্ঞানান্বেষণ (সাপ্তাহিক)। প্রকাশকাল ১৮৩১ এর ১৮ জুন। দক্ষিণানন্দন (পরে দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় নামে সম্পাদক হলেও যাবতীয় সম্পাদকীয় কাজ করতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। পরে এটির পরিচালনার ভার নেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী রামগোপাল ঘোষ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৩৯ সাল নাগাদ রামচন্দ্র মিত্রকে পত্রিকাটির পরিচালকের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। রামগোপাল সান্যাল তাঁর 'A General Priography of Bengal Celebrities' গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন। প্রায় দশ বছর চলার পর ১৮৪০ এর নভেম্বর মাসে এটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

৭. **হিন্দু কলেজ** : ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি প্রধানত ইংরেজি শিক্ষার জন্য কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে এটি একটি স্কুল ছিল। এটির দুটি বিভাগ ছিল জুনিয়ার ও সিনিয়ার। প্রথম বিভাগটিকে স্কুল ও দ্বিতীয় বিভাগটিকে কলেজ বলা হত। এর আরো দুটি নাম ছিল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ ও মহাবিদ্যালয়। এই মূল হিন্দু কলেজকে গভর্নমেন্ট কখনও কখনও নেটিভ হিন্দু কলেজ বলতেন। মূলত হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষার জন্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানি টানা সাত বছর কোনোরকম সাহায্য করেননি। তবে ডেভিড হেয়ার ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এড্ওয়ার্ড হাইড ইস্ট এটিকে যথেষ্ট সাহায্য দান করেন। পরে এটি সরকারি অনুমোদন লাভ করে। কার্যত ১৮৫৪ সালে ১৫ জুন থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ (সিনিয়র বিভাগ) ও হিন্দুস্কুল (জুনিয়ার বিভাগ) রূপলাভ করে।

৮. **বিশপস্ কলেজ** : হাওড়ার শিবপুরে এই কলেজটি ছিল। বোটানিক্যাল গার্ডেনের

পাশে ৬২ বিঘার কিছু বেশি জমি নিয়ে এই কলেজটি তৈরি হয়। তৎকালীন কলকাতার বিশপ মিঃ মিডলটনের উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান ছাড়াও অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রেসে ছাপা সব বই এর এক এক খণ্ড দান করেছিলেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই কলেজের কাজ শুরু হয়। খ্রিস্টান ধর্মযাজক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র রূপে এই কলেজটি গড়ে ওঠে। মাত্র কুড়ি জন ছাত্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল। ধর্মান্তরিত মধুসূদন এখানে বছর তিনেক পড়েছিলেন। এই কলেজে তিনি ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্যের যথার্থ স্বাদ পেয়েছিলেন।

৯. **রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস** : মাদ্রাজে ৪৬ টাকা বেতনে মাইকেল 'মাদ্রাস মেইল অ্যাণ্ড ফিমেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম অ্যাণ্ড বয়েজ ফ্রি ডে স্কুল' এ সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেলেন। ছেলেমেয়ে এক সঙ্গেই পড়তো। মাইকেল এখানেই পান রেবেকাকে ছাত্রী হিসেবে। পরিচয়, প্রণয় ও বিয়ে সবই ঘটে যায় ৬ মাস ১৩ দিনের মধ্যেই। ১৮৪৮ সালের ৩১ জুলাই তাদের বিয়ে হয়। মাইকেলের এই বিবাহ সুখের হয়নি। রেবেকার সঙ্গে তার আইনগত বিচ্ছেদ না ঘটলেও মধুসূদন আর মাদ্রাজ ফিরে যাননি। মাইকেল ও রেবেকার প্রথম কন্যা সন্তান ব্যর্থা ব্লানশ কেনেট (জন্ম ১৮ আগস্ট ১৮৪৯), দ্বিতীয়া কন্যা ফিবি কেনেট (জন্ম মার্চ, ১৮৫১), তৃতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র (জন্ম ১৮৫৩, ২৬ জুলাই) নাম-জর্জ জন ম্যাকটাভিস ডাট, চতুর্থ সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র মাইকেল জেমসের (জন্ম ১৮৫৫ সালের ৯ মার্চ)।

১৮৫৬ সালের ২৮ জানুয়ারি সোমবার সাড়ে ছ বছরের বড়ো মেয়ে ব্যর্থা, চার বছর দশমাসের ছোটো মেয়ে ফিবি, সাড়ে তিন বছরের বড়ো ছেলে জর্জ আর দশমাসের ছোটো ছেলে মাইকেলকে ছেড়ে চিরদিনের মতো কবি মাদ্রাজ ছেড়ে চলে এলেন— কারও সামনে জীবনে আর দাঁড়াতে পারেননি। তবে দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু হয় ১৮৫৬ এর ২১ এপ্রিল। মৃত্যু সংবাদ পেয়েও কবি সেখানে যাননি। মাইকেল মাদ্রাজ ত্যাগের সাড়ে ৩৬ বছর পর অর্থাৎ ১৮৯২ সালের ২২ জুলাই রেবেকা যখন ক্ষয় রোগে মারা যান, তখনও চার্চের খাতায় তাঁর নাম লেখা হয়েছে রেবেকা টমসন ডাট। তিনি বিবাহবন্ধন ত্যাগ করেননি। মাইকেল যাতে আর বিবাহ করতে না পারেন রেবেকা সে জন্য বিবাহ বিচ্ছেদে রাজি হননি। আর কুড়ি বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন তাঁর স্বামী মধুসূদন দত্ত।

১০. **ক্যাপটিভ লেডি** : মধুসূদনের লেখা কাব্য (১৮৪৯)। নভেম্বর মাসের গোড়ায় লেখা শুরু করে ২৫ তারিখে লেখা শেষ করেন। এ কাব্যের পুরো নাম "The Captive Ladie (an Indian tale) in two Cantos." এ ছাড়া কাব্যের শেষে তিনি জুড়ে দিয়েছেন Visions of the past-A fragment. বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, 'এটি লেখা হয়েছে জীবনের নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে অভাব অনটনের মধ্যে লড়াই করে'। এবং এই বইটি তিনি নিজের পয়সায় ছেপেছিলেন।

১১. **স্পেকটেটর** : আসল নাম 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' মাসিক পত্রিকা। প্রকাশকাল- এপ্রিল ১৮৪২। স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সহায়তায় ইংরেজি বাংলা দ্বিভাষিক পত্র প্রকাশ করেন। এটি প্রথমে মাসিক পত্ররূপে প্রচারিত হয়েছিল।

পাঁচ মাস মাসিক রূপে চলে সেপ্টেম্বর মাস থেকে পাক্ষিক রূপে প্রকাশিত হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৪৩ এর মার্চ মাস থেকে সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ এর ২০ নভেম্বর এর প্রচার রহিত হয়।

১২. হেনরিয়েটা ঃ মাইকেলের প্রথম সন্তান জন্ম দেবার পর রেবেকার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি শিশুকন্যাকে নিয়ে নাগপুরে বেড়াতে যান। এ সময় মাইকেলের এক সহকর্মীর মেয়ে হেনরিয়েটারের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। সহকর্মীর নাম ছিল জর্জ জাইলাস হোয়াইট—তিনটি কন্যা সন্তানের জনক। বড়ো মেয়ে হেনরিয়েটা (জন্ম ১৮৩৬ সালের ১৯ মার্চ), ছোটো দুটি ছেলে—উইলিয়াম জন টমাস হোয়াইট (জন্ম ১৮৩৯, ৩১ জুলাই), এড়ুইন আর্থার হোয়াইট (১৮৩৯, ১০ এপ্রিল)। এই তিনটি সন্তানের মা ৪০ বছর বয়সে মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুর পর জর্জ হোয়াইট তার মেয়ে হেনরিয়েটার চেয়ে কম বয়সী একটি কিশোরীকে বিয়ে করেন ও তাদের সংসারে তিক্ততা দেখা দেয়। তবে রেবেকার সঙ্গে দাম্পত্যজীবন ও কিশোরী হেনরিয়েটার সঙ্গে প্রেম এই দ্বৈত জীবন কবি কাটিয়েছিলেন। এদিকে হেনরিয়েটার পিতা ছিলেন সাহিত্যের শিক্ষক এবং হেনরিয়েটাও বাংলা শিখে মাইকেলের সাহিত্যসঙ্গিনী হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিলেন। তবে রেবেকার কাছে এ ব্যাপারটা চাপা থাকল না। প্রায় ছ বছর প্রণয়লীলা চলার পর মাইকেলের সঙ্গে মিলন হয়।

১৮৫৮ এর শেষের দিকে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের পরে হেনরিয়েটা কলকাতা চলে আসেন। মধুসূদনের সঙ্গে তিনি এসে বাস করতে থাকেন। ইতোমধ্যে ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে তাদের কন্যা সন্তান শর্মিষ্ঠার জন্ম হয়। কবি নাম রাখেন হেনরিয়েটা অ্যালাইজা শর্মিষ্ঠা। অ্যালাইজা হেনরিয়েটার মায়ের নাম। আর মেয়ের জন্মের বারোদিন আগে শর্মিষ্ঠা নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত কবি নাটকের নামের সঙ্গে সদ্যোজাতার নামটিও জুড়ে দিলেন। এরপব কবির দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। পরে কবি লন্ডন যাত্রা করেন। কথামতো সংসার চালানোর মতো টাকা পেলেন না হেনরিয়েটা। পৈতৃক সম্পত্তি যিনি নিয়েছিলেন সেই মহাদেব চট্টোপাধ্যায় ঠিকমতো টাকা দিলেন না। তাই নিরুপায় হেনরিয়েটা দুই শিশু পুত্র নিয়ে বেঙ্গল জাহাজে চড়ে ১৮৬৩ সালের ২৩ মার্চ বিলেত যাত্রা করেন। দ্বিতীয় পুত্রটির নাম ফ্রেডারিক মেঘনাদ। এখন শর্মিষ্ঠা পাঁচবছরের ও ফ্রেডারিকের বয়স প্রায় তিন বছর। পরে হেনরিয়েটা ১৮৬৪ তে একটি মৃত সন্তানের জন্ম দেন বা জন্ম নিয়েই শিশুটি মারা গিয়েছিল। চতুর্থ বারে হেনরিয়েটা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। তার নাম অ্যালবার্ট নেপোলিয়ান।

১৮৭৩ এর মে মাসের ৭ তারিখে মাত্র ১৩ বছর ৭মাস ২২ দিনে কবির কিশোরী কন্যা শর্মিষ্ঠার বিয়ে হোল তার দ্বিগুণ বয়সী ছবি আঁকিয়ে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলের সঙ্গে। জামাতার নাম উইলিয়াম ওয়াল্টার এভান্স ফ্লয়েড। এর মধ্যে ১৮৭৩ এর ২৬ জুন মাত্র ৩৭ বছর ৩ মাস ১৭ দিনে মা হেনরিয়েটা বিদায় নিলেন। আর তিনদিন পরেই অর্থাৎ ২৯ জুন কবি চিরতরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

শর্মিষ্ঠার বিয়ে হবার ঠিক ২ বছর ৪ মাস ১২ দিন পরে তিনি তাঁর স্বামীকে হারান।

এই বছর অর্থাৎ ১৮৭৫ এর এগারোই জুন মারা যান শর্মিষ্ঠার ছোট ভাই ফ্রেডারিক মিল্টন। মাত্র ১৩ বছর ১০ মাসে তিনি মারা যান। বিয়ের সময় থেকে অর্থাৎ দু'বছর ৪ মাসের মাঝেই তিনি পিতা, মাতা, স্বামী ও ভাইয়ের মৃত্যু দেখলেন।

বিধবা হবার একবছর চার মাস পরে ১৮৭৭ সালের ১৩ জানুয়ারি ১৮ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হোল উইলিয়াম বেঞ্জামিন নিসের সঙ্গে। উইলিয়াম নিস ছিলেন বিপত্নীক। বয়স ৫২ বছর। আর মাইকেল বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হোত ৫৩ বছর। নিসের সঙ্গে বিয়ের ১ বছর ১ মাস পরে অর্থাৎ ১৮৭৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর একটি ছেলে হয়—নাম রাখা হয় উইলিয়াম ব্রাইটম্যান স্যামুয়েল নিস। পরের বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি শর্মিষ্ঠার দ্বিতীয় সন্তান জন্মায়—নাম রাখা হয় মায়ের মতো হেনরিয়েটা অ্যালাইজা শর্মিষ্ঠা নিস।—এই বছরই এই কন্যার মৃত্যু হয়। আর কন্যা সন্তানটির মৃত্যুর মাত্র চারদিন পরেই মারা যান শর্মিষ্ঠা স্বয়ং। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১৯ বছর পাঁচ মাস। ১৯ বছর পাঁচমাসের জীবনে তাঁর জীবনে ঘটে দু'বার বিবাহ ও দু'বার গর্ভধারণ। মাইকেল আত্মজার এই পরিণতি আমাদের মনকে বড় নাড়া দেয়।

১৩. **রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ (১৮২৭-২৯.৭.১৮৬৬)** : পিতা ছিলেন কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ। দত্তক পুত্র হিসেবে কলকাতা পাইকপাড়ার সিংহ রাজপরিবারে গৃহীত হন। বাংলার নাট্য আন্দোলনে তিনি ও তাঁর অনুজ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা-এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৩১.৭.১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখিত 'রত্নাবলী' নাটক দিয়ে এই নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। রাজ ভ্রাতাদ্বয় ঠিক করেছিলেন, এই নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে সহ ইংরেজ কর্মকর্তা ও অবাঙালি দর্শকদের নিমন্ত্রণ করে দেখাবেন। গৌরদাসের সঙ্গে আলোচনা করে মধুসূদনকে তাঁরা এই নাটকটি অনুবাদ করার দায়িত্ব দেন। এই নাটকটি অনুবাদ করে মাইকেল একসঙ্গে পাঁচশো টাকা পেয়েছিলেন। তাঁর চাকরি জীবনে একসঙ্গে এতো টাকা তিনি কখনো পাননি। এ ব্যাপারে তিনি রাজাদের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে যখন শর্মিষ্ঠা প্রকাশ করলেন তখন তা উৎসর্গ করলেন রাজভ্রাতাদের নামে। এছাড়া তাঁরা 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' মাইকেলের এই প্রহসন দুটি ছাপানোর খরচ বহন করেছিলেন।

১৪. **ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ** : পাইকপাড়ার ছোট রাজা। তিনিও 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত। লোয়ার চিৎপুর রোডে থাকা ও মাদ্রাজ থেকে হেনরিয়েটা আসার পর মাইকেলের খরচ বেড়ে গিয়ে ঋণ হয়ে যায়। মধুসূদনের এই আর্থিক অনটনের কথা রাজাদের দেওয়ান গৌরদাসের অন্যতম বন্ধু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় জমিদারদের কানে তুলে দেন। অমনি ছোটো রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তার বেশির ভাগ ঋণ শোধ করে দিলেন। ইংরেজিতে অনূদিত শর্মিষ্ঠা ছাপানোর জন্য রাজারা টাকাও ধার দিয়েছিলেন। তবে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার শেষ পর্যায়ে কবির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মারা যান ১৮৬১-র ২৯ মার্চ।

১৫ **যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৬.৫.১৮৩১—১০.১.১৯০৮)** : মহারাজা বাহাদুর পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনের নাটক রচনা ও অনুবাদের যথেষ্ট গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি শর্মিষ্ঠার অনুবাদ দেখে খুবই প্রশংসা করেছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশের পর ১৮৬১-র ১২ ফেব্রুয়ারি কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা কবিকে যে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন তাতে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় প্রমুখ অনেকেই। তাঁর অনুরোধে কবি 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করলে তিনি নিজব্যয়ে তা মুদ্রিত করেন।

১৬. **কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-২৮.১৮৭০)**। জোড়াসাঁকো নিবাসী শক্তিরায় সিংহের প্রপৌত্র ও নন্দলাল সিংহের পুত্র। তেরো বছর বয়সে বিদ্যোৎসাহিনী সভার (১৮৫৩) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই উদ্যোগে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে বেণীসংহার (১৮৫৬), বিক্রমোর্বশী (১৮৫৭) প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। ইনি ছদ্মনামে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' লিখে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। পণ্ডিতবর্গের সহায়তায় সংস্কৃত মহাভারতের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ (১৮৬০-৬৬) তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

১৭. **শর্মিষ্ঠা** : মধুসূদনের লেখা নাটক। প্রকাশকাল ১৫ পৌষ ১২৬৫। নামপত্রে কালিদাসের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এই রাজভ্রাতাদ্বয়কে উৎসর্গীকৃত।

১৮. **একেই কি বলে সভ্যতা?** : মাইকেল রচিত প্রহসন। প্রকাশকাল ১৮৬০। প্রহসনটিতে নব্যবঙ্গীয়দের সুরাপান ও ইংরেজ অনুকরণের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

১৯. **বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ** : মাইকেল রচিত প্রহসন। প্রকাশকাল ১৮৫৯। এক লম্পট জমিদারের আচার-আচরণ, দরিদ্র প্রজাদের উচিত শিক্ষা এই প্রহসনের বিষয়।

২০. **পদ্মাবতী** : ১৮৬০ এর মে মাসের গোড়ায় পদ্মাবতী প্রকাশিত হয়।

২১. **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য** : মাইকেল মধুসূদনের চারটি সর্গে রচিত কাব্য। প্রকাশকাল ১৮৬০। নামপত্রে ভবভূতির শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। সৌন্দর্যপ্রতিমা তিলোত্তমাকে নিয়ে সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্ব এই কাব্যের মূল বিষয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপক প্রয়োগ এই কাব্যেই প্রথম।

২২ **কৃষ্ণকুমারী** : মধুসূদনের ইংরেজি আদর্শে রচিত প্রথম বাংলা নাটক (১৮৬৯)। টডের রাজস্থান কাহিনি থেকে পটভূমি গৃহীত।

২৩. **ব্রজাঙ্গনা** : প্রকাশকাল জুলাই ১৮৬১। রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গীতিধর্মীকাব্য।

২৪. **বীরাঙ্গনা** : মাইকেল রচিত পত্রকাব্য। প্রকাশকাল (১৮৬২)। রোমান কবি ওভিদের 'হিরোইদাইদ্‌স' কাব্যের অনুসরণে রচিত। এতে মোট ১১টি পত্র আছে।

২৫. **বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৩-১৯০৯)** ঃ ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় বিডন স্ট্রিটের খোলা মাঠে বেঙ্গল থিয়েটার বা বঙ্গরঙ্গভূমি নামে বাংলার তৃতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাটির দেওয়াল ও সুবৃহৎ খোলার চাল বিশিষ্ট এই ভবনের মধ্যেই দর্শকের বসার স্থান ও মঞ্চ দুইই তৈরি হোল। এটিই হোল স্থায়ীভাবে নির্মিত প্রথম সাধারণ নাট্যশালা। তখনকার বহু বিশিষ্ট মানুষ এই থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

২৬. **মায়াকানন (১৮৭৪)** ঃ মধুসূদন এই নাটকটি লিখে শেষ করলেও মুদ্রিত দেখে যেতে পারেননি। সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন 'মায়াকাননে অনন্ত প্রেমের অনন্ত বিরহই ব্যাকুলভাবে কেঁদে চলেছে। অজয় ও ইন্দুমতী যেন মানস সরোবরের দুই তীরবর্তী দুই চক্রবাক-চক্রবাকী, সতৃষ্ণনয়নে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু মিলনের পথে দুস্তর বাধা।.....জীবনে তাদের যে মিলন বাসর রচিত হয়নি, মৃত্যুর তুহিনশীতল কোলে সেই বাসর রচিত হোল।" (ভূমিকা অংশ-মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১. **রবিনসন ক্রুশো** : ইংরেজ সাহিত্যিক ড্যানিয়েল ডিফোর (১৬৫৯-১৭৩১) বিখ্যাত সৃষ্টি রবিনসন ক্রুশো (১৭১৯)। এটিকে নির্ভেজাল উপন্যাস বলা যায় কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। যে ক্রুশো পরিত্যক্ত নির্জন দ্বীপে একদিন নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃসহ বেদনায় কাতর হয়ে উঠেছিল, সেই ক্রুশোই পরবর্তীকালে সেই দ্বীপের একছত্র অধিপতি বা শাসক হয়েছিল। সেই দ্বীপেরই আদিম অধিবাসী ফ্রাইডে, জুরী প্রভৃতিকে নিজের ভৃত্য তৈরি করেছিলেন। মানব সমাজ বহু যুগ আগে থেকেই প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমাজ গড়ে তোলাই হোল যেন সভ্য মানুষের আদর্শ—এটিই বইটির বিষয়।

২ **শিবনাথ শাস্ত্রী (৩১.১. ১৮৪৭—৩০.৯.১৯১৯)** : ব্রাহ্মসমাজের নেতা, বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক, চিন্তাশীল লেখক ও শিশুসাহিত্যিক। পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য। পিতৃভূমি ২৪ পরগনার মজিলপুরে। জন্ম চাংড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করে শাস্ত্রী উপাধি পান। ১৮৬১ এর আগস্ট মাসে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন ও ১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতান্তরের ফলে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮) 'পুষ্পমালা' (১৮৭৫), 'হিমাদ্রিকুসুম' (১৮৮৭) 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৮৮) এবং 'ছায়াময়ী পরিণয়' (১৮৮৯) এই কয়টি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও চারটি উপন্যাস লিখেছিলেন—'মেজবউ' (১৮৮০) 'যুগান্তর' (১৮৯৫), 'নয়নতারা' (১৮৯৯), 'বিধবার ছেলে' (১৯১৬)। তাঁর 'আত্মচরিত' (১৯১৮) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৪) ছাড়াও ছোটদের জন্য তিনি বহু রচনা লিখে গেছেন।

৩ **প্যারাডাইস লস্ট** : সপ্তদশ শতকের বিশিষ্ট ইংরেজ কবি মিল্টন (১৬০৮—১৬৭৪)। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর লন্ডন শহরের এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মেছিলেন। প্যারাডাইস লস্ট (১৬৬৭) তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি। এটি একটি রোমান্টিক এপিক। তাঁর মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হোল আদম ও ইভের ঘটনা-যারা জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল খেয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। গ্রিক ও রোম মহাকাব্যের চিরাচরিত কাহিনি বর্জন করে কেন্দ্রে এনেছেন ঈশ্বর ও শয়তানের বিবাদের কাহিনি। তবে শয়তান চরিত্রে মানবায়ন ঘটেছে।

৪. **মেকলের হেস্টিংস** : প্রকৃত বইটির নাম হল: "Macaulay's essays on Warren Hastings with introduction and notes by H.M. Buller, London, Macmillan, 1907. মেকলের পুরো নাম ছিল Thomas Bebington Macaulay.

৫. **মেকলে-ক্লাইবের জীবনী লেখক :** বইটির প্রকৃত নাম Macaulay's Essay on Clive. London, Longman, green, 1903

৬. **বার্কের প্রবন্ধাবলি** : এডমন্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭) সেযুগের বিখ্যাত প্রাবন্ধিক। তিনি পার্লামেন্টে হুইগ দলের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত দুটি বক্তৃতা হল 'অন আমেরিকান ট্যাক্সেশন' এবং 'অন কনসিলিয়েশন উইথ আমেরিকা'। আবার তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস এর অন্যায় কাজকে সমর্থন করেননি। তাঁর বক্তৃতা 'ইমপিচমেন্ট অব্ ওয়ারেন হেস্টিংস,' (১৭৮৮) সংসদে তীব্র ঝড় তুলেছিল। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে বক্তৃতার ঢং পরিস্ফুট। তিনি ছিলেন সুবক্তা, যুক্তিবাদী ও উদারপন্থী। তাঁর বক্তৃতা ছিল বুদ্ধিও শাণিত যুক্তির ক্ষুরধারে প্রতিফলিত।অবশ্য তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধগুলি ছিল অন্য জাতের।

৭. **রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৫.২.১৮২৪-২৬.৭.১৮৯১)** : উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারততত্ত্ববিদ্, চিন্তাশীল ও বহুদর্শী ব্যক্তিত্ব। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বহু গ্রন্থের লেখক। বাংলা রচনার মধ্যে 'প্রাকৃত ভূগোল' (১৮৫৪), 'শিল্পিক দর্শন' (১৮৬০), 'শিবাজীর চরিত্র' (১৮৬০) মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১) প্রভৃতি প্রধান ও ইংরেজিতে Indo Aryans (১৮৮১), The Antiquities of Orissa (১৮৭৬, ১৮৮০) বিখ্যাত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক ছিলেন ও 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একটি মাসিক পত্র সম্পাদনা করতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অব ল' সম্মানে ভূষিত করেন।

৮. **এশিয়াটিক সোসাইটি** : ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এর স্থাপয়িতা পাশ্চাত্যবিদ্যাসহ সংস্কৃতে, আরবি ও ফরাসিতে সুপণ্ডিত, তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম জোন্স। এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়। 'এশিয়া খণ্ডের 'মানুষ ও প্রকৃতি সংক্রান্ত' যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্পকলা সাহিত্য ও বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ও গবেষণা', ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে সাধারণের নিকট 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' নামে পরিচিত হয় ও পরে এর নামের আগে রয়্যাল কথাটি যুক্ত হয়। সোসাইটির বিপুল পুস্তক ও পুথি সংগ্রহ আছে, আছে পুরাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান বিভাগের নানা নিদর্শ (Exhibit)। ভারতের প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি, চিত্র, অনুশাসন, বিভিন্ন অক্ষরের খোদিত লিপি, মুদ্রার উপর রাজরাজড়ার পরিচয় কাহিনি প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ। প্রতিষ্ঠানটির মুখপত্র 'জার্নাল অব্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

৯. **স্যাডলার কমিশন** : লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হবার দশ বছর যেতে না যেতেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পরিচালনার দিক থেকে বেশ কিছু উন্নতি দেখা দিলেও শিক্ষাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার সাফল্যজনক প্রচেষ্টা তখনও শুরু হয়নি। তাই ভারত

সরকার লিড্‌স (Leeds) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাইকেল স্যাড্‌লারকে সভাপতি করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করেন। মাইকেল স্যাড্‌লারের (Sir Michael Sadler) নেতৃত্বে কমিশনটি গঠিত হওয়ায় এটি স্যাডলার কমিশন (Sadler Conmission) নামে সমধিক পরিচিত। কমিশনের অন্য সদস্যরা ছিলেন-স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ড. গ্রেগরি, স্যার ফিলিপ হার্টগ, অধ্যাপক রামজ্যে প্রমুখ শিক্ষাবিদ। অনেকের মতে কমিশন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

১০. **সম্রাট এডওয়ার্ড, ৭ম (১৮৪১-১৯১০)** : মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইংল্যান্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাট ছিলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ইনি সিংহাসন লাভ করেন।

১১. **লর্ড কার্জন** : ১৮৯৯-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। প্রশাসনিক দক্ষতা ও সংস্কারমূলক কাজের জন্য লর্ড কার্জনের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি নানা বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাঁর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক কীর্তি সংরক্ষণ ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার কল্পে তিনি বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন। কলকাতায় ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ তারই শাসনকালে নির্মিত হয়।

তবে প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে কার্জন বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে তার পূর্বাংশ আসামের সঙ্গে ও পশ্চিমাংশ বিহার ওড়িশার সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রবল জনমতের চাপে কার্জন তা প্রথমে কার্যকর করতে পারেননি। তবে বাংলার রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাসের উদ্দেশ্যে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়। কোনো বিশেষ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার তাঁর কাজ সমর্থন না করায় তিনি পদত্যাগ করে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে ফিরে যান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. **মিসেস বেসান্ত** : শিকাগোতে প্রদত্ত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতে থিয়োজফিস্ট আন্দোলনের প্রধান নেত্রী ছিলেন অ্যানি বেসান্ত। তিনি শিকাগোতে বিবেকানন্দের ভাষণের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। স্বামীজির 'কর্মবাদ' প্রসঙ্গটি তিনি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। তাঁর 'কর্ম' শীর্ষক পুস্তিকায় তিনি কর্মবাদ নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। মাদ্রাজে ভিক্টোরিয়া হল ও কলকাতায় স্টার থিয়েটার হলে (১১ মার্চ ১৮৯৮) ও অন্যত্র স্বামীজি অ্যানি বেসান্ত ও তাঁর কার্যকলাপের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

২. **রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ভারতী, সাধনা ও বঙ্গদর্শন প্রকাশ** : ভারতী ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে 'ভারতী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ একাদিক্রমে (১২৮৪-১২৯০) সাত বছর, স্বর্ণকুমারী দেবী (১২৯১—১৩০১) এগারো বছর, হিরন্ময়ীদেবী ও সরলা দেবী (১৩০২-১৩০৪) তিনবছর ও রবীন্দ্রনাথ (১৩০৫)

মাত্র এক বছর ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদনা ত্যাগ করলেও ভারতীর সঙ্গে তাঁর যোগ নিবিড় ছিল।

সাধনা ঃ অগ্রহায়ণ ১২৯৮ তে সাধনার আত্মপ্রকাশ। প্রথম সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ২২ বৎসর বয়সে সাধনা প্রকাশ করেন। তিনি তিন বছর অর্থাৎ কার্তিক ১৩০১ পর্যন্ত সাধনা সম্পাদনা করেন। ১৩০১ এর অগ্রহায়ণ থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ সাধনার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন।

বঙ্গদর্শন ঃ নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর ভার রবীন্দ্রনাথ নিলেন ১৩০৮ (ইংরেজি ১৯০১) থেকে। এই বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৩০৮-০৯) উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৩১২ তে কবি একসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভাণ্ডার' পত্রিকা সম্পাদনা করলেন। ১৩১৩ তে তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা ত্যাগ করেছিলেন।

১৩১৮ এর বৈশাখ থেকে কবি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' ভার নিয়েছিলেন। ১৩২২ পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১. **বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ঃ** সুরেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথা মূলক 'A Nation in making' গ্রন্থে বলেছেন "Pundit Iswar Chunder Vidyasagar offered me an appointment as Professor of English in the Metropolitan Institution, which I accepted. My speech already made me popular with the students and helped me, I think to get the appointment. The salary was small Rs. 200 a month...." পরে তিনি লিখেছেন I left the Metropolitan Institution in march 1880. কিন্তু বিদ্যাসাগর কলেজের 'শতবর্ষ স্মরণিকা (অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত) তে দেখা যাচ্ছে তিনি ঐ কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন ১৮৭৬ থেকে ১৮৮১ পর্যন্ত।

(S.N. Banerjee—A Nation in making....O.U.P. 1925 p. 32-33.)

২. **ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন :** সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান-অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভার প্রতিষ্ঠা হোল অ্যালবার্ট হলে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই তারিখে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই ভারত সভাই নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৮৮৩ সালে প্রথমবার ন্যাশনাল কনফারেন্স বা জাতীয় মহাসভার আয়োজন করেছিল অ্যালবার্ট হলেই।

৩. **একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ও সভায় যোগদান ঃ** 'A Nation in Making' গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন, "I attended the inaugural meeting of the Indian Association under the shadow of a great domestic bereavement. At Eleven o clock on the morning of July 26, My son died. I had some idea that the Meeting would not pass off quietly and that there would be opposition offered to the establishment of the Association. I Made up my mind, despite my personal sorrow and with the full concurrence

of my wife, that I should attend the inaugural meeting." ibid. p. 38-39

৪. **স্যার, হেনরি হ্যারিসন (১৮৩৭-১৮৯২)।** আসল নাম স্যার হেনরি লেল্যান্ড হ্যারিসন। অক্সফোর্ডে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে বাংলা সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। পরে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের জুনিয়ার সেক্রেটারি (১৮৬৭), বোর্ড অফ রেভেনিউর সেক্রেটারি (১৮৭৮), ১৮৮১-৯০ এর মধ্যে কমিশনার অব্ পুলিশ ও কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

হাওড়া ব্রিজের পূর্ব প্রান্ত থেকে শুরু করে শিয়ালদহ পর্যন্ত রাস্তাটির পূর্ব নাম ছিল সেন্ট্রাল রোড। ১৮৮০-তে এই রাস্তাটির নির্মাণ কার্য শুরু হয় এবং ১৮৯১-৯২ এর মধ্যে রাস্তাটির নির্মাণ কার্য শেষ হলে এটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই বছরই পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান হ্যারিসনের নামানুসারে রাস্তাটির নামকরণ করা হয় হ্যারিসন রোড। বর্তমানে এটির নাম মহাত্মা গান্ধী রোড।

৫. **'বেঙ্গলি' পত্রিকা** : ১৮৭৯ এর ১ জানুয়ারি থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে 'বেঙ্গলি'। এই সময় থেকে 'বেঙ্গলি' পুরোদস্তুর রাজনৈতিক পত্রিকা হয়ে ওঠে। ১৮৮৩ র ২ এপ্রিল 'বেঙ্গলি'তে প্রকাশিত একটি লেখায় বিচারপতি নরিসকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করা হয়। এজন্য আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে তাঁকে দু'মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এর পর থেকে সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলি'র দিনের পর দিন জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ১৯০০ পর্যন্ত সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ১৯১৯ এর জানুয়ারি পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক। পরে 'বেঙ্গলি'র সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯৩১ পর্যন্ত 'বেঙ্গলি'র অস্তিত্ব বজায় থাকে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১.২. **জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউসন : স্কটিশ চার্চেস কলেজ** : ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি সাধারণ শিক্ষার বাহন রূপে ধার্য হলে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন একটি প্রথম শ্রেণির শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯০৮ এর ১ জুন থেকে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন ও ডাফ কলেজ একত্র হয়ে 'স্কটিশ চার্চেস কলেজ' নামকরণ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বাল্যে এই প্রতিষ্ঠানে এফ. এ. পড়েন।

৩. **অমরকোষ :** অমরকোষ বা অমরার্থচন্দ্রিকা বা নামলিঙ্গানুশাসন সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রাচীন অভিধান। গ্রন্থকার অমরসিংহ উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন তাই গ্রন্থারম্ভে বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রচলিত টীকার মধ্যে ক্ষীরস্বামীর টীকাই সর্বপ্রাচীন। স্বর্গবর্গ, কালবর্গ, ব্যোমবর্গ, পাতালবর্গ প্রভৃতি নানা বর্গে বইটি সজ্জিত। এটি খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীর রচনা।

৪ **রমেশচন্দ্র দত্ত (১৩.৮.১৮৪৮—৩০.১১.১৯০৯) :** বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক। কলকাতায় রামবাগান অঞ্চলে জন্ম। তিনি ইংরেজিতে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করেন। তিনি 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৭৯) এই চারটি উপন্যাস রচনা করেন। 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) দুটি সামাজিক কাহিনিও তাঁর রচনা। তিনি বাংলায় ঋগ্‌বেদ অনুবাদ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন।

৫. **নবীনচন্দ্র সেন : (১০.২.১৮৪৭—২৩.১.১৯০৯) :** উনিশ শতকের জনপ্রিয় কবি। 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১) কবিতা সংকলন তাঁর প্রথম রচনা। 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) তাঁকে কবিখ্যাতি এনে দেয়। 'রৈবতক' (১৮৮৭) 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস' (১৮৯৬)-এই ত্রয়ী কাব্য তাঁর প্রতিভার সর্বোত্তম নিদর্শন। আরও কয়েকটি কাব্যছাড়াও তিনি 'ভানুমতী' (১৯০০) নামে একটি উপন্যাসও রচনা করেন। ৫টি খণ্ডে রচিত 'আমার জীবন' বেশ সুখপাঠ্য রচনা।

৬ **নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'** নাটকের অনুবাদ প্রসঙ্গে পাদ্‌রি লঙ-এর কথা এসেছে। অনেকে মনে করেন এটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মূল গ্রন্থকারের মতো অনুবাদকের নামও অপ্রকাশিত ছিল। এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন পাদরি লঙ। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'ইনি যদি অনুবাদক নাও হন, অনুবাদকার্য ইহারই তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল বলিয়া মনে করি।"

বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—৩য় ১ম আনন্দ সংস্করণ ১৪০১ পৃ. ১২৫

৭ **A few thoughts on Education** (1904) P. 343+XX

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজিতে লেখা শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ। শিক্ষার্থীদের জীবনের তিনটি পর্বে-বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে কিভাবে তারা দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করবে—তারই সুপরামর্শ এই গ্রন্থে বিবৃত আছে।

৮. **জ্ঞান ও কর্ম :** বইটির প্রথম প্রকাশ ১৭ পৌষ, ১৩১৬। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনাথনাথ বসুর সম্পাদনায় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

বইটি দুটি ভাগে বিভক্ত ঃ প্রথম ভাগে সাতটি অধ্যায়ে জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা দ্বিতীয় ভাগে সাতটি অধ্যায়ে কর্ম সম্বন্ধীয় দীর্ঘ আলোচনা।

উপর্যুক্ত বই দুটিতে গুরুদাসের প্রজ্ঞার পরিচয় বিধৃত।

অরবিন্দ ঘোষ

১. **রাজনারায়ণ বসু (৭.৯.১৮২৬-১৮.৯.১৮৯৯) :** চব্বিশ-পরগনার বোড়াল গ্রামে জন্ম। হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজে শিক্ষা। বৃত্তিতে ছিলেন শিক্ষক। উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদক রূপে তত্ত্ববোধিনী সভায় ১৮৪৬-৪৯ কাজ করেন। ১৮৪৯ এ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষক ও ১৮৫১ তে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ তে সরকারি কাজ থেকে অবসর নেন। অন্যত্র পদোন্নতির বিস্তর সম্ভাবনা

সত্ত্বেও প্রিয় মেদিনীপুর শহর ত্যাগ করেননি। 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'আত্মচরিত' (১৯০৯), 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩) ও 'সেকাল ও একাল' (১৮৭৪) প্রভৃতি তাঁর স্মরণীয় রচনা।

২ **অরবিন্দের দুই অগ্রজ ঃ** বিনয়ভূষণ ঘোষ ও মনোমোহন ঘোষ।

৩. **বন্দেমাতরম্ কাগজ** : ৬.৮.১৯০৬ তারিখে ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাটি প্রকাশিত হলে প্রথম সম্পাদক হন বিপিন চন্দ্র পাল। এরপর সম্পাদক হন শ্রীঅরবিন্দ। সুবোধচন্দ্র মল্লিক, হরিদাস হালদার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাগজটির শিরোনামায় লেখা হোত-'India for Indians'। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় কাগজ ছেড়ে দিলেও রাজদ্রোহিতার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলে বিপিনচন্দ্র পাল পুনর্বার সম্পাদক হন।

৪. **কর্মযোগিন্ (Karmayogin) ঃ** ঋষি অরবিন্দের সম্পাদনায় 'কর্মযোগিন' প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন 'কর্মযোগিন' পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ইংরেজি সাপ্তাহিক। এটিও বেশ জনসমাদর লাভ করে। কর্মযোগিনের Motto গীতার নিষ্কাম ধর্মের আদর্শ—'যোগকর্ম সুকৌশলম্'। 'কর্মযোগিন'-এ অরবিন্দ যে সব প্রবন্ধ লেখেন তাতে ভারতের জাতীয়তা লক্ষ্য ও আদর্শের কথা ছিল।

অরবিন্দ কলকাতা ত্যাগ করার পর গোপনে নিবেদিতার কাছে বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে তাঁর অনুপস্থিতির সময় 'কর্মযোগিন' পত্রিকার ভার নিতে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা কয়েকটি সংখ্যা চালান। কলকাতা ত্যাগের পর অরবিন্দ এই পত্রিকায় আর কোনো রচনা লেখেননি। কর্মযোগিন-এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯১০ এর ২ এপ্রিল।

৫ **'আর্য্য' পত্রিকা প্রকাশ ঃ** ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দের সঙ্গে শ্রীমা বা মাদাম মীরা (মিরা) রিশার ও তাঁর স্বামী মসিয়ে পল রিশারের আলাপ হয়। প্রথম আলাপে এঁরা খুবই মুগ্ধ হন। ১৯১৪ তে এই দম্পতি কিছুকাল পণ্ডিচেরিতে বাস করেন। এ সময় তাঁরা অরবিন্দকে একটি দার্শনিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব দেন। পত্রিকার ব্যয়ভার গ্রহণেও রাজি হন। ব্যাপারটা ঠিক হয় ১৯১৪ এর ১ জুন ও পত্রিকাটির প্রকাশ ঘটল ঠিক আড়াই মাস পর অর্থাৎ ১৫ আগস্ট তারিখে, অরবিন্দের জন্মদিনে। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের নামের স্থানে ছিল অরবিন্দ, পল রিশার ও মীরা রিশার। শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine, The Essays on the Gita প্রভৃতি গ্রন্থের প্রবন্ধ রূপ ঐ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছ বছর পত্রিকাটি নিয়মিত ভাবে চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

৬ **শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যিক শক্তি ঃ** শ্রীঅরবিন্দের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৮। এর মধ্যে ইংরেজি ৩২টি ও বাংলা ছোটবড় রচনা মিলে ১০টি। এছাড়াও Speeches of Aurobindo এবং 'অরবিন্দের পত্র' নামে দুটি বইও আছে। কয়েকটি ইংরেজি বই হোল—The Life Divine, The synthesis of yoga, Sri Aurobindo on Himself and on Mother, The Foundations of Indian culture, The Upanishads,

The Secret of the Veda, Savitri,.Mother India, Age of kalidasa, A system of National Education, The Renaissance of India প্রভৃতি।

আর বাংলা বইগুলি হোল ঃ

১. দুর্গা স্তোত্র

২. কাহিনী : স্বপ্ন, ক্ষমার আদর্শ

৩. বেদ : বেদরহস্য, তপোদেব অগ্নি, ঋগ্বেদ

৪. উপনিষদ : উপনিষদ, উপনিষদে পূর্ণযোগ, ঈশ উপনিষদ (১) ঈশ উপনিষদ

৫. পুরাণ : পুরাণ

৬. গীতা : গীতার ধর্ম, সন্ন্যাস ও ত্যাগ, বিশ্বরূপ দর্শন, গীতার ভূমিকা।

৭. ধর্ম ও জাতীয়তা : জগন্নাথের রথ, মানবসমাজের তিনক্রম, প্রভৃতি ৯টি প্রবন্ধ।

৮. জাতীয়তা : পুরাতন ও নূতন, অতীতের সমস্যা, প্রভৃতি ১২টি প্রবন্ধ

৯. পত্রাবলি : মৃণালিনী দেবীকে লিখিত, বারীন ঘোষকে লিখিত প্রভৃতি

১০. কারাকাহিনী : কারাকাহিনী, কারাগৃহ ও স্বাধীনতা প্রভৃতি চারটি প্রবন্ধ।

জগদীশচন্দ্র বসু

১. **'উদ্ভিদের স্পন্দন**—মূল প্রবন্ধটির নাম 'উদ্ভিদে জীবনের স্পন্দন'।

এটি বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউট, থেকে তিনটি খণ্ডে (২, ৩, ৪) প্রকাশিত হয়।

২ **Electro Physiology** আসলে বইটির নাম "Comparative Electro Physiology বা তুলনামূলক বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্ত ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের লংম্যানস, গ্রীণ অ্যাণ্ড কোং থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. **বসুবিজ্ঞান মন্দির** :১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুবিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন কার্য উদ্‌যাপন করলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে তাম্রফলকের উপর তিনি এই ক'টি কথা লেখেন—"ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান-মন্দির দেবচরণে নিবেদন করিলাম।" প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আচার্য বলেছিলেন, "বিজ্ঞান অনুশীলনের দুইটি দিক আছে। প্রথমত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার—ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতাগৃহ নির্মিত হইয়াছে।" বহু হিতৈষীর দানে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি নির্মিত হয়েছিল। বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড, বোম্বাইয়ের এম. আর বোমানজী, মূলরাজ খৈতান, স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী প্রভৃতি বহু মহানুভব ব্যক্তির দান ছাড়া জগদীশচন্দ্র নিজে সতেরো লক্ষ টাকা এই মন্দিরের জন্য দান করে গেছেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের ৫৯তম জন্মদিনে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১. **আনন্দমোহন বসু (২৩.৯.১৮৪৭—২০.৮.১৯০৬)** : ময়মনসিংহের জয়সিদ্ধিতে জন্ম। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এ.বি.এ. এবং এম.এ. (গণিতশাস্ত্রে) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিষয়ক সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার হন। ১৮৬৯ এ সস্ত্রীক কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

২. **প্রবন্ধ : বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা** : এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি 'India before and after the mutiny' নামে ১৮৮৫ সালে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

৩. **প্রবন্ধ : প্রেসিডেন্সি কলেজে রাসায়নিক গবেষণা** : ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র 'Notes from the chemical Laboratory of the presidency college, Note. No. 3 on silver Mercurous—Mercuric Nitrite, নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটি Journal of the Asiatic Society of Bengal N. S. 3 P. 137-138 প্রকাশিত হয়। সম্ভবত লেখক এই প্রবন্ধটির কথা বলতে চেয়েছেন।

৪. **বেঙ্গল কেমিক্যাল ঃ** ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির কথা মনে রেখেই প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের সূচনা। প্রথম দিকে ৯১ আপার সার্কুলার রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে তিনি হাড় পুড়িয়ে তা সালফিউরিক অ্যাসিডে জারিত করে ও সোডিয়াম কার্বোনেটের সাহায্যে ক্যালসিয়াম সুপার ফসফেট ও সোডিয়াম ফসফেট তৈরি করে বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি করেছিলেন। ওষুধে কাজ হওয়াতে চাহিদা বেড়ে যায়। বেঙ্গল কেমিক্যাল ১৮৯২ থেকে রেজেস্ট্রিকৃত কোম্পানি হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। ব্যবসার পরিধি বাড়ছে দেখে বাগমারি খালের কাছে ১০ বিঘার একটি প্লট কেনা হয় ১৯০৫ সালে এবং ১৯০৭ সালে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির প্ল্যান্ট চালু হয়। পরে এর আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

৫. **History of Hindu Chemistry (হিন্দু রসায়নের ইতিহাস)** : ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের History of Hindu Chemistry-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস থেকে। এতে ছটি অধ্যায় ছিল। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। প্রায় দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তিনি এই দুরূহ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের তিরোধানের বহু পরে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম ছাত্র প্রিয়দারঞ্জন রায় ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে বইটি আবার প্রকাশ করেন। সম্পাদনা ও পরিমার্জনার পর বইটি "History of Chemistry in Ancient and Medieval India incorporating History of Hindu Chemistry" নামে প্রকাশিত হয়।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

১. **ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ (১৩.৩.১৮১৪-১৬.১০.১৮৯৬) :** মনোমোহন ঘোষ প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার হিসেবে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে হাইকোর্টে ব্যবসায় শুরু করেন ও অল্পদিনেই যথেষ্ট খ্যাতিমান ও বিত্তবান হন। তিনি অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষের বন্ধু ছিলেন। তাঁদের স্ত্রীরাও পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। তারা একে অন্যকে 'গোলাপ' বলে ডাকতেন। মনোমোহন ঘোষের থিয়েটার রোডেই বাড়িতেই অরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হন। দিনটি ছিল ১৮৭২ এর ১৫ আগস্ট।

২. **লালমোহন ঘোষ (১২৫৪—১৩১৬) :** ইনি স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি একবার কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দেবার জন্য ইংল্যান্ডে যান ও ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংল্যান্ডে অবস্থিতি কালে তথায় ভারতের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন ও যশস্বী হন। তাঁর মত সরল ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে খুব কম লোকই পারতেন। তিনি নির্ভীক ও সুবক্তা ছিলেন।

৩ **ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৯-১৬.৯.১৯২৪) :** কৃষ্ণনগর স্কুল থেকে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সি থেকে বি.এ. ও ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স সহ কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। পরে আইন ব্যবসায়ে অসামান্য খ্যাতি লাভ করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও সভাপতি নির্বাচিত হন। আশুতোষের মৃত্যুর পর (১৯২৪) কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। নানা সংস্থা ও বহুজনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৪ **রাসবিহারী ঘোষ (২৩.১২.১৮৪৫—২৮.২.১৯২১) :** বাঁকুড়া হাইস্কুল থেকে ১৮৬০-এ এনট্রান্স, ১৮৬৬ তে বি.এ. ও ইংরেজিতে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. পাস করে, ১৮৬৭ তে আইন পাস করে বহরমপুর কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৭২-এ হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। স্যার আশুতোষ ও ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ একসময় তার সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক রূপেও বহু মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য কলকাতার কাছে একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন। ১৯০৫ এ যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয় আমৃত্যু তার সভাপতি ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু টাকা দান করেছেন।

৫. **ভক্তিযোগ :** (১৯১৮) অশ্বিনীকুমার দত্ত লিখিত একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এতে ভক্তি কি, ভক্তির অধিকারী কে. কামক্রোধাদি ষড়রিপু দূরীভূত করার উপায়, প্রবৃত্তি দমন, শ্রীচৈতন্য রচিত পঞ্চসাধন, ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। আর সকল ধর্মই এক আর সকল ধর্মেরই লক্ষ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি, আর ভক্তিই এই ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়—এ সবই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গুণদাচরণ সেন The culture of devotion নামে এর একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

৬ **ভক্তিযোগ সম্পর্কে বঙ্কিমের উক্তি :** "আপনার (অশ্বিনীকুমার দত্ত) প্রণীত 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থ আর একবার পাঠ করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু

অনবকাশপ্রযুক্ত তাহা ঘটিয়া উঠিল না। আমার বিশ্বাস যে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আমি বাঙ্গালা ভাষায় সম্প্রতি দেখি নাই, অথবা বাঙ্গালা ভাষায় অল্পই দেখিয়াছি। আমি গীতার টীকা প্রণয়নে নিযুক্ত আছি। ঐ টীকা মধ্যে এই গ্রন্থের কথা কিছু বলিতে হইবে, এজন্য এখন আর বেশি বলিব না।" বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়াও রাজনারায়ণ বসু, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নন্দ (পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন), চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পি. সি. মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বেশ কয়েকটি পত্র পত্রিকা গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

৭. অশ্বিনীকুমাব দত্ত রচিত গান :

লুকানো মানিক তুলবি যদি,
ডুব দে প্রেমসাগরের জলে।
খুঁজলে পরে যেথা সেথা
সে ধন কি ভাই অমনই মিলে।
প্রেমের সাগর কারা, হয়ে যেন মাতোয়ারা,
অহর্নিশ ডুব ডুব ডুব, ডুব দিতেছে দলে দলে।
তারা বুঝি খোঁজ পেয়েছে,
তাই কেবল ডুবুতে আছে,
তাদের সঙ্গে ডুব দে যদি
তুলবি মানিক পরবি গলে।।

৮. রবীন্দ্রনাথের গান : (পূজা পর্যায়ের)

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপরতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয়রে এবার ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি।
যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে-নীরব বীণা দিব ধরি।"

চিত্তরঞ্জন দাশ

১. মালঞ্চ : কবি চিত্তরঞ্জন দাশের কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ'। প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬, ১৮৯৪ বা ১৮৯৫ নয় বা প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬, ১৮৯৪ বা ১৮৯৫ নয়। এবং দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯১২। এটি মোট ৫০টি কবিতার সংকলন। এই গ্রন্থের ঈশ্বর, সোহং, বারবিলাসিনী, কবিতাগুলি প্রচণ্ড সামাজিক প্রতিবাদের সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজের এক বৃহদংশ তাঁর বিবাহে উপস্থিত থাকেননি। প্রথম সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন।

২. মালা : এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি 'মালঞ্চের' পরবর্তীকালে রচিত হলেও এটি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। স্ত্রী অর্পণা দেবীর মতে এটির

প্রকাশকাল ১৯০২, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ও অমল হোমের মতে এটির প্রকাশকাল ১৯০৪। এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন শিশিরকুমার দত্ত। ২৫ সুকিয়া স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত ৬৩ পৃষ্ঠার সুমুদ্রিত এই কাব্যগ্রন্থে ৩১টি কবিতা সংকলিত। এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা সাহিত্য, নির্মাল্য, মানসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৩. **অন্তর্য্যামী** : এটি কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৯১৫। প্রকাশক ছিলেন শিশিরকুমার দত্ত। ৪২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ৪২টি কবিতা আছে। কবিতাগুলি নামহীন। গ্রন্থে প্রকাশের তারিখ নেই। বেশ কয়েকটি পুনর্মুদ্রিত কবিতা আছে।

৪. **কিশোর কিশোরী : তিনের কথা** : এটি চিত্তরঞ্জনের শেষ কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশক ছিলেন বসুমতী কার্যালয়ের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মুখপত্রে একটি কবিতা ও 'আভাষ' শীর্ষনামে সাতটি কবিতা বর্তমান। ৮১ পৃষ্ঠার এই কাব্যগ্রন্থে প্রকাশের তারিখ নেই। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ থেকে জানা যায় এটির প্রকাশকাল ১৯২৫। সবগুলি কবিতা 'নারায়ণ' পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩২২—পৌষ ১৩২৩ এর মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত।

৫. **সাগরসঙ্গীত** : কাব্যটির প্রকাশকাল ১৯১১। কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মূল বিষয় প্রেম ও প্রকৃতি। সমগ্র কাব্যটি একটি অখণ্ড ভাবপ্রবাহ রক্ষা করেছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে সঙ্গতভাবেই লেখা হয়েছে" Lyrical poems on the Ocean and its various majestic Scenes' মুখপত্রের কবিতা সহ ৩৯টি কবিতা আছে। কাব্যটির প্রকাশক ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। বইটি প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩২১ (পৃ. ১৯৯) যে সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি নিম্নরূপ—'বইখানি হাতে পড়িলে প্রথমেই ইহার বাহ্যসৌষ্ঠবে চোখ জুড়াইয়া যায়। এমন উৎকৃষ্ট কাগজ, ও উৎকৃষ্ট বাঁধাই কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে পূর্বে আমাদের চোখে পড়ে নাই। প্রতি পৃষ্ঠাতেই সাগরের ভীষণ মধুর চিত্রাবলী; তরঙ্গভঙ্গের মৃদু আভাষের মধ্যে কবিতার ছত্রগুলি যেন ভাসিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। তদ্‌ভিন্ন স্বতন্ত্র কয়েকখানি সাগরচিত্র আছে। **উপরে নিকষ-কালো মেঘ তাহারই পদতলে সমুদ্রের কালো জলে তরঙ্গের ফেনোচ্ছল হাসির ছটা। এ গ্রন্থে বহিঃসৌন্দর্য্য মধুর, অপূর্ব।**" ৭টি পূর্ণ পৃষ্ঠার চিত্র আছে।

৬. **নারায়ণ** : চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত মাসিক পত্র। প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩২১। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার লেখক ছিলেন সম্পাদক স্বয়ং ছাড়াও বিপিনচন্দ্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন ও সরযূবালা দাশগুপ্ত। ১৩২৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জনের অধিকাংশ রচনা এই নারায়ণ-এ আত্মপ্রকাশ করেছিল।

৭. **বাঁকিপুরে সাহিত্য সম্মিলন ও প্রবন্ধ পাঠ,**—'বাংলার গীতিকবিতা প্রথম কল্প' এই প্রবন্ধটি ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে বাঁকিপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি রূপে চিত্তরঞ্জন দাস পাঠ করেন। প্রবন্ধটি 'নারায়ণ' পত্রিকায় পৌষ ১৩২৩-এ প্রকাশিত হয়।

৮. **রবীন্দ্রনাথের "এনেছিলে সাথে করে........"**

দেশবন্ধুর পরলোক গমন উপলক্ষ্যে রচিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

১. **মান সিংহ** ঃ সম্রাট আকবরের অন্যতম বিশ্বস্ত ও দক্ষ সেনাপতি। মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি ছিলেন অম্বর (জয়পুর) রাজ ভগবান দাসের দত্তক পুত্র। সম্রাট আকবর মানসিংহকে তাঁর সেবার পুরস্কার স্বরূপ সাতহাজারি মনসবদার করেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে (১৫৭৬) তিনি মোগল বাহিনীর সেনাপতিরূপে রাণা প্রতাপসিংহকে পরাজিত করেন। মানসিংহ কাবুল, বাংলা ও বিহারের শাসক ছিলেন।

২. **টোডরমল** ঃ মোগল সম্রাট আকবরের বিশিষ্ট অমাত্য টোডরমল প্রথমে শেরশাহের সরকারে সামান্য কর্মচারীরূপে যোগ দেন। প্রথমে মোগল সম্রাট আকবরের রাজসভাতেও তিনি কোনো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু প্রশাসনিক দক্ষতা ও আপন সামরিক প্রতিভায় তিনি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধানত তিনি সম্রাট আকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সম্রাটের বিভিন্ন সামরিক অভিযান টোডরমলের নেতৃত্বে পরিচালিত হোত। মোগল দরবারে যোগদানের পর ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন ও ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন তাঁর মুখ্য পার্শ্বচর।

৩. **মন্টেগু** ঃ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মন্টেগু শাসক হিসেবে ভারতে আসেন ও তাঁর পরিকল্পিত শাসন সংস্কারের খসড়া নিয়ে বড়লাট লর্ড জেমসফোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁদের আলোচনার ফল ১৯১৮ সালে জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। সেই রিপোর্ট অনুসারে হয় ১৯১৯-এর ভারত শাসন সংস্কার আইন।

৪. **মিন্টো** ঃ **লর্ড মিন্টো** ১৯০৫-১০ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তাঁর শাসনকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের বিরোধের ফলে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাটে জাতীয় কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হয়; ১৯০৮ সালে হয় ক্ষুদিরামের ফাঁসি। এই বছরেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ, কানাইলাল প্রমুখ বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করার অভিপ্রায়ে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 'কাউন্সিল অ্যাক্ট' পাশ হয়, যা তৎকালীন ভারত সচিব মর্লি ও গভর্নর জেনারেল মিন্টোর নামানুসারে মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার নামে অভিহিত হয়। পরের বছর লর্ড মিন্টোর কার্যকাল শেষ হয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত

১. **শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০-৬.৬.১৮৬৭)** ঃ কাশ্মীরি পণ্ডিত বংশের সন্তান। শৈশবে কাকার কাছে প্রতিপালিত হন। কৈশোরে লক্ষ্ণৌতে উর্দু ও ফারসি ভাষা শেখেন। প্রথমে কোর্টের সহকারী রেকর্ডকিপার ও পরে ডিক্রিজারির মহুরির পদ পান। সে সময় ডিক্রিজারি সম্পর্কিত একটি বই লিখে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৫৫-তে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন অধ্যাপক ও পরে সিনিয়র উকিল হন। ১৮৬৩-তে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তিনিই প্রথম দেশীয় বিচারপতি রূপে আমৃত্যু কাজ করেন। ভবানীপুর

অঞ্চলে তার নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কর্মযোগী এই পুরুষটি ১৮৬৭-এর ৬ জুন মারা যান।

২. **সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ** (২৭.৬.১৮২৯-২০.৯.১৮৬৯) ঃ খ্যাতনামা সাংবাদিক। সরকারি চাকুরি দিয়ে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে সাংবাদিকতায় চলে আসেন। হিন্দু ইনটেলিজেন্সার, লিটারারি ক্রণিকল, ভাই শ্রীনাথ ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বেঙ্গল রেকর্ডার' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজে 'বেঙ্গলি' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। 'ক্যালকাটা মান্থলি' ও 'মান্থলি ম্যাগাজিন'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা ও হাওড়ার নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। হাওড়ায় তাঁর নামে একটি বড় রাস্তা আছে।

৩. **আনন্দকৃষ্ণ বসু** (১৮২২-১৮৯৭) ঃ সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিত পণ্ডিত রূপে সুনাম ছিল। বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র ছিলেন। বাংলার ইতিহাস ও বাংলায় বৈজ্ঞানিক অভিধান-এর পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন।

৪. **ভূগোল** ঃ অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রকাশিত গদ্য পুস্তক। এটির প্রকাশকাল ১৭৬৩ শকাব্দ বা ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ। বইটিতে ভূগোল বিষয়ক এমন কিছু পরিভাষা আছে যেগুলি পরবর্তী কালে পরিত্যক্ত অথবা পাঠ্যপুস্তকে গৃহীত হয়নি। যেমন অখাত-উপসাগর, ক্ষুদ্রাখাত-ঘোট উপসাগর, ডমরুমধ্য-যোজক প্রভৃতি।

৫. **বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার** ঃ বইটি দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম-১৮৫১(?) ২য়-১৮৫৩। গ্রন্থটি কুম্বের The Constitution of Man গ্রন্থের অবলম্বনে লেখা হলেও প্রাবন্ধিক প্রয়োজন মতো পাশ্চাত্যরীতির স্থানে ভারতীয় রীতিনীতি প্রয়োগ করে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরবৃত্তের পরিচয় দিয়েছেন।

৬ **চারুপাঠ** ঃ এটিও তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৫৩-৫৯)-এর মধ্যে। বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ দুটি খণ্ডে নয় এটি তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।

৭. **নর্মাল স্কুল** ঃ বাংলায় শিক্ষকশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে সাধারণভাবে নর্মাল স্কুল বলা হোত।

৮. **পদার্থ বিদ্যা বা জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম** ঃ এটি একটি স্কুল পাঠ্যপুস্তক। রচনাকাল ১৮৫৬। এতে বাস্তব জগতের বৈজ্ঞানিক স্বরূপ নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে।

৯. হাওড়ার বালি নামক পৌরসভার অন্তর্গত একটি জনপদ।

১০. **চারুপাঠ** ঃ ৩য় ভাগ। এটির প্রকাশকাল ১৮৫৯, ১৮৬৩ নয়।

১১. **ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়** ঃ এটি দুটি খণ্ডে রচিত গ্রন্থ (১ম-১৮৭০, ২য় ১৮৮৩)। এটি হোরেস হেম্যান উইলসনের "Essays and Lectures on the Religious Sects of the Hindoos" অবলম্বনে রচিত।

১২. **ধর্মনীতি** ঃ প্রকাশকাল ১৮৫৬।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা—মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের ফলে বিলেতের পার্লামেন্টের অনুকরণে এ দেশে ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) গঠিত হয়েছিল। বাংলার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে ৩ জনকে গভর্নর মন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বায়ত্বশাসন বিভাগের, শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র মিত্র শিক্ষা বিভাগের এবং নবাব আলী চৌধুরী কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মনোনীত হয়েছিলেন প্রথম ব্যবস্থাপক সভায়।

২. **এডুকেশন গেজেট** ঃ প্রকাশকাল ৪ জুলাই ১৮৫৬। ঃ সমকালীন দক্ষিণ বিভাগীয় ইনস্পেক্টর হজসন প্র্যাটের পৃষ্ঠপোষকতায় রেভারেন্ড ও ব্রায়ান স্মিথের সম্পাদনায় এই এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ প্রত্যেক শুক্রবারে প্রকাশিত হোত। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় পত্রিকাটি কিছুদিন চলেছিল। পরে ১৮৬৬-এর মার্চ মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্যারীচরণ সরকারের পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮ থেকে এর সম্পাদকের দায়িত্ব নেন।

২ (ক) **প্যারীচরণ সরকার (২৩.১.১৮২৩—৩০.৯.১৮৭৫)** ঃ কলকাতার চোরবাগানে জন্ম। আদিনিবাস তড়াগ্রাম হুগলি। হিন্দু কলেজের ছাত্র। ১৮৪৩-এ হুগলি স্কুলে শিক্ষক ও পরে (১৮৪৬-৬৬) বারাসাত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কলুটোলা ব্রাহ্ম স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে আট বছর ছিলেন ও তাঁরই উদ্যোগে এই স্কুলের নাম পরিবর্তিত হয়ে হেয়ার স্কুল হয়। ১৮৬৩-তে প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপক এবং ১৮৬৭-তে ঐ পদে স্থায়ী হয়ে আমৃত্যু কাজ করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ও বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৮৬৬-তে সরকারি সংবাদপত্র 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন ও পরে সরকারের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'মাদক নিবারণী সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'ওয়েল উইশার' এবং 'হিতসাধক' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ছোটোদের ইংরেজি শেখাবার জন্য মোট ছটি খণ্ডে 'First Book of Reading for Native Children' প্রকাশ করেন।

৩. **শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব** ঃ এটি শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। প্রকাশকাল—জুন ১৮৫৬। পৃ. ৯১।

৪. **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান** ঃ প্রথম ভাগ-১৮৫৮, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৯। "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" পুস্তকের মুখবন্ধে বিজ্ঞানের এই শাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি সবিশেষ প্রশস্তি গেয়েছেন। পরমাণু সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাধারাতে ভূদেব ছাত্র সাধারণের বোধগম্য করে পরিবেশন করেছেন। ".... ডালটনের পরমাণু তত্ত্বকে ভূদেব প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করে ছাত্রদের মনে ঐ ধারণা স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান

রচনায় ভূদেবকে অসাধ্যসাধন করতে হয়েছে। ঐ পাঠ্যপুস্তক সমূহ রচনায় প্রয়োজনে তাঁকে বহু বৈজ্ঞানিক শব্দের সুসঙ্গত পরিভাষা রচনা করতে হয়েছে।"

ভূপেন্দ্র আদিত্য। ... "ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনজিজ্ঞসায় ভূদেব ও তার সাহিত্য" ভারত বুক এজেন্সি, ১৯৮৫। (পৃঃ ৩৭৩)।

৫ **ক্ষেত্রতত্ত্ব ১৮৬২। পৃ ১৮৮।** শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতিক্রমে তাঁর অনূদিত ইউক্লিডের গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

৬. **ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ঃ** প্রকাশকাল ১৫ আগস্ট, প্রকাশকাল ১৮৬২। পৃ. ২২০ পৃ.।

৭. **পুরাবৃত্তসার ঃ** প্রকাশকাল ইং ১৮৫৮। পৃ. ১৪৮। ভূদেব এই গ্রন্থে পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র থেকে মানবজাতির আদিম ইতিহাস, ভাষার ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস প্রভৃতি সংকলন করেছেন। তিনি সামগ্রিকভাবে মনুষ্যজাতির ক্রমবির্বতন ও উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করেছেন, যার কিছুটা পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থভিত্তিক ও কিছুটা ঐতিহাসিক।

৮. **রোমের ইতিহাস ঃ** প্রকাশকাল ইং ১৮৬৩। ১২৭ পৃ.।

৯ **ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ** প্রকাশকাল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ। তিনি এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন, "গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ ও হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই পুস্তকের উদ্দেশ্য।"

১০. **পুষ্পাঞ্জলি ঃ প্রকাশকাল** ১৬ জুন, ১৮৭৬। ১৫১ পৃ.। কোনো কোনো সমালোচকের মতে বঙ্কিমের আনন্দমঠ রচনার প্রেরণা আসে ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি' উপন্যাস থেকেই। 'জন্মভূমির রূপ ভূদেব প্রত্যক্ষ করেছিলেন পুষ্পাঞ্জলিতে, মাতৃশক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিও ধরা পড়েছে তাঁর ধারণায়। ভূদেব চেয়েছেন সেই শক্তি জাগ্রত হোক। কিন্তু কেমন করে সেই শক্তি জাগ্রত হবে, কোন্‌রূপে তার প্রকাশ ঘটবে ভূদেব তা বলতে পারেননি। পরবর্তীকালে বঙ্কিম তাঁর আনন্দমঠে তা প্রকাশ করেছেন। ... "১৮৭৬-এ ভূদেব পুষ্পাঞ্জলিতে যা নির্দেশ কবতে পারেননি, ১৮৮২-তে বঙ্কিম আনন্দমঠে তা পরিষ্কারভাবে বলেছেন, তা দেখিয়েছেন। ..... পুষ্পাঞ্জলির তত্ত্বগুলি আনন্দমঠে ব্যাখ্যাও হয়েছে বলা যায়। এই বিচারে পুষ্পাঞ্জলিও আনন্দমঠকে পরস্পরের সম্পূরক বলা যায়।". ভূপেন্দ্র আদিত্য—তদেব—পৃ. ২০৩।

১১. আচার প্রবন্ধ ঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ (১৮৯৫)। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লেখক বলেছেন, "এখনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ব্যাঘাতক পাঁচটি বস্তু দৃষ্ট হয়। (১) বিধি বিষয়ক অবজ্ঞা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, (৩) বিজাতীয় অনুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলস্য। এই সব কিছুর বিরুদ্ধে যথার্থ আচারের প্রতিষ্ঠার জন্য এই গ্রন্থ রচনা। প্রকাশকাল ১৮৯৫ ফেব্রুয়ারি। ২৩৪ পৃ.।

১২. **সামাজিক প্রবন্ধ ঃ** প্রকাশ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯২। ৩১৯ পৃ.।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "প্রবন্ধগুলির শ্রেষ্ঠত্ব ভাষার সরলতায়, বক্তব্যের স্পষ্টতায়, তথ্যের নিষ্ঠায়, গতির অপ্রমত্ততায়, যুক্তির প্রাবল্যে, সহনশীলতায় ও সর্বোপরি শৃঙ্খলা রক্ষায়। এগুলি লেখকের আত্মোপলব্ধি, সামাজিক জ্ঞান, নৈতিক দৃঢ়তা, অকপট জীবনসাধনা, ন্যায়বোধ, দেশপ্রেম, স্বজাতিত্ববোধ ও আচারনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাভাবকেই প্রকাশ করেছে।"

১৩. **পারিবারিক প্রবন্ধ** ঃ প্রকাশ ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২। ১৩১ পৃ.।

কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। এগুলিতে ভূদেবের পারিবারিক অভিজ্ঞতার চিহ্ন আছে। 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধে বাল্যবিবাহের দোষগুণ তিনি আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া ভৃত্য প্রতিপালন, গৃহপালিত পশুচর্চা, সন্তানপালন, স্ত্রীশিক্ষা, ধর্মাচরণ সম্পর্কীয় নানা প্রসঙ্গ আছে। উনিশশতকে হিন্দু পরিবারের আদর্শ সংসার রচনার যে চেষ্টা হয়েছিল—এই গ্রন্থে তারই পরিচয় বিবৃত।

১৪. **মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়** ঃ আচার্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। পিতার ন্যায় শিক্ষানুরাগী ছিলেন। পিতার প্রবর্তিত বিশ্বনাথ ফাণ্ড বা বৃত্তি চালু রেখেছিলেন। পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে 'সোমদেব সৎকর্ম ভাণ্ডার ও 'গোকুণ্ড' সমিতি স্থাপন করেন। 'ভূদেব চরিত' তাঁর অসামান্য গ্রন্থ। মহিলা ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবী তাঁর অন্যতমা কন্যা ছিলেন।

১৫. **অনুরূপা দেবী** ঃ (৯.৯.১৮৮২-১৯.৪.১৯৫৮) ঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের অন্যতমা নেত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক দান করেছিলেন।

আবদুল লতিফ

১. **লতিফের পূর্বপুরুষগণ** ঃ নবাব আবদুল লতিফের আদিপুরুষ খালিজ বিন-ওয়ালিদ মহম্মদের অন্যতম সহচর ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন ও বহুদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে "ঈশ্বরের তরবারি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর বংশধরেরা তুরস্ক দেশের বোগদাদ নগরীতে বাস করতেন। এঁদের মধ্যে শাহ-আইন-উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম ভারতে এসে দিল্লিতে বসবাস করেন। পাণ্ডিত্য ও বদান্যতার জন্য তিনি অতি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পুত্র আবদুর রসুল বাদশাহের সনদের দ্বারা বারভূইঞার অধীনস্থ সরকার ফতেহাবাদ চাক্‌লা, ভূষণা প্রভৃতি পরগণায় (এখন ফরিদপুর) বিচারক বা কাজি নিযুক্ত হন। এখানকার সমৃদ্ধিশালী জমিদার মসলজি বয়াজিদের দৌহিত্রী, লস্করদিয়া নিবাসী কুতুবদানিসমন্দের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এইখানে স্থায়ীভাবে বাস করবেন ভেবে বাদশাহের কাছ থেকে মৌজা সঙ্কসলদিয়ায় ১২ খাদ নিষ্করভূমি চেয়ে নেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র কাজি আবদুল ওয়াহাব মৌজা রাজাবেনী নিবাসী সৈয়দ বাহরামের কন্যাকে বিয়ে করেন ও সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সনদদ্বারা মৌজা রাজাপুরে ১২ খাদ নিষ্করজমির অধিকারী হন। নির্জন, দুর্গম এই স্থানটির ওয়াহাব নাম দেন 'বারখাদিয়া'।

এই আবদুল ওয়াহাবের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে এই প্রদেশে কাজির স্থান অধিকার করেছিলেন। পাণ্ডিত্য, বদান্যতা, সৌজন্য, শিষ্টাচার প্রভৃতির ফলে সেখানকার লোকেদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। ওয়াহাবের পরবর্তীগণের বংশতালিকা এরূপঃ

কাজি আবদুল ওয়াহাব
↓
কাজি মহম্মদ আসরফ
↓
কাজি আবদুস শুকুর
↓
কাজি মহম্মদ রেজা
↓
কাজি ফকির মহম্মদ

এই কাজি ফকির মহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল লতিফ।

২. **কলিকাতার দেওয়ানি আদালতে ওকালতি ঃ**

রাজাপুরের কাজিরা একসময় সঙ্গতিপন্ন থাকলেও বহুবিবাহ প্রথার ফলে এদের বংশবৃদ্ধি হওয়ার সম্পত্তি নানাভাগে ভাগ হয়ে অবস্থা অসচ্ছল হয়ে যায়। তাই আবদুল লতিফের পিতা কাজি ফকির মহম্মদ জীবিকার কারণে কলকাতা আসেন। এখানে তাঁর স্ত্রীর কাকা মুনশি বকাউল্লা সদর দেওয়ানি আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। কাজি ফকির তাঁর সহকারীরূপে কাজ করতে থাকেন। বকাউল্লার মৃত্যুর পর বিচারপতিরা ফকির মহম্মদকে উকিলের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি ২৮ বৎসর কাল এই পদে কাজ করেছেন।

৩. **লতিফের জন্ম ঃ** আবদুল লতিফের জন্ম ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে। কোনো কোনো বইতে ১৮২৬ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জলধর সেন ছাড়া 'সেকালের কৃতী বাঙালী'-মন্মথনাথ ঘোষের লেখা বইতে ১৮২৮ রয়েছে। কিন্তু শামসুজ্জামান ও সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'চরিতাভিধান' গ্রন্থ রয়েছে ১৮২৬।

৪। **মাদ্রাসায় ইংরেজি বিভাগ খোলা হইলে ঃ** আরবি ও পারসি ভাষায় মুসলমান ধর্মশাস্ত্র, ব্যবস্থাশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়াই মাদ্রাসার একমাত্র কাম্য ছিল। ইংরেজি ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল না। "১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। এই বৎসর একটি ইংরাজী শ্রেণী খোলা হয় কিন্তু মুসলমান ছাত্রগণের ইংরাজী শিক্ষার কোনও আগ্রহ পরিদৃষ্ট না হওয়ায় উহা শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসার একটি স্বতন্ত্র ইংরাজী বিভাগ স্থাপিত হয়।" (মন্মথ নাথ ঘোষ-সেকালের কৃতী বাঙালী.......... পৃঃ ৪১)

প্রসঙ্গত জানানো যায় যে, বাংলা শেখার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের একটু দ্বিধা ছিল।

আবদুল লতিফ নিজেই মনে করতেন, মধ্য ও উচ্চবিত্ত মুসলমানদের শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত উর্দু। গ্রামের নিম্নশ্রেণির মুসলমানরা আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাংলার চর্চা করলেও করতে পারেন। শিক্ষা কমিশনের কাছে মতামত দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "My opinion as regards Bengal is that Primary Instruction for the lower classes of the people, who for the most Part are ethnically allied to the Hindoos should be in the Bengali Language......for the middle and upper classes of Mahomedans, the Urdoo should be recognised as the vernacular." স্বপন বসু-'মুসলমানের বাংলা শিক্ষা—উনিশ শতকে' (প্র.) 'গোপালচন্দ্র মজুমদার : একালের শিক্ষাভাবনা' গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ. ৮৪।

৫. **কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা :** 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম)' (পৃঃ ৪১৯) গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—"১৭৮০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কতকগুলি শিক্ষিতপদস্থ মুসলমান গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানান যে, তাহারা মজিদ-উদ্দীন নামে একজন পণ্ডিতের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং এই সুযোগে একটি মাদ্রাসা বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে মুসলমান ছাত্রেরা মজিদ-উদ্দিনের অধীনে প্রধানত মুসলমান আইন শিখিয়া সরকারী কার্যের উপযুক্ত হইতে পারিবে। হেস্টিংস এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং পরবর্তী অক্টোবর মাসে মজিদ-উদ্দীনের উপর একটি স্কুল চালাইবার ভার দেন। ইহার জন্য মাসে মাসে ৬২৫ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। স্কুল গৃহ নির্মাণের জন্য অল্পদিন পরেই হেস্টিংস ৫৬৪১৲ টাকা দিয়া 'বৈঠকখানার নিকট পদ্মপুকুরে' এক খণ্ড জমি কিনিলেন। ..... ১৭৮২ এর জুন মাসের পূর্বেই মাদ্রাসা নির্মিত হইয়াছিল। ...কিন্তু স্থানটি অস্বাস্থ্যকর, এবং ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় ১৮২৩ সনের জুন মাসে মুসলমান বহুল কলিঙ্গতে (বর্তমান ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ার) সরকার এক নূতন মাদ্রাসা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন। ১৮২৪ সনের ১৫ই জুলাই তারিখে বর্তমান মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮২৭ সনের আগস্ট মাস হইতে এখানে নিয়মিতরূপে কলেজের কার্য্য চলিতে থাকে।"

৬. **মাদ্রাসা, ইংরেজি শিক্ষাও মুসলমান ছাত্র :** জানা যায় অতি কম মুসলমান ছাত্র মাদ্রাসায় ইংরেজি পড়ত। সেই সময়ের একটি ছবি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত 'Reis and Rayyet' পত্রিকায়। যা বলেছিলেন তার অনুবাদে দাঁড়ায়—"কেউই ইংরেজি শিখতে চাইত না। ইংরেজি শেখবার শ্রেণিগুলোতে ছাত্রশূন্য বেঞ্চের সামনে শিক্ষককে একা বসে থাকতে হোত। আজামুদ্দিন আসান, জৈনুদ্দিম হোসেন এবং আবদুল লতিফ প্রমুখ কয়েকজন প্রতিভাবান ছাত্র প্রথমে কুসংস্কার ছিন্ন করে নতুন পথে এগিয়ে যায়।"

আবদুল লতিফ ১৮৪০ থেকে ১৮৪৬ পর্যন্ত অর্থাৎ বিদ্যালয় পরিত্যাগ কাল পর্যন্ত ইংরেজি বিভাগে অধ্যয়ন করেছিলেন ও প্রতি বছরই ছাত্রবৃত্তি পেয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই প্রথম স্থান অধিকার করতেন।

৭. **ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্তি ঃ** ১৮৪৯-এর মার্চ মাসে বাংলার তদানীন্তন ডেপুটি গভর্নর স্যার হাবার্ট ম্যাডকের নির্দেশে মাসিক দু'শত টাকা বেতনে তিনি আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৫২-এর এপ্রিল থেকে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

৮. **জাস্টিস অফ পিস্ ঃ** ১৮৬৩-তে তিনি জাস্টিস অব পিস্ হন। তিনি শুধু কলকাতার জন্য ছিলেন না বাংলা বিহার উড়িষ্যার জন্যও এই সম্মান পেয়েছিলেন। এটি ১৮৬৫-তে নয়।

৯. **মহসিন ফণ্ড ও লতিফের সংস্কার ঃ** 'সেকালের কৃতী বাঙ্গালী' গ্রন্থের লেখক জানাচ্ছেন, "......দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন মুসলমানগণের যে শিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থদান করিয়া গিয়াছিলেন, ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ সে শিক্ষার জন্য সেই অর্থব্যয় না করিয়া অন্য কার্য্যে উহা ব্যয় করিতেছিলেন। মহসীন ফণ্ড হইতে প্রায় বাৎসরিক ৫০,০০০ টাকা হুগলীর কলেজে ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতেছিল। ... মুসলমান ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। হুগলী কলেজে হিন্দু ছাত্রগণই ইংরাজী শিক্ষা করিতেন। সুতরাং স্বজাতীয়গণ আরব্য ভাষায় লিখিত ইসলাম ধর্মশাস্ত্রাদির মর্ম অবগত হইতে পারেন, এইরূপ শিক্ষার জন্য মহম্মদ মহসীন যে অর্থদান করিয়া যান, সেই অর্থে হিন্দুগণ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া ইসলাম ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া মহসীন প্রদত্ত অর্থের সুফল প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। ... অধিকন্তু এই সময়ে মহসীন ফণ্ড হইতে পরিচালিত হুগলী মাদ্রাসা উঠাইয়া দিবারও এক প্রস্তাব হয়। মুসলমান সমাজে অসন্তোষ ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণের প্রতিনিধিরূপে আবদুল লতিফ এই সকল ব্যাপার তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট মহোদয়ের গোচরীভূত করেন। স্যার জন আবদুল লতিফকে মহসীন ফন্ড সংক্রান্ত, সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন।

স্যার জনের অনুরোধে লতিফ প্রস্তাব দেন যে, হুগলী কলেজে সাহায্যদান বন্ধ রেখে হুগলী মাদ্রাসার সংস্কার ও মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসায় ইংরেজি ও আরবি শিক্ষার জন্য টাকা বরাদ্দ হোক। পণ্ডিত দ্বারকানাথ ভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' ও 'আবদুল লতিফের প্রস্তাবের অনেকটাই সমর্থন করেন। "তাহাদিগের (মুসলমানদিগের) ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষা শিক্ষা করিলে যেরূপ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে, আরবী ও পারসীভাষা শিক্ষায় তাহার শতাংশের একাংশও উপকার সম্ভাবনা নাই।" 'বেঙ্গলী' পত্রের সম্পাদক স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট সানন্দে লতিফের বক্তব্য সমর্থন করেন। তিনি ১৮৬২ সালের মার্চ মাসে ভারত ত্যাগ করার ফলে এই প্রস্তাব কিছুদিন ধামাচাপা পড়ে যায় ও পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড এলগিন এ ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১০. **ভূপাল রাজ্যের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ঃ** এটি ১৮৮৬-তে নয় ১৮৮৫-তে হয়েছিল

১১. **মৃত্যু ঃ** ১৮৯৩-এর ১৮ জুলাই নয় হবে ১০ জুলাই।

'খান বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্তি ১৮৭৭-তে
'নবাব' উপাধি প্রাপ্তি ১৮৮০-তে
সি.আই.ই. উপাধি প্রাপ্তি ১৮৮৩-তে
নবাব বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তি ১৮৮৭-তে।

রাসবিহারী ঘোষ

১. **প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নস পিকক :** ১৮৫৯-১৮৬২ সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৮৬২-তে সুপ্রিম কোর্টের পরিবর্তে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি সুপ্রিম কোর্টের শেষ প্রধান বিচারপতি ও হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

২. **বৃটিশ ভারতে বন্ধকী আইন :** 'Law of Mortgage in India' বিষয়ক মূল্যবান বক্তৃতা তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক হিসেবে দিয়েছিলেন।

৩. **স্যার গোপালকৃষ্ণ গোখেল :** জন্ম ৭ মে, ১৮৬৬ ; মৃত্যু ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ বোম্বাই প্রদেশের কোলাপুরে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম। ১৮৮৪ সালে বি.এ. পাশ করে ডেকান এডুকেশন সোসাইটিতে যোগদান। ১৮৮৫ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত ফার্গুসন কলেজে সাহিত্য ও অঙ্কের অধ্যাপক পদে যোগদান। ১৯৯০-১৯০১ বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও ১৯০২ সালে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০৫-এ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ইনি সভাপতিত্ব করেন। এই বছরে তাঁরই উদ্যোগে ভারত সেবক সমাজ তৈরী হয়। ১৯০৩-এ তাঁকে C.I.E. মনোনীত করা হয়। ১৯১২-এ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ও ১৯১৪-তে K.C.I.E. উপাধি দেওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯০৪-এ তিনি Ranade Institute for Economics প্রতিষ্ঠা করেন।

আসলে গোখেল ছিলেন একজন প্রথম সারির সমাজসংস্কারক। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, নারীমুক্তি, নারী শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি সামাজিক কাজকর্মে তাঁর অবদান যথেষ্ট।

৪. **স্যার টি. পালিত (১৮৩১—৩.১০.১৯১৪) :** পুরো নাম তারকনাথ পালিত। বিখ্যাত ব্যারিস্টার। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশান-এর অক্লান্ত কর্মী ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আইন ব্যবসায়ে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। দেশে উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতির জন্য সারাজীবনের সঞ্চিত সম্পদ ১৫ লক্ষ টাকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষার জন্য দান করেন। তাঁর দানীয় অর্থ ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের অর্থে কলিকাতা সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. **কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ :** বর্তমানে আর. জি. কর. মেডিক্যাল কলেজ নামে সুপরিচিত। এই মেডিক্যাল কলেজে তিনি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দান করেন।

চন্দ্রনাথ বসু

১. **চন্দ্রনাথ বসুর জন্ম ঃ** ১২৫১ বঙ্গাব্দের ১৭ ভাদ্র (৩১ আগস্ট, ১৯৪৪) হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে চন্দ্রনাথ বসুর জন্ম।

২. **পিতা সীতানাথ ও পিতামহ কাশীনাথ ঃ** চন্দ্রনাথের পিতামহ কাশীনাথের চার পুত্র। সীতানাথ কনিষ্ঠ। এই সীতানাথের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথ ও কনিষ্ঠ চন্দ্রনাথ। এ ছাড়া ছিল তিন কন্যা—সুরধুনী, মন্দাকিনী ও বরদাসুন্দরী।

৩. **ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর শাখা বিদ্যালয় ঃ** শিক্ষানুরাগী গৌরমোহন আঢ্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করেন। চিৎপুরে মূল বিদ্যালয় ছাড়াও এর তিনটি শাখা ছিল—একটি কলকাতায় চিৎপুরে মূল বিদ্যালয়ের নিকটে, একটি ভবানীপুরে, আর একটি বেলঘরিয়ায়। চন্দ্রনাথ কলকাতা শাখা স্কুলে ভরতি হলেন।

৪. **রসরাজ অমৃতলাল বসু ঃ** (১৭-৪-১৮৫৩—২.৭.১৯২৯) বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার, কৌতুকরসের স্রষ্টা ও অভিনেতা। তাঁর রচিত চল্লিশটি গ্রন্থের মধ্যে নাটক ৩৪টি। 'পুরাতন প্রসঙ্গ', 'পুরাতন পঞ্জিকা' প্রভৃতি তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা।

৫. **কৈলাসচন্দ্র বসু (১৮২৭—১৮.৮.১৮৭৮) ঃ** হিন্দু কলেজের অন্যতম সেরা ছাত্র। 'বেথুন সোসাইটির সক্রিয় সদস্য। শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা জন উড্রোর অনুরোধে সোসাইটির একটি সভায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ইতিহাস বিবৃত করেছিলেন। সোসাইটির আর একটি সভায় Hindoo Female Education সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সতীর্থ সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায়। 'Literary Chronicle' (১৮৪৯) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির মূল স্কুলে চন্দ্রনাথ গেলে সেখানে তিনি কৈলাসচন্দ্র বসুকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পান। তিনি চন্দ্রনাথকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। হিন্দু কলেজে ডি. এল. রিচার্ডসনের কাছে মাত্র কয়েকদিন ইংরেজি পড়েছিলেন। রিচার্ডসনের ইংরেজি পড়ানোর স্মৃতি তাঁর জীবনে গভীর দাগ কেটেছিল।

৬. **শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ অ্যাটকিন্সন সাহেব ঃ** শিক্ষাবিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ বা ডিরেক্টার উদারচেতা ডব্লিউ. এস. অ্যাটকিন্সন নিবেদিতা ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। কলকাতার শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন জড়িয়ে ছিলেন।

৭. **সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামি ঃ** নিজাম রাজ্যে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় থাকাকালীন চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে 'Calcutta University Magazine নামে একটি ইংরেজি মাসিক প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির পরিচালনায় অধ্যাপক প্যারীচরণের যথেষ্ট সহায়তা ছিল। তখন চন্দ্রনাথ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র। ঐ সময় তিনি on the importance of the study of History নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ও এটি যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল।

৮. **মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (২২.২.১৮৩৬—১৯০৬) :** প্রথমে মেদিনীপুর জেলার রায়গঞ্জে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণ ও বিভিন্ন অধ্যাপকের কাছে কাব্য, স্মৃতি, বেদান্ত ও অলংকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কাশী যাত্রা করেন। পরে কলকাতায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি পান। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন ও ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তক।

৯. **রায়বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৫—১৯০১) :** জন্ম ২৪-পরগনায় রাহুতা গ্রামে। হুগলি জেলা স্কুল শিক্ষকতা করার পর জয়পুর রাজের স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত হলে তিনিই তাঁর অধ্যক্ষ হন। ক্রমে রাজদরবারে অন্যতম মন্ত্রী ও রাজার মৃত্যুর সময় জ্যেষ্ঠপুত্র নাবালক থাকায় তিনিই মন্ত্রীসভার প্রধান হিসেবে কাজ করতে থাকেন। রাজপুত্র সাবালক হলে রাজা তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দান করেন।

১০. **স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট :** ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে এঁর নাম জড়িত। কেশবচন্দ্র সেনের অন্যতম অনুগামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে উদ্যোগী হন। সে সময় সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা আলফ্রেড ক্রফ্‌ট এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন ও এজন্য কয়েকটি কমিটিও গঠিত হয়।

১১. **'বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট লাইব্রেরির কর্মপ্রাপ্তি :** এ কাজটি শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌টের সাহায্যে পাননি। এই সময় ক্রফ্‌ট সাহেব ছুটিতে ছিলেন। তাঁর সেই পদে তখন ছিল চন্দ্রনাথের শিক্ষাগুরু সি. এইচ. টনী সাহেব। তিনিই চন্দ্রনাথকে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। পদটির সম্পূর্ণ নাম ছিল, "Librarian of Bengal Library and keeper of the catalogue of books under section 18, Act XXV of 1867. মাসিক বেতন ২০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা। চন্দ্রনাথ ১৮৭৯-এর ৭ অক্টোবর পদটি গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি ৭ বছরেরও বেশি ছিলেন।

১২. **রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (৩১.১০.১৮৪৫—১০.১০.১৮৮৬) :** কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী ছাত্র। দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. ও পরে বি.এল. পাশ করে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। পরে প্রেসিডেন্সি, কটক ল কলেজ, বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করার পর গভর্নমেন্টের বাংলা অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত হন। ১৮৬৯-৮৬ পর্যন্ত তিনি এই পদে এই কাজ করেন। বহুভাষা জানতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এ বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৩. **আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪৩-১৩.৮.১৯৩২) :** পিতা বিখ্যাত রামজয় তর্কালঙ্কার। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও পরে বি.এল. পাশ করে ১৮৮৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। পরে ১৮৯১-তে রিপন কলেজের অধ্যক্ষ হন ও ১৯০৩-এ অবসর গ্রহণ করেন। কোঁৎ-এর দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন।

তাঁর 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' ও 'বিচিত্রবীর্য্য' অপরিণত বয়সের রচনা হলেও তাঁর প্রতিভার পরিচয়বাহী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

১৪. 'On the life and character of Oliver Cromwell'-প্রবন্ধ ঃ এই প্রবন্ধটি লেখার একটা পটভূমি আছে। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে একটি ধারাবাহিক বক্তৃতার অয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে চন্দ্রনাথ ঐ ধারায় চতুর্থ বক্তৃতাটি দেন ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭ সালে। বিষয় ছিল ঃ An essay on the life and character of Cromwell' প্রবন্ধটি রচনায় প্রেসিডেন্সির ইতিহাসের সুখ্যাত অধ্যাপক 'লব্'-এর হাত ছিল। এটি পরে 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ও পরে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ছাপা হয়েছিল।

১৫. বঙ্গদর্শনের সূচনা ঃ ১২৭৯-এর বৈশাখ অর্থাৎ ১৮৭২-এর এপ্রিল বঙ্গদর্শনের সূচনা।

১৬. ক্যালকাটা রিভিউতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সমালোচনা ঃ ক্যালকাটা রিভিউ-র ১৮৭৯-এর ১৩৭ সংখ্যায় (পৃ. ১৯ XIX–২৪, XIV) কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। (Calcutta Review, 1879, No. 137, p. XIX-XXIV)

১৭. তখন বঙ্গদর্শন ...... সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে" ঃ ঠিকই বলেছেন লেখক। ১২৮৭-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে চন্দ্রনাথ বসুর 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'-এর ধারাবাহিক সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৮৭-এর বৈশাখ থেকে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক। পুরো এক বছর বন্ধ থাকার পর 'বঙ্গদর্শন' আবার প্রকাশিত হল।

১৮. বঙ্গদর্শনে "অভিজ্ঞান শকুন্তল"

১২৮৭ এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অভিজ্ঞান শকুন্তল / এক : ইহার নাটকত্ব (প্রবন্ধ)
আষাঢ় সংখ্যায় " / দুই : দুষ্মন্ত—নাটকের চরিত্র (প্র.) পৃ. ১০৮
শ্রাবণ সংখ্যায় চন্দ্রনাথ বসুর লেখা প্রকাশিত হয়নি।
ভাদ্র সংখ্যায় অভিজ্ঞান শকুন্তল /তিন : শকুন্তলা-নাটকের চরিত্র (প্র.)
আশ্বিন সংখ্যায় " /চার : দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা (প্র.) পৃ. ২৬৫
কার্তিক সংখ্যায় " /পাঁচ : ইহার অর্থ (প্র.) পৃ. ৩০২
অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কোনো লেখা নেই।
পৌষ সংখ্যায় অভিজ্ঞান শকুন্তল /ছয় : অন্যান্য ব্যক্তিগণ (প্র.) পৃ. ৩৯৫
১২৮৮ এর আষাঢ় সংখ্যায় আবার লেখা দেখছি ঃ
অভিজ্ঞান শকুন্তল /সাত : ইহার গল্প (প্র.) পৃ. ৯৭।

দেখা যাচ্ছে, মোট সাতটি কিস্তিতে চন্দ্রনাথ বসুর 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধগুলি পরে সংশোধিত হয়ে 'শকুন্তলা তত্ত্ব' নামে ১২৮৮ (১১ নভেম্বর, ১৮৮১)-তে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।

১৯. হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (—১৯০৬) ঃ জন্ম ২৪-পরগনার মজিলপুর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিয়ন্ত্রণে ও কালীপ্রসন্ন সিংহের অর্থানুকূল্যে বাংলাভাষায় অনূদিত মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডী, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি সম্পাদনা ছাড়াও ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

['চন্দ্রনাথ বসু' সম্পর্কিত নানা তথ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৮ম)" এবং করুণাময় মজুমদার রচিত 'চন্দ্রনাথ বসু ঃ জীবন ও সাহিত্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া।]

বটকৃষ্ণ পাল

১. **গন্ধবণিক সম্প্রদায় ও বটকৃষ্ণ পালের পূর্বপুরুষ** : সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন গন্ধবণিক সম্প্রদায় চারটি আশ্রমে বিভক্ত (১) দেশ (২) শঙ্খ (৩) আবট ও (৪) সত্রীশ (অপভ্রংশ) ছত্রিশ। কলিকাতা উপনগর এবং গঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিমতীরবর্তী গন্ধবণিকগণ 'সত্রীশ' শ্রেণিভুক্ত। শিবপুরে দীর্ঘদিন পাল উপাধিধারী গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের বাস। যদিও এই পালেরা দীর্ঘদিন শিবপুরে বাস করছেন—তাদের মধ্যে বৈদ্যনাথ পালের নামই প্রথম মোটামুটি ভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

২. **বটকৃষ্ণ পালের জন্ম ঃ** বটকৃষ্ণ পালের জীবনী লেখক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সাধু বটকৃষ্ণ পাল' জীবনী গ্রন্থে বটকৃষ্ণের জন্ম সাল লিখেছেন ১৮৩৫। জলধর সেন বলেছেন ১৮৩৩, সংসদ বাঙলা চরিতাভিধানেও ১৮৩৫ উল্লিখিত। তাই বটকৃষ্ণের জন্মের সাল ১৮৩৫ ধরা সঙ্গত।

৩. **রামকুমার দের মসলার দোকান** : বটকৃষ্ণের মাতুল রামকুমার দে মহাশয়ের একটি মসলার দোকান ছিল। বটকৃষ্ণের জীবনীলেখক জানিয়েছেন, "বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর রমানাথ ঠাকুর, বাবু গোপাললাল ঠাকুর ও বাবু মদনগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এখান হইতেই লইতেন।"

৪. **অহিফেনের দোকানে কাজ সংগ্রহ করিয়া লইলেন** : তথ্যটি সত্য নয়। তিনি নিজেই চিৎপুর রোডে একটি অহিফেনের দোকান খোলেন।

৫. **সাতখানি বাটিতে** :

বটকৃষ্ণপালের জীবনী গ্রন্থ থেকে এই তথ্যগুলি পাওয়া গেছে :

১. ১২০/১২১ নং খেংরাপটী স্ট্রিট (একতল)—	৪৪৮	বর্গফিট
২. ৭ নং বনফিল্ড লেন (দ্বিতল)	১৩৯২০	বর্গফিট
৩. ১২ নং বনফিল্ড লেন (ত্রিতল)	৪৮,২৭৬	বর্গফিট
৪. ১৩ নং বনফিল্ড লেন (ত্রিতল)	৬১,৮১৮	বর্গফিট
৫. ১৬/১৭ চীনা বাজার লেন (ত্রিতল)	২০,৮৪০	বর্গফিট

৬. ৩০ নং শোভাবাজার স্ট্রিট (ত্রিতল) ১৭,৭০০ বর্গফিট
৭. ১৮ নং শশিভূষণ সুর লেন (দ্বিতল) ৬,৬০০ বর্গফিট
১৬৯, ৪০২ বর্গফিট

সূত্র-'আদর্শ বণিক বটকৃষ্ণ পাল'। কলকাতা ১৩২১। পৃ. ১০। এছাড়া কোথায় কি কি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল তারও পরিচয় দেওয়া হোল :

১৬/১৭ নং চীনাবাজার লেন (বর্তমানে সিনাগগ স্ট্রিট)

১. আমদানী গুদাম—নিম্নতল ও দ্বিতীয়তল।

২. মুদ্রা যন্ত্র গুদাম—নিম্নতল ও দ্বিতীয়তল।

৩. দন্তচিকিৎসা ও নূতন দাঁত বাঁধাই—প্রথমতল।

৪. এদেশীয় ঔষধপ্রস্তুত বিভাগ (Dept. of Indigenous Drugs) :

৫. যন্ত্রসংস্কার (Instrument repairing) বিভাগ :

(ঘুঘুডাঙার বাগানের কাছে বীরপাড়া লেনে ফ্যাক্টরি।)

৬. রিসার্চ ল্যাবোরেটরি—১৮ শশিভূষণ লেনের বাড়িতে।

৭. চক্ষু চিকিৎসা ও চশমা বিভাগ ১৩ নং বনফিল্ড লেনের একাশ।

৬ **দমদমাস্থ বাগানবাটীতে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা** : এটি ঘুঘুডাঙায় অবস্থিত।

৭ **কবিরাজি ওষুধের দোকান** : এটি ৯২ নং সভাবাজারের কতক অংশ।

এছাড়াও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিভাগ-১২নং বনফিল্ড লেনের কতক অংশ এবং ৯২ নং সভাবাজার স্ট্রীটস্থ বাটীর পশ্চিমাংশের নিম্নতলের কতক অংশ। পশুচিকিৎসা বিভাগ, পেটেন্ট বিভাগ, পেটেন্ট ঔষধ বিভাগ ছিল।

৮. **পঞ্জিকা প্রকাশ ও বিতরণ** : 'সাধু বটকৃষ্ণ পাল' গ্রন্থে তাঁর জীবনীলেখক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকেও সেই পঞ্জিকা ক্রয় করিতে হয় দেখিয়া ধর্মগতপ্রাণ বটকৃষ্ণ মনস্থ করিলেন যে নিজ ব্যয়ে যোগ্য লেখক দ্বারা বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রস্তুত করাইয়া মুদ্রাঙ্কণ পূর্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন।...প্রথমে দশহাজার. পরে বিশহাজার, তারপর ত্রিশহাজার এবং শেষ পঞ্চাশ হাজার পঞ্জিকা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া সাধারণ্যে অভেদে বিতরণ করিতে থাকেন। ......এটি কেবল ক্ষুদ্রাকার দিন-পঞ্জিকা নহে, আকার বৃহৎ এবং হিন্দুর প্রয়োজনীয় সকল তথ্য এবং সর্বপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ।" (সাধু বটকৃষ্ণ পাল—পৃ. ১২৯—১৩০)

৯. **গন্ধেশ্বরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা** : বটকৃষ্ণ পালের জীবনীকার জানিয়েছেন "কলকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী বিখ্যাত কামারপাড়া গ্রামে পূতসলিলা সুরধুনী তীরে উপযুক্ত জমি তাঁহার হস্তগত হয়। সেই জমিতে পূর্বে এক সাধুর আশ্রম ছিল। সেই পবিত্রস্থানে গঙ্গাসৈকতের উপর সাধু বটকৃষ্ণ এক মন্দির নির্মাণ করাইয়া ১৩২০ সালের কোজাগরী পূর্ণিমার দিন সেই মন্দির মধ্যে বৈশ্য গন্ধবণিকজাতির কুলদেবী গন্ধেশ্বরী প্রতিমা সমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিমাখানি জয়দুর্গার প্রতিমূর্তি। শ্বেতপাষাণ নির্মিত চতুর্ভুজা

শঙ্খচক্র বরাভয়ধারিণী, সিংহবাহিনী। প্রতিমা সুযোগ্য ভাস্করের দ্বারা খোদিত হওয়ায় পরম সুন্দর মূর্তি হইয়াছে।"

১০. **বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা** : 'সাধু বটকৃষ্ণ পাল' গ্রন্থে লেখক বলেছেন, "স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পল্লীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, যাহাতে তাহা স্থায়ী ও উন্নতি প্রাপ্ত হয়, সেজন্য সতত সৎ পরামর্শদান ও আবশ্যকমত অর্থসাহায্য করিতেন। আহিরীটোলায় রামকালী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তিনি অতীব আনন্দের সহিত তাঁহর উন্নতিকল্পে সাহায্য দান করিয়া আসিতেছেন। উভয় বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে তিনি পদক এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি দান করিয়া উৎসাহ বর্ধন করিতেন।" (সাধু বটকৃষ্ণ পাল—পৃ. ২৩৯)

১১. **অন্নসত্র ও টোল প্রতিষ্ঠা** : বটকৃষ্ণের জীবনীকার কাশীধামে অন্নসত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, পল্লিগ্রামের কথা কিছু লেখেননি। তিনি শেষ বয়সে কাশীধামে ছিলেন ও সেখানে একটি অন্নসত্র স্থাপন করেছিলেন। জীবনীকার জানিয়েছেন, "তিনি কাশীস্থ স্বীয় বৃহৎ আবাসে একটি অন্নসত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে অন্তত পঞ্চদশটি ব্রাহ্মণ ছাত্র তথায় যথোপযুক্ত আহারাদি প্রাপ্ত হইয়া, অধ্যাপকগণের নিকট বেদ শিক্ষা করিতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থা করেন। আহারাদির অভাবে যাহাতে ব্রাহ্মণ বেদ পাঠার্থী ছাত্রগণের কোন অসুবিধা না ঘটে, সে বিষয়ের সুচারু ব্যবস্থা করিতেও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে তদীয় পুত্রগণও সেই ব্যবস্থা মতো কার্য পরিচালিত করিয়া, পিতৃকীর্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।" (সাধু বটকৃষ্ণ পাল—পৃঃ ২৪০-২৪১)

১২ **কলকাতায় টোল প্রতিষ্ঠা** : 'সাধু বটকৃষ্ণ পাল' নামক গ্রন্থে তাঁর লেখক জানিয়েছেন, "সেই সময়ে—রামলাল স্মৃতিতীর্থ নামক স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেনিয়াটোলা পল্লীতে বসবাস ও একটি টোল স্থাপনের জন্য সাধু বটকৃষ্ণের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলে, তিনি সানন্দে প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন।"

খাজে আবদুল গনি, নওয়ার

জন্ম ঃ ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়।

১৮৬৯-এ সিয়া সুন্নি সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ তাঁর হস্তক্ষেপে বন্ধ।

১৮৭৫-এ ঢাকা শহরে পরিশ্রুত জলের কল স্থাপন

১৮৬৬-এ অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য।

১৮৬৭-এ গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্য।

১৮৬৯-এ সি. এস. আই/১৮৭১-এ নয়।

১৮৭৫-এ তাঁকে ও তাঁর পুত্র আসানুল্লাকে একসঙ্গে নওয়ার (নবাব) উপাধি দান।

		প্রিন্স ওয়েলস্ (পরে ৭ম এডওয়ার্ড) কর্তৃক পদক দ্বারা ভূষিত।
	১৮৮৬-এ	কে.সি. আই. ই উপাধি লাভ
মৃত্যু ঃ	১৮৯৬	এর ২৪ আগস্ট/১৩০৩ বঙ্গাব্দে ১৩০৮ এ নয়।

জানা যায় মোট ২১৫টি স্থানে তিনি দান করেন। এই সমুদয় দানে তাঁর অর্থের পরিমাণ প্রায় আট লক্ষ টাকা।

(উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'চরিতাভিধান' গ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন স্থানে দানের বিস্তৃত উল্লেখ আছে।)

মতিলাল ঘোষ

শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১০.১.১৯১২) : যশোহরে পলুয়ামাগুরায় জন্ম। কিছুকাল কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সংবাদদাতা ১৮৫৯-৬০ হিসেবে বহু নীলকর বিরোধী সংবাদ পরিবেশন করেন। কলকাতায় প্রেসের কাজ শিখে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে নিজগ্রামে স্থাপন করেন। এরপর অগ্রজ বসন্তকুমার ঘোষ সম্পাদিত পাক্ষিক 'অমৃত প্রবাহিণী' পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেন। পিতার মৃত্যুর পর শিক্ষকতা বৃত্তি ও পরে কিছুকাল ডেপুটি ইনস্পেক্টার অব্ স্কুলস হন। পরে ১৮৬৮ এর ২০ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক অমৃতবাজার প্রকাশ করেন। এটি প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হোত। পরের বছর এটি ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক রূপে প্রকাশিত হয়। সপরিবারে কলকাতায় চলে এলে ১৮৭১ থেকে কলকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮৭৮ এর ১৪ মার্চ লর্ড লিটনের Vernacular press act পাশ হবার পর এটি ইংরেজিতে (সাপ্তাহিক) প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৯১ এর ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে এটি দৈনিক পত্রে পরিণত হয়।

শিশিরকুমার ঘোষ রচিত কয়েকটি গ্রন্থ

১. সর্পাঘাতের্ চিকিৎসা (১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮), ৩৮ পৃ.

২. সঙ্গীত শাস্ত্র। ইং ১৮৬৯

৩. নয়শো রূপেয়া (প্রহসন)। ১২৭৯ সাল (ইং ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩)। ৮৭ পৃ. ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনীত।

৪. বাজারের লড়াই (প্রহসন)। ১২৮০ (১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪)। ৩৪ পৃ. ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত।

৫. শ্রীনরোত্তম চরিত। ১৬ জুলাই ১৮৯১? ১৯২ পৃ.

৬. শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ঃ

১ম খণ্ড—১ ডিসেম্বর ১৮৯২/ ২২৮ পৃ.

২য় খণ্ড—২২ মার্চ ১৮৯৩/ ৩৫২ পৃ.

৩য় খণ্ড—৫ আগস্ট ১৮৯৪/ ৩০৬ পৃ.
৪র্থ খণ্ড—২৭ জুন ১৮৯৬/ ২৭৭ পৃ.
৫ম খণ্ড—২ ডিসেম্বর ১৯০১/১৩০৮/ ২৩৬ পৃ.
৬ষ্ঠ খণ্ড—৮ মার্চ ১৯১১/১৩১৭/ ২৮৭ পৃ.

৭. শ্রীকালাচাঁদ গীতা (কাব্য)। ১৩০২ (১ মার্চ ১৮৯৬)। ২৩২ পৃ. প্রভৃতি।

১. পত্রিকা সম্পাদনা :

ক. শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (পাক্ষিক)। ৩য় সংখ্যার প্রকাশকাল ১ চৈত্র, ৪০৫ চৈতন্যাব্দ (ইং ১৮৯০)। পরে এটি পাক্ষিক থেকে মাসিক পত্রে পরিণত হয়। কয়েক বৎসর পরে এটি সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকার সহিত মিলিত হয়ে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা' নামধারণ করে। ১৩২৮ এর ২৯-এ ফাল্গুন থেকে এর নবপর্যায় রূপে দৈনিক আনন্দবাজার নামে প্রকাশিত হয়েছে।

খ. শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (মাসিক)। ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল ফাল্গুন ৪১৬ গৌরাব্দ (ইং ১৯০১)।

গ. Hindu spiritual magazine : পরলোকতত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্র প্রথম সংখ্যার প্রকাশ মার্চ ১৯০৬।

২ মতিলালকে লইয়া তাহারা আটভাই : আট ভাইয়ের নাম হোল :

(১) বসন্ত (২) হেমন্ত (৩) শিশির (৪) মতিলাল (৫) হীরালাল (৬) রামলাল (৭) বিনোদলাল (৮) গোপাল লাল।

৩. **'অমৃত প্রবাহিণী' ও বসন্তকুমার ঘোষ** : অগ্রজ বসন্তকুমার ও অনুজ শিশিরকুমার দেশবাসীকে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য একটি সংবাদপত্র প্রকাশের মনস্থ করেন। শিশিরকুমার কলকাতায় একটি ছাপাখানার মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অমানুষিক পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যেই অক্ষর সাজানো, কম্পোজ করা থেকে শুরু করে ফর্মা ছাপানো পর্যন্ত সব কাজ একরূপ শিখে নিলেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৩২ টাকায় সরঞ্জাম সহ একটি কাঠের পুরাতন প্রেস কিনে নৌকাযোগে যশোরে পাঠান। গ্রামস্থ ছুতারের সাহায্যে মুদ্রাযন্ত্রটি মেরামত করে এবং গ্রামের যুবকদের মুদ্রণকর্ম শিক্ষা দিয়ে ছাপার কাজ শুরু হয়। মাতা অমৃতময়ী নামটি অনুসরণ করে মুদ্রাযন্ত্রটির নাম রাখা হয় 'অমৃতপ্রবাহি যন্ত্র' এবং প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকাটির নাম রাখা হয় 'অমৃতপ্রবাহিণী'। প্রকাশকাল ১৮৬২ এর ডিসেম্বর মাস। পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি। 'পঞ্চপুষ্প' আশ্বিন ১৩৩৭-এ মৃণালকান্তি ঘোষ পত্রিকাটির জন্মবৃত্তান্ত জানিয়েছেন। আর সোমপ্রকাশ (১২ জানুয়ারি ১৮৬৩) পত্রিকাটির যথেষ্ট প্রশংসা করে স্বাগত জানিয়েছিল।

৪. **বহুবাজারে হিদারাম ব্যানার্জির গলিতে** : ১৮৭৪ এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত অমৃত বাজার বউবাজারের হিদারাম ব্যানার্জির গলি থেকে প্রকাশিত হতো।

৫. **বাগবাজারে স্থানান্তরিত হয়** : পরে পত্রিকা অফিস বাগবাজারে স্থানান্তরিত হয়। বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জির লেন থেকে পত্রিকা ২ এপ্রিল প্রকাশিত হতে শুরু করে। তবে পত্রিকাটি বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১. **যশোহরের কুমীয়া গ্রামে** : মতান্তরে খুলনা জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) কুমিরা গ্রামে হরপ্রসাদের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ (মৃত্যু আনুমানিক ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে) পলাশির যুদ্ধের পর কুমিরা গ্রাম ছেড়ে ২৪ পরগণার জেলার নৈহাটিতে এসে বসবাস শুরু করেন। তবে কুমীয়া নয়, কুমিরা গ্রাম।

২. **হরপ্রসাদের জন্ম** : ১৮৫৩ এর ৬ ডিসেম্বর (বাংলা ২২ অগ্রহায়ণ, ১২৬০ বঙ্গাব্দ) মঙ্গলবার ষষ্ঠী তিথিতে।

৩. **পিতার পঞ্চম পুত্র** : হরপ্রসাদের পিতার নাম ছিল রামকমল ন্যায়রত্ন ও মাতা চন্দ্রমণি। রামকমলের ছয় ছেলের মধ্যে বড় নন্দকুমার ও ৫ম শরৎনাথ। শিবের দয়ায় কঠিন অসুখ থেকে বেঁচে ওঠায় নাম রাখা হয় হরপ্রসাদ।

৪. **হরপ্রসাদের পিতার গঙ্গালাভ** : ১৮৬১ তে রথের পর অমাবস্যার দিন পিতা রামকমলের মৃত্যু হয়।

৫ **নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু** : মৃত্যু ১৮৬২ তে।

৬ **সংস্কৃত কলেজে ভরতি** : ১৮৬৬ তে সংস্কৃত কলেজের ৭ম শ্রেণিতে ভরতি হন হরপ্রসাদ।

৭ **১৮৭১-এ সংস্কৃত কলেজ থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় ১১শ স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ।**

৮. **এফ. এ. পরীক্ষা** : এই পরীক্ষায়ও তিনি ১৯তম স্থান অধিকার করেন।

৯. **বি.এ. পরীক্ষায় কোনো বৃত্তি পান নাই** : এই তথ্যটি কিন্তু ঠিক নয়। ১২৭৬-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সি কলেজে বেশি দিন পড়ায় তাকে ঐ কলেজ থেকে পাশ বলে গণ্য করা হয়। তিনি সংস্কৃতে প্রথম হওয়াতে প্রতি মাসে ৫০.০০ টাকা 'সংস্কৃত কলেজ গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ', ও ২৫ টাকা 'লাহা স্কলারশিপ' এবং রাধাকান্ত দেব মেডেল পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় বি.এ. পড়ার সময় 'ভারত-মহিলা' প্রবন্ধ লিখে 'হোলকার পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রবন্ধ ছিল 'সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট সব নারীদের চরিত্র বিশ্লেষণ' এটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই লেখাটি তিনি **বঙ্গদর্শনের** ১২৮২ এর মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় ছাপেন।

১০. **সংস্কৃত কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম ও 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ** : ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতে এম. এ. তে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন।

১১. **হেয়ার স্কুলে যোগদান** : ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি হেয়ার স্কুলের হেডপণ্ডিত নন ট্রানস্লেশন মাস্টার রূপে যোগ দেন। বিবাহ হয় ১৮৭৮ এর ১৮ মার্চ। মার মৃত্যু কয়েকদিন পরেই। ১৮৮১ তে নয়।

১২. **লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ** : ১৮৭৮ এর সেপ্টেম্বরে ১৩ মাসের ছুটি নিয়ে লক্ষ্ণৌ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে যোগদান।

১৩. **একবছর পর সংস্কৃত কলেজে যোগদান :** তথ্যটি সত্য নয়। ১৮৮৩ তে রামনারায়ণ তর্করত্ন অবসর গ্রহণ করলে ঐ পদে হরপ্রসাদকে নেওয়া হয়। অর্থাৎ 'Asstt professor of Rhetoric & Grammar...on 25th January 1883.

১৪. **বাংলা গভর্নমেন্টের সহকারী অনুবাদকের পদে :** অর্থাৎ ১৮৮৩ এর ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সরকারের অনুবাদ বিভাগে সহকারী অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হন।

১৫. **১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ....:** ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে নয়, ১৮৯৫ এর ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত করা হয়। এবং তাঁরই চেষ্টায় ঐ কলেজে সংস্কৃতে এম.এ. পড়ানোর ব্যবস্থা হয় ১৮৯৬ থেকে।

১৬. **১৯০০ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল :** ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও বাংলাদেশে সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন।

১৭. **১৯০৮ এ সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ :** দেখা যাচ্ছে হরপ্রসাদ ১৯০৮ এর নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঐ দিনই সরকার তাঁকে 'ব্যুরো অব ইনফরমেশন (Bureau of Information' নামক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—"for the benefit of civil officers in Bengal, in History, religion, Custom and folk -lore of Bengal...." এবং এই বছরেই তাঁর স্ত্রী পরলোকগমন করেন।

১৮. **বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা** (Bibliotheca Indica) **প্রকাশের দায়িত্ব :** ১৮৯২ তে এশিয়াটিক সোসাইটিতে জয়েন্ট ফিলোলজির সেক্রেটারি নিবাচিত হন এবং 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার সংস্কৃত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক হন।

১৯. **"সোসাইটির পুথিবিভাগের প্রধান পরিচালক"**—'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' গ্রন্থের লেখক অলোক রায় বলেছেন "এশিয়াটিক সোসাইটিতে হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের সহকারী হিসেবে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন (সম্ভবত ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে)। The Sanskrit Buddhist literature of Nepal গ্রন্থের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল হরপ্রসাদের কাছে বিশেষ ঋণস্বীকার এবং অশেষ প্রশংসা করেছেন। সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ ও তালিকা সম্পাদনের কাজ রাজেন্দ্রলালের অবর্তমানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপরই এসে পড়ে।" (প্রস্তাবনা অংশ পৃ. ১৬) এই সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন, "'The Number of Collection stands at present at 11,264; of these 3,156 were Collected by my illustrious predecessor Raja Rajendra Lal Mitra, LL. D., C. I. E., and the rest by my humble self"—H.P. Sastri—preface, 'A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Goverment collection under the care of Asiatic society', ১ম খণ্ড.

· পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল ও হরপ্রসাদের মধ্যে তুলনাসূত্রে মন্তব্য করেছেন, "আমার মনে এই দুইজনের চরিত্র চিত্র মিলিত হয়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল

বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণির। উভয়ের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে কোনো বিষয়ই তাদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন করে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল।"—'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' "হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা"—দ্বিতীয়ভাগ (১৩৩৯)

২০. **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য, সহকারী সভাপতি ও সভাপতি** : ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ (২ চৈত্র ১৩০৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

সহকারী সভাপতি : ১৩০৪-১৩০৯, ১৩১৮-১৩১৯, ১৩২৩-১৩২৬, ১৩৩১, ১৩৩৭-১৩৩৮/ অর্থাৎ ১৪ বছর নয় ১৫ বছর

সভাপতি : তিনি তেরো বৎসর পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৩২০-২২, ১৩২৬-৩০, ১৩৩২-৩৬

২১. **বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র (১৭.১২.১৮৪৮-১৯১৭)** : প্রসিদ্ধ আইনজীবী, গ্রন্থকার, বিদ্যানুরাগী ও ভারততত্ত্বে সুপণ্ডিত। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ওকালতি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯০২-০৩ প্রথমে অস্থায়ী বিচারপতি ও পরে ১৯০৪-এ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করলে তিনি ঐ পদে স্থায়ী হন। পরে ১৯০৮-এ বিচারপতির পদ ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে বিদ্যাচর্চায় মন দেন। 'বিদ্যাপতির' 'সটীক সংস্করণ', 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' 'ভারতরত্নমালা' তাঁর বিদ্যানুরাগের পরিচয়বাহী। তিনি কলকাতায় আর্য বিদ্যালয় বা সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯০-এ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রকাশে সাহায্য করেন। হরপ্রসাদের সঙ্গে তিনি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের বিবরণ সংগ্রহ করেন।

২২. **চারবার নেপাল গমন** : ১ম বার ১৮৭৯ এর মে মাসে, দ্বিতীয়বাব ১৮৯৮ এর ডিসেম্বর, তৃতীয়বার ১৯০৭-এ এবং চতুর্থ ও শেষবার ১৯২২-এ।

২৩. **বিলাতে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্য ১৯১২** : এটি ১৯১২ না হয়ে ১৯২১ হবে। এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩২৯/১৯২২-এ তাঁকে সংবর্ধনা দেন।

২৪. **বঙ্গদর্শনে 'বাল্মীকির জয়' প্রকাশ** : 'বঙ্গদর্শনের' সপ্তম বর্ষের ৯ম সংখ্যা অর্থাৎ ১২৮৭ এর পৌষে অর্থাৎ ১৮৮০-এর ডিসেম্বর-এ হরপ্রসাদের 'বাল্মীকির জয়' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তির প্রকাশ ঘটে। মাঘ সংখ্যায় ২য় ও ৩য় খণ্ড, চৈত্র সংখ্যায় চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়। পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে। এই প্রকাশের পর স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন- এর ১২৮৮ এর আশ্বিন সংখ্যায় নিজেই বইটির সমালোচনা করেন।

২৫. **হরপ্রসাদের 'কাঞ্চনমালা'র প্রকাশ বঙ্গদর্শনে** : 'বঙ্গদর্শন'-এর নবম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮৯ এর আষাঢ় অর্থাৎ ১৮৮২ এর জুন মাসে এই সংখ্যায় হরপ্রসাদের কাঞ্চনমালা (১ম খণ্ড—এক—২য় পরিচ্ছেদ), শ্রাবণ সংখ্যায় দ্বিতীয় খণ্ডের

(এক—ছয় পরিচ্ছেদ) এবং তৃতীয় খণ্ডের (এক—তিন পরিচ্ছেদ) ভাদ্র সংখ্যায় ৮তুর্থ খণ্ডের (এক—দুই পরিচ্ছেদ) আশ্বিনে পঞ্চম খণ্ডের (এক—পাঁচ পরিচ্ছেদ) ষষ্ঠ খণ্ডের এক—নয় পরিচ্ছেদ, কার্তিক সংখ্যায় সপ্তম খণ্ডের (এক থেকে ছয় পরিচ্ছেদ) অগ্রহায়ণ সংখ্যায় অষ্টম খণ্ডের (এক—তিন পরিচ্ছেদ) নবম খণ্ডের (এক—চারপরিচ্ছেদ) পৌষ সংখ্যায় দশম খণ্ডের এক—সাত, একাদশ খণ্ডের (এক থেকে—তিন পরিচ্ছেদ) মাঘ সংখ্যায় দ্বাদশ খণ্ডের (এক—চার) ত্রয়োদশ খণ্ডের (এক থেকে ছয়) চতুর্দশ খণ্ডের (এক—ছয়) এখানেই 'কাঞ্চনমালার' প্রকাশ শেষ। পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

২৬. **মেঘদূত ব্যাখ্যা** : বঙ্গদর্শন ১২৮৯ বর্ষের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় 'মেঘদূত' প্রকাশিত হয়। এটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অনূদিত 'মেঘদূত' সমালোচনা উপলক্ষে রচিত। যক্ষপত্নীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে কিছুটা অশ্লীলতা এসেছে বটে তবে খুব আপত্তিকর বলে মনে হয় না।

২৭। **ভারতবর্ষের ইতিহাস** : তিনি "ভারতবর্ষের ইতিহাস" সম্পর্কিত দুটি পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন। একটি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস/প্রাচীন আর্য্য হইতে লর্ড ল্যান্সডাউন পর্যন্ত'। ১৩০১ (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫)। ৩৩৬ পৃ.

দ্বিতীয় : প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস। ১৩১৮ (১৯১২)। পৃঃ ১৮৮। এটি পরে 'প্রাথমিক ভারতবর্ষের ইতিহাস (পৃঃ ২০০) নামে পরিবর্তিত আকারে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২৮. **'নারায়ণ' পত্রিকায় হরপ্রসাদের 'বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধটি** : পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বৌদ্ধধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'নারায়ণ' পত্রিকার প্রকাশের প্রথম সংখ্যা থেকেই বেরিয়ে ছিল। 'নারায়ণ' পত্রিকার প্রকাশ ১৩২১ এর অগ্রহায়ণ মাসে। এই অগ্রহায়ণ সংখ্যা সহ পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র সংখ্যায়, ১৩২২ এর আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র, আশ্বিন, পৌষ, মাঘ, চৈত্র, ১৩২৩ এর শ্রাবণ, কার্তিক, মাঘ, চৈত্র, এবং ১৩২৪ এর বৈশাখ, অর্থাৎ ১৬টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১. **জনা** ঃ গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক (১৮৯৪)। প্রথম অভিনয়ের দিন ৯ পৌষ, ১৩০০।

২ **পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস** ঃ পৌরাণিক নাটক প্রথম অভিনয়, ১ মাঘ ১২৮৯।

৩ **বলিদান** ঃ সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক। প্রকাশকাল ১৩১২।

৪ **প্রফুল্ল** ঃ গিরিশচন্দ্রের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্ত নাটক। ১৮৮৯।

৫ **শাস্তি কি শান্তি?** সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক। প্রকাশকাল ১৩১৫।

৬ **গৃহলক্ষ্মী** ঃ গিরিশচন্দ্রের অসমাপ্ত রচনা।

৭ **সধবার একাদশী** ঃ দীনবন্ধুর বিখ্যাত প্রহসন। প্রকাশকাল ১৮৬৬।

৮. **ন্যাশনাল থিয়েটার** ঃ ১৮৭২ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে দ্বিতীয় সাধারণ রঙ্গালয় বা পাবলিক থিয়েটার বা ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হোল।

৯. **স্টার থিয়েটার ঃ** স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গুর্মুখ রায় নামে এক তরুণ যুবক। তিনি মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটের জমিতে এক নূতন নাট্যশালা নির্মিত হোল। গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়েই ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন ঘটে। ১৮৮৭ এর ৩১ জুলাই স্টার-এ শেষ অভিনয় হয়।

১০. **এমারেল্ড থিয়েটার ঃ** স্টার থিয়েটারের বাড়িটি গুর্মুখ রায় ছেড়ে দিলে এই বাড়িতেই গোপাললাল শীল এমারেল্ড থিয়েটার নাম দিয়ে তার নূতন থিয়েটার খুলে বসলেন। বৈদ্যুতিক আলোর অভাব মেটানোর জন্য গোপাললাল ডায়নামো দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করলেন। ১৮৮৭-এর ৮ অক্টোবর কেদার চৌধুরীর লেখা পৌরাণিক নাটক 'পাণ্ডব নির্বাসন' দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটারের উদ্বোধন হোল। এটি ১৮৯৬ পর্যন্ত অর্থাৎ দশ বছর ধরে চলেছিল।

১১. **মিনার্ভা থিয়েটার ঃ** প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে ও গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে ৬নং বিডন স্ট্রিটে মিনার্ভা থিয়েটারের পত্তন হোল। প্রথমে নামকরণ ব্যাপারে তিনটি নাম প্রস্তাবিত হয়—ক্লাসিক, মিনার্ভা ও আনন্দময়ী। কিন্তু সবার সম্মতিতে মিনার্ভা নামটি গৃহীত হয়। ১৮৯৩-এর ২৮ জানুয়ারি গিরিশচন্দ্রের অনূদিত নাটক 'ম্যাকবেথ' দিয়ে এই থিয়েটার প্রথম খোলা হয়। ১৯০৫ পর্যন্ত এটি চলেছিল।

১২. **ম্যাকবেথ ঃ** গিরিশচন্দ্রের অনূদিত নাটক। প্রকাশকাল ১৩০৬।

১৩. **ক্লাসিক থিয়েটার ঃ** ৬৮ নং বিডন স্ট্রিট থেকে সিটি থিয়েটার বিদায় নেবার পর অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে ১৮৯৭ এর এপ্রিল মাসে ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৭ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত এটি চলেছিল। ১৮৯৭ এর ১৬ এপ্রিল গিরিশ ঘোষের 'নল-দময়ন্তী' ও 'বেল্লিক বাজার' দিয়ে ক্লাসিকের উদ্বোধন।

১৪. **কোহিনূর থিয়েটার ঃ** ক্লাসিক থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে নদিয়া জেলার কুড়ুলগাছির জমিদারপুত্র শরৎকুমার রায় এক লাখ ষাট হাজার টাকায় সেটি কিনে নিয়ে কোহিনূর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৭-এর ১১ আগস্ট ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'চাঁদবিবি' নাটক দিয়ে এই থিয়েটারের উদ্বোধন। এটি ১৯১২ পর্যন্ত চলেছিল।

১৫ **সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ** (দানীবাবু) (১১.১২.১৯৬৮-২৮.১১.১৯৩২) ঃ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ 'দানীবাবু' নামে সমধিক পরিচিত। লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। পরে অভিনয় জগতে ঢুকে পড়েন। কলকাতার প্রায় সব মঞ্চেই অভিনয় করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে সিরাজের ভূমিকায় তাঁর প্রাণমাতানো অভিনয়ে দর্শক সমাজ মোহিত হন। ১৯৯১৮-তে বন্যার্তদের সেবায় দেশবন্ধুর ইচ্ছায় দুর্গেশনন্দিনী নাটকে ওসমানের অভিনয়ে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বিভিন্ন রসের অভিনয়ে তিনি সমান দক্ষতা দেখাতে পারতেন। 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ-এর ভূমিকায় ও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার

১. **ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা :** ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি মেডিক্যাল কলেজ থেকে সসম্মানে এম.ডি. উপাধি লাভ করেছিলেন। অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করতে করতে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ও ঐ প্রণালীতে চিকিৎসা শুরু করেন। ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তিনি 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার ১৮৬৯ এর আগস্ট সংখ্যায় লিখিত একটি প্রবন্ধে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। ১৮৭০ এর ৩ জানুয়ারি এটি 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের ১২২৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় বাংলা অনুবাদসহ বিজ্ঞান-অনুশীলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন।

প্রস্তাবিত বিজ্ঞান সভায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, ও ভূতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা চালানো হবে বলে স্থির হয়। কলেজ স্ট্রিট ও বৌবাজারের মোড়ে একটি বাড়িতে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল এই বিজ্ঞান সভার উদ্বোধন করেন।

১৯৪৬-৫১ ড. মেঘনাদ সাহা সভাপতি থাকা কালে যাদবপুরে বিজ্ঞান সভার নতুন ভবন নির্মিত হয়। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতরাষ্ট্রের সমকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিজ্ঞান সভার নতুন ভবনের দ্বার উন্মোচন করেন। সাধারণের কাছে এটি বর্তমানে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' নামে পরিচিত।

২ **পাইকপাড়া :** শহর হাওড়া থেকে ১৮ মাইল পশ্চিমে।

৩. **পিতার মৃত্যু :** পিতা তারকনাথ সরকারের ৩২ বছর বয়সে মৃত্যু। মহেন্দ্রলাল যখন পাঁচ বছর বয়সের বালক।

৪. **ভ্রাতৃগৃহে :** মহেন্দ্রলালের দু'জন মাতুলের নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ।

৫. **মহেন্দ্রলালের পাঠশালা শিক্ষা :** Sarat Chandra Ghosh রচিত ওরিয়েন্টাল পাবলিশিং কোম্পানি থেকে প্রকাশিত (১৯০৯) Life of Dr. Mahendralal Sarkar M.D. নামক জীবনী গ্রন্থে মহেন্দ্রলালের শৈশব শিক্ষার বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে— "Dr. Mahendra Lal Sarkar reached the rudiments of his vernacular education in a neighbouring pathsala under a gurumahasaya and was afterwards taught the first lesson of the English alphabet by the Late Babu Thakurdas Dey, who was greatly respected by him and to the last moment of his earthly existence. (Page 2-3).

৬. **হিন্দু কলেজ প্রবিষ্ট :** তাঁর জীবনীকার লিখেছেন, "He read in this College till the beginning of 1854, when he became a favourite pupil and won

the good graces of Mr. Sutcliffe, principal and professor of Mathematics and Mr. Jones, prof. of Literature and philosophy. He could have remained a year or two longer in the College which then became the Presidency College. But the ardour of science was so great and he was so eager to be the conversant with the Principles of science that he could not resist the temptation of leaving presidency college and getting admission into the Medical College' (p.3).

৭. **মেডিক্যাল কলেজে ছ'বছর লেখাপড়া ঃ** তিনি মেডিক্যাল কলেজে ছ বছর লেখাপড়া করেছিলেন। এই সময়কাল হোল ঃ ১৮৫৪-৫৫ থেকে ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৮৬০ সালে তিনি এল. এম. এস. পাস করেন (He had to read hard for 6 years in the Medical College from 1854-55 to 1859-60)

৮. **এম. ডি. পরীক্ষা :** ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি এম. ডি. পরীক্ষায় প্রথম হন। দ্বিতীয় হন জগবন্ধু বসু। মহেন্দ্রলাল সরকার দ্বিতীয় এম. ডি.। প্রথম এম. ডি. হলেন ড. চন্দ্রকুমার দে।

৯. **ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখা প্রতিষ্ঠা ঃ** "At the preliminary meeting for the establishment of Medical society as a branch of the British Medical Association, held at the house of the Late-lamented Dr. Chuckerbutty, on the 27th May, 1863, in moving a resolution I made a speech in which I Contemptuously alluded to Homeopathy as one of the various systems quackery.....(p.10)

১০. **তাঁর দৃঢ়মত ছিল ঃ** "I believed his (Dr. Babu Rajinder) cures were affected by the strict Regimen...and not by infinitesimal nothings—globules or drops ;....) (p 13)

১১. **একখানি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ঃ** হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বইটির নাম Morgan's Philosophy of Homeopathy" এবং এটির সমালোচনা করেন' Indian field' পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য।

১২. **একজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ ঃ** Dr. Rajinder Dutt.

১৩. **হোমিওপ্যাথি প্রথায় সত্য নিহিত আছে ঃ** তাঁর জীবনীকার লিখেছেন, "There was truth in the system and that the profession had been doing most fragrant injustice to it by declaring a ban of obstruction to those who had the courage to take to it (p.8)

১৪. **১৮৬৭ এর প্রথম ভাগে ঃ** ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭ তারিখে।

১৫. **১৮৬০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ঃ** এটি ১৮৬০ নয়, ১৮৭০ হবে। বলা হয়েছে" Dr. Sirkar was appointed a fellow of the Calcutta University in 1870 and was placed in the faculty of Arts."

১৬. **'Faculty of Medicine' প্রসঙ্গ :** 'In 1818 he (Mahendra Lal Sarkar) was transferred to the faculty of Medicine. But other members of the Medical Faculty felt strongly about his membership and passed a resolution on 27th. April to remove the name of Dr. Sarkar from the Faculty of Medicine"

১৭. **'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' প্রকাশ :** 'The Calcutta Journal of Medicine' edited by him (Dr. Sarkar), which was a glorious monument to his knowledge of homeopathy was started in January, 1868 with the ostensible object of disseminating the seeds of Homeopathy.... (page-9) "In January 1868 he started editing "Calcutta Journal of Medicine with the sole object of focussing the attention of the people on the Superiority of Homeopathy system over others in many cases."

১৮. **"পর বৎসর এই পত্রিকার এক সংখ্যায়" ১৮৬৯ এর আগস্ট সংখ্যায়** ড. সরকারের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯. **"ভারতীয়গণের বিজ্ঞান চর্চার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা"** "The desirability of a National Institution for the cultivation of physical sciences by the natives of India."

২০. **স্যার সি. ভি. রমন :** জন্ম : নভেম্বর ৭, ১৮৮৮
শিক্ষা : এম. এ., মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়
১৯১৭-৩৩ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক।
১৯২৮ : সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস
১৯৩০ : এ নোবেল পুরস্কার লাভ
১৯৩৩-৪৩ : ডিরেক্টার : ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্গালোর।
১৯৩৪ : সভাপতি, ইন্ডিয়ান অ্যাকাদেমি অফ সায়েন্স।
১৯৪৩ : প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা, রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ব্যাঙ্গালোর
১৯৪৮ : জাতীয় অধ্যাপক।
১৯৫৪ : ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত।
পরলোকগমন : ২১ নভেম্বর, ১৯৭০

২১. **রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম :** মহেন্দ্রলালের জীবনীলেখক S.C. Ghosh লিখেছেন" In the year 1891, he fell a prey to the inroads of malaria and the attack told upon his health so heavily that he was Compelled to go to Baidyanath-Deoghar for change. There he was so much moved by the helpless condition of the lepers that he built an asylum for them

at a cost of more than Rs. 5,000. Sir charles Elliot, the then Lieutenant governor of Bengal, was kind enongh to lay the foundation-stone of that noble asylum in July 1893. It was named after his devoted wife, and now known as the "Rajkumari Leper Asylum".

২২. **মহেন্দ্রলালের সঙ্গীত ঃ** মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রোগযন্ত্রণার মধ্যে ও তিনি বেশ কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সেগুলির দুটি উদ্ধৃত করা হোল ঃ

(১) ভয় করোনা রে মন, দেখে শমন আগমন,
শত্রু নয় সে পরম বন্ধু, তাকে কর আলিঙ্গন।
এসেছে প্রভুর আজ্ঞায়, লয়ে যাইতে তোমায়,
করিতে তোমার সব দুঃখ জ্বালা বিমোচন।
বাঁধা আছ ভূমণ্ডলে, কঠিন মায়ার শৃঙ্খলে,
এসেছে সে কাটিতে, ঐ দারুণ বন্ধন।
দেহ পিঞ্জরের দ্বার করিয়ে উন্মোচন,
দিতে তোমায় সুখময় অনন্ত জীবন।

(২) জীবন ফুরায়ে এলো, তবু ভ্রম ঘুচিলনা।
আলো থাকতে দেখতে পেলেনা, আঁধারে কি করবে বলনা।
জ্ঞানচর্চা অনেক হোল, আসল জ্ঞান না জন্মিল,
পাপেতে নিবৃত্তি, ধর্মে প্রবৃত্তি, (ঈশ্বরে ভক্তি) ভুলেও হোলনা ;
মানব জনম বৃথা গেল, একবার ভাবিলে না,
এখন আর আছে কি উপায়, (সেই)
জগৎ পিতার কৃপা বিনা।
হে কৃপাসিন্ধু, দয়াময় দীনবন্ধু ;
ডাক তাঁরে, প্রাণভরে হয়ে তনমনা.
তরে যাবে অনায়াসে, মুক্তি পাবে অবশেষে,
স্থির থাক সেই আশে, করোনা কোন ভাবনা।।

উপরোক্ত গান দুটি মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত 'ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃ. ৭৫-৭৬

রমেশচন্দ্র দত্ত

১. **বিহারীলাল গুপ্ত (১৮৪৯-১৯১৫) ঃ** প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাত্রা করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে এসে ব্যারিস্টার হন। ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা না থাকা রীতির বিরুদ্ধে তাঁর মনে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে রমেশচন্দ্রের পরামর্শে গভর্নরের কাছে তিনি একটি নোট পাঠান। এই নোটটি সরকারি অনুমোদন লাভ করে

এবং ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইলবার্ট বিল পাশ হলে ভারতীয় বিচারকরা ইউরোপীয়দের বিচার করার ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি কিছুদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। সরকারি কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর বরোদারাজের সেক্রেটারি হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেন।

২. **সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১.৬. ১৮৪২—৯.১. ১৯২৩) ঃ** মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান। হিন্দুস্কুল থেকে এনট্রাস পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। ১৮৫৯ এ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৮৬২-র ২৩ মার্চ লন্ডনে যান ও ১৮৬৪ তে আই. সি. এস. হয়ে দেশে ফেরেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংক্রান্তির দিন (১২.৪. ১৮৬৭) দেশের মানুষকে দেশাত্মবোধে জাগিয়ে তোলার জন্য কলকাতায় বেলগাছিয়ায় 'হিন্দুমেলা'র প্রবর্তন করেন। এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটি তিনি রচনা করেন। ১৩০৭, ১৩০৮-এ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ও তিনি বেশ কয়েকটি ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

৩. **লর্ড রিপন ঃ** ইনি ১৮৮০-৮৪ পর্যন্ত ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী ও ভারতে শাসন প্রক্রিয়ায় ভারতীয়দের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যাপারে পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর শাসনকালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের ওপর ন্যস্ত হয়। লর্ড লিটন যে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন, লর্ড রিপন তা তুলে দেন। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি হান্টার কমিশন গঠন করেন ও তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক সেই মতো ঢেলে সাজানো হয়। শেষে ইলবার্ট বিল নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে প্রবল আন্দোলন শুরু হওয়ার ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর কার্যকাল শেষের আগেই ভারত ছেড়ে চলে যান।

৪. **ইলবার্ট বিল ঃ** বিচার ব্যবস্থায় এদেশীয় ইংরেজরা যা সুযোগসুবিধা ভোগ করতেন, তা দূর করার জন্য লর্ড রিপন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভারতীয় বিচারকরাও যাতে শ্বেতাঙ্গদের অপরাধের বিচার করতে পারেন—সেজন্য তিনি ইলবার্ট বিলের প্রস্তাব দেন। এই বিল নিয়ে ইংল্যান্ডে ও এদেশে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে প্রবল আপত্তি ওঠে। শেষে বিলটি পরিত্যক্ত হয়। এতে ক্ষুব্ধ রিপন তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার আগেই স্বদেশে ফিরে যান।

৫ **লালবিহারী দে (১৮.১২. ১৮২৪—২৮.১০.১৮৯৪) ঃ** বর্ধমানের তালপুকুরে জন্ম। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বাল্য ও কৈশোর কাটে। ১৮৪৩ খিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর প্রভাব প্রবল। 'Folk tales of Bengal' (১৮৪৩) এবং 'Govinda Samanta' (১৮৭৪) তাঁর প্রধান সাহিত্যকীর্তি। প্রথমটি রূপকথার সংকলন ও দ্বিতীয়টি গ্রামবাংলার দৈনন্দিন জীবনের এক সুন্দর আলেখ্য। 'অরুণোদয়' (১৮৫৮) নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' নামে একটি দীর্ঘ উপাখ্যানও প্রকাশ করেন।

৬ **বেঙ্গল ম্যাগাজিন ঃ** ১৮৭২-এর আগস্ট মাসে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' এর প্রথম প্রকাশ। মাসিক এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে। লেখকদের মধ্যে ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, তরু দত্ত প্রমুখ। ১৮৭৫ থেকে কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়ে ও ১৮৮২-এর জুলাই সংখ্যাটি প্রকাশের পর এটি বন্ধ হয়ে যায়।

৭. **'বেঙ্গল ম্যাগাজিন 'ও' বঙ্গসাহিত্য' ঃ** লালবিহারী দে সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় 'বঙ্গসাহিত্য' বিষয়ক যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তারই গ্রন্থরূপ" "The literature of Bengal : By ArcyDae—(এই ছদ্মনামে) প্রকাশিত হয়—১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়া ঐ সময় তাঁর নানা ইংরেজি প্রবন্ধ ও কবিতা 'ARCYDAE' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হোত। (রমেশ রচনাবলী—যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত। সাহিত্যসংসদ, ৩য় সং ১৯৮২)

৮. **বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) ঃ** রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। আকবর কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয় এই উপন্যাসের কথাবস্তু।

৯. **জীবনসন্ধ্যা**—পুরো নাম রাজপুত জীবন সন্ধ্যা (১৮৭৯)। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজপুতদের গোষ্ঠীপ্রীতি ও জ্ঞাতিবিরোধ, দেশপ্রেম, বীরত্ব, প্রভৃতি এই উপন্যাসের মূল উপাদান। উনিশ শতকের জাতীয়তাবোধ ও ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্রেরণা।

১০. **মাধবীকঙ্কণ ঃ** রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৮৭৭।

১১. **সমাজ ঃ** রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় সামাজিক উপন্যাস। প্রকাশকাল—জুলাই ১৮৯৪। পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১৩০০-১৩১১) সনের পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১২. **সংসার ঃ** এটি রমেশচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৮৮৬-এর মাঝামাঝি। বঙ্কিম পরিচালিত 'প্রচার' এ (১২৯২ বঙ্গাব্দে) প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩. **ভারতের ইতিহাস ঃ** এই নামে কোনো বাংলা বই তিনি লেখেননি। তবে তাঁর ইংরেজিতে A History of Civilization in Ancient India (১ম-৩য়) বইটির কথা লেখক সম্ভবত বলেছেন। এর অনুবাদ করেছেন শ্রীনাথ দত্ত। বই তিনটির প্রকাশকাল (১৮৮৯-৯০)।

১৪. **বিলাতভ্রমণ ঃ** বইটির প্রকৃত নাম "Three years in Europe" । প্রকাশকাল ১৮৭২। কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ইওরোপ থেকে লিখিত পত্রগুলির সারাংশ।

১৫. **ঋগ্‌বেদের বাংলা অনুবাদ ঃ** তিনি ঋগ্‌বেদের প্রথম অষ্টকের বঙ্গানুবাদ করেছেন। বইটির প্রকাশকাল ১৮৮৫। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৫০২।

১৬. **History of India :** আসলে বইটির নাম A History of Civilization in Ancient India (vol. I-III), ১৮৮৯-৯০।

১৭. রমেশচন্দ্রের ইংরেজিতে লেখা Mahabharat লন্ডন থেকে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। ম্যাক্সমূলারের ভূমিকা সম্বলিত মহাভারতের সারাংশ ইংরেজি কবিতায় অনূদিত। এবং Ramayana লন্ডন থেকে প্রকাশিত। এটির প্রকাশকাল ১৯০০। এটি ইংরেজি কবিতায় রামায়ণের সারাংশ।

১৮. বইটির প্রকৃত নাম The Economic History of India (1757-1837) লন্ডন থেকে প্রকাশিত বইটির প্রকাশকাল ১৯০২।

১৯. **The Lake of Palms :** ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত। 'সংসার' উপন্যাসের ইংরেজিতে সার-সংকলন।

২০. **'The Slave Girl of Agra'** এটি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর মাধবীকঙ্কণ উপন্যাসের ইংরেজি সার সংকলন।

২১. **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ :** ২৩ জুলাই ১৮৯৩-তে শোভাবাজার ২/২ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার (Bengal Academy of Literature) নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব এর প্রথম সভাপতি। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৭ বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৯৪) এই সভার নাম দেওয়া হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশ চন্দ্র দত্ত। বহু মনীষী এই পদ অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কয়েক বছর সহকারী সভাপতি ছিলেন ও বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন ১৩১৬ তে।

১৩০৩ বঙ্গাব্দে (১৮৯৬) শোভাবাজার থেকে গ্রে স্ট্রিটে পরিষদ উঠে আসে। পরে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আনুকূল্যে বর্তমান ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডে পরিষদ ভবন নির্মিত হয়। ভাড়াটে বাড়ি থেকে পরিষদ নূতন বাড়িতে প্রবেশ করে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ (৪ ডিসেম্বর ১৯০৮)। প্রতিষ্ঠাকালে পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল—(ক) বাংলা অভিধানও ব্যাকরণ প্রস্তুত করা, (খ) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন, (গ) প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও প্রকাশ (ঘ) অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ, (ঙ) ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের চর্চা এবং (চ) 'সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা' নামে পত্রিকা প্রকাশ। বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই শতবর্ষ প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির দান স্মরণীয়।

২২. **রমেশ ভবন :** ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। ঐ বৎসরই ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে পরিষৎ সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্য পরিষদ ভবনটিকে রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবন নামে প্রতিষ্ঠাপিত করার জন্য দেশবাসীর নিকট আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানান। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বরোদার স্বর্গীয় মহারাজ সয়াজীরাও গায়কোয়াড় বাহাদুর স্মৃতি সমিতির পৃষ্ঠপোষকগণ ৫০০০ (পাঁচ হাজার টাকা) দান করেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে কাশিমবাজারের

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর রমেশ ভবন নির্মাণের জন্য পরিষদ সংলগ্ন ৭ কাঠা জমি দান করেন। বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এর ভিত্তি স্থাপন করেন ও ১৩২৮-এ এর নির্মাণকার্য শুরু হয়ে ১৩৩১-এ শেষ হয়।

১৩৪২ বঙ্গাব্দে রমেশচন্দ্রের দৌহিত্রী লেডি প্রতিমা মিত্র ও আরও বেশ কয়েকজন হিতৈষীর অনুরোধে রমেশভবন-এর দ্বিতল নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার চন্দ্রকুমার সরকারের পরিকল্পনায় এই দ্বিতল নির্মাণের কাজ শেষ হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে। এই বৎসর ২৫ ফাল্গুন বর্ধমান অধিপতির সভাপতিত্বে 'রমেশভবন' এর দ্বিতলের উদ্বোধন হয়।

সৈয়দ আমির আলি

জন্ম : ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়।

১৮৭৪-এ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য

১৮৭৮-৮১—কলকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটরূপে নিযুক্ত।

১৮৭৫-৭৯—কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ঐশ্লামিক আইনের অধ্যাপক।

১৮৭৮-৮৩—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

১৮৮৩-৮৫—বড়লাটের শাসন পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য।

১৮৯০-১৯০৪ ইনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ইনি প্রথম মুসলমান বিচারপতি

১৮৮৭-এ সি. আই. ই উপাধিতে ভূষিত।

১৯০৪-এ বসবাসের জন্য লন্ডন গমন

১৯০৯-এ প্রিভি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সদস্য

মৃত্যুঃ ১৯২৮ এর ৩ আগস্ট।

১. **Life and Teaching of Mohammed :** বইটির পুরো নাম—

'A Critical Examination of the Life and Teachings of Mohammed, London, williams and Norgate, 1813 xvi, 348 p.

২. **দি স্পিরিট অফ ইসলাম :** সৈয়দ আমীর আলির ইংরেজিতে লেখা মহম্মদের জীবন, বাণী ও ইসলামিক আদর্শ বিষয়ক গ্রন্থ। দুটি পর্বে বিভক্ত বইটি। প্রথম পর্বে দশটি অধ্যায় ও দ্বিতীয় পর্বে ১১টি অধ্যায় বর্তমান। প্রথম পর্বে হজরত মহম্মদ ও তার সাহাবী অনুগামীদের কথা ও দ্বিতীয় পর্বে ইসলামের ধর্মীয় তাৎপর্য আলোচিত।

১৮৯০ সালে বইটির প্রথম প্রকাশ। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত সুলভ সংস্করণ ১৯০২-তে, আরও বিস্তৃত তথ্য সহ ১৯২২-এ প্রকাশিত হয়। সব কটি সংস্করণ বিদেশে প্রকাশিত হয়। ভারত থেকে এই গ্রন্থের বাংলায় অনূদিত সংস্করণের প্রকাশ ঘটে ১৯৭৮ সালে। বাংলা অনুবাদ কর্মটি করেছেন ড. রশিদুল আলম। কলকাতা, কলেজস্ট্রিট মার্কেটের মল্লিক ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. **History of the saracens :** বইটির পুরো নাম হোল—"A short History

of the saracens : Being concise account of the rise and decline of the saracenic power and of the Economic, social and intellectual development of the Arab Nation, from the earliest times to the destruction of Bagdad, and the expulsion of the Moors from Spain. London, Macmillian & Co. 1900. xix, 64 of. Maps, illus. 19 cm.

৪. **Mahomedan Civilization in India :** বইটির প্রকৃত নাম-History of the Mohammedan civilization in India."

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১. **কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-২.১০.১৮৮৫) :** কৃষ্ণনগরের দেওয়ান উমাকান্ত রায়ের পুত্র এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বনামধন্য পিতা। কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' রচনা করেন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ উনিশ শতকের বিশিষ্ট চিন্তানায়কদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তিনি বাংলা, ফারসি ও ইংরেজি সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে তিনি 'গীতমঞ্জরী' নামে একটি গীতি সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর আত্মচরিত 'দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের জীবন চরিত' বা 'আত্মজীবন চরিত' বাংলাসাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন।

২. **দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম :** ইংরেজি ১৯.৭. ১৮৬৩ (বাংলা ৪ শ্রাবণ ১২৭০) ১৮৬৪ নয়। মৃত্যু : ১৭.৫. ১৯১৩ (বাংলা—৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০)

৩ **শিক্ষা**—প্রবেশিকা : ১৮৭৮ সালে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ

এফ. এ. ১৮৮০-তে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে

বি. এ. ১৮৮৩-তে হুগলি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে

এম. এ. ১৮৮৪-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে ২য় শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার।

৪. **হেডমাস্টারি :** ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১ম বর্ষের অর্থাৎ আষাঢ় ১৩২০ এর সংখ্যায় প্রসাদদাস গোস্বামী লিখিত জীবন কথায় রয়েছে 'ছাপরা জেলায় রেভেলগঞ্জে প্রথম শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হন'—এই প্রথম শিক্ষক কি প্রধান শিক্ষক?

৫ **সেটেলমেন্টের কার্য :** দ্বিজেন্দ্রলালকে দীর্ঘদিন সেটেলমেন্টের কাজ করতে হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিতমালায় (৬ষ্ঠ) নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন—

জমির জরিপ ও রাজস্ব নিরুপণ কার্য

শিক্ষার জন্য মধ্যপ্রদেশে গমন ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৬

কলিন সাহেবের অধীনে দপ্তর রক্ষা প্রণালী আয়ত্ত করিবার জন্য মজঃফরপুরে গমন ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭

মুঙ্গের ও ভাগলপুরের অন্তর্গত শ্রীনগর ও বনেলি রাজ এস্টেটের সেটেলমেন্ট অফিসার ১জানুয়ারি ১৮৮৮ থেকে ১৯ জানুয়ারি, ১৮৯৩।

৬. **ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য :** এই সময় তাঁকে অবশ্য ডেপুটেশনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ২৭ অক্টোবর ১৮৮৮—৭ম শ্রেণি ২০ জুলাই, ১৮৯১ কাজ করতে হয়।

এই পদে অস্থায়ী হিসেবে কাটিয়ে ১৮৯৪ এর ১৮ আগস্ট বাঁকিপুর পাটনায় আবগারি বিভাগের ১ম পরিদর্শক নিযুক্ত হন।

অতএব তিনি ১৮৮৬ তে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ পাননি।

৭. **বিবাহ :** কলকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রকাশচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালাদেবীর সঙ্গে তাঁর হিন্দুমতে বিবাহ হয় ১৮৮৭ এর এপ্রিল মাসে

৭-১১. দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত গান ও কবিতা।

১২. **ভারতী :**

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় এই পত্রিকাটির প্রকাশ ঘটে। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সাতবছর সুষ্ঠুভাবে এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। সমকালীন শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা সম্ভারে এটি সমৃদ্ধ হোত। পত্রিকাটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। বিভিন্ন সম্পাদকদের নাম ও কার্যকাল এরূপ :

শ্রাবণ ১২৮৪—১২৯০ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১২৯১—১৩০১ স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩০২—১৩০৪ হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী
১৩০৫— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৬—১৩১৪ সরলা দেবী
১৩১৫—১৩২১ স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩২২—১৩৩০ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৩৩১—১৩৩৩ (আশ্বিন) সরলাদেবী

স্বদেশীয় ভাষার আলোচনা, জ্ঞানোপার্জন ও ভাবস্ফূর্তিতে সহায়তা করা এই পত্রিকার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।

১৩. **নব্যভারত :** জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ (১৮৮৩)-তে প্রথম প্রকাশ। উচ্চাঙ্গের মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। ১৩২৭-এর ১৮ আশ্বিন দেবীপ্রসন্ন পরলোক গমন করলে তাঁর পুত্র প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী পত্রিকাটির সম্পাদক হন। সেই বছরের মধ্যে তাঁরও মৃত্যু ঘটলে তার পত্নী ফুল্লনলিনী দেবী ১৩২৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক যুগ্ম সংখ্যা থেকে 'নব্যভারতের' সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি ৪৩শ বর্ষ অর্থাৎ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত চলে লুপ্ত হয়।

১৪. **প্রবাসী :** প্রকাশ বৈশাখ ১৩০৮/১৯০১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রবাসী' কবিতা দিয়ে পত্রিকার শুভ সূচনা। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সুন্দর প্রতিলিপি এতে নিয়মিত প্রকাশিত হোত। প্রচ্ছদে নানা স্থাপত্য নিদর্শন ব্যবহৃত হোত। পত্রিকাটি দীর্ঘদিন চলেছিল।

১৫. **প্রভা** ঃ দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালীন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্পাদকের সম্পাদনায় 'প্রভা' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রত্যেকটির প্রকাশকাল সহ সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হোল। তবে লেখক কোন্ 'প্রভা'র কথা বলেছেন তা স্থির করা যায়নি।

প্রভা (১) মাসিক ১৩০১। টালা (কাশীপুর)—সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী।

(২) " পৌষ ১৩০১—নিশা, ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত।

(৩) " বৈশাখ ১৩০৭। বাগবাজার। সম্পাদক—জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

১৬. **নূরজাহান** ঃ ঐতিহাসিক নাটক / প্রকাশকাল ১ মার্চ, ১৯০৮, ১৭৬ পৃ.।

১৭. **সাজাহান** ঃ শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক / প্রকাশকাল ৮ আগস্ট, ১৯০৯, ১৬১ পৃ.।

১৮. **রাণাপ্রতাপ** ঃ ঐতিহাসিক নাটক / প্রকাশকাল ৮ মে, ১৯০৪, ১৬২পৃ.।

১৯. **দুর্গাদাস** ঃ ঐতিহাসিক নাটক / প্রকাশকাল ৫ নভেম্বর, ১৯০৬, ১৯৪ পৃ.

২০. **মেবার পতন** ঃ ঐতিহাসিক নাটক / প্রকাশকাল ২৭ ডিসেম্বর, ১৯০৮, ১৭১ পৃ.।

২১. **তারাবাঈ** ঃ ঐতিহাসিক নাটক / প্রকাশকাল ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩, ১৫৬ পৃ.।

২২. **কল্কি অবতার** ঃ ঐতিহাসিক নাটক / প্রকাশকাল ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫, ১০৩পৃ.। প্রহসনটির পুরো নাম 'সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি অবতার।

২৩. **আর্যগাথা** (কবিতা ও গান)

১ম ভাগ / ৫ মার্চ, ১৮৮২ / ৯১ পৃ.

২য় ভাগ / ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ / ৬০, ৪৬) পৃ.।

২৪. **আষাঢ়ে** ঃ ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক কাব্য। প্রকাশকাল ডিসেম্বর, ১৮৯৯।

২৫. **হাসির গান** ঃ ১৩০৭ সাল (১৮ জুলাই, ১৯০০)। ৫১ পৃ.।

২৬. **ত্র্যহস্পর্শ** ঃ আসল নাম—"ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার" (প্রহসন) ১৩০৭ সাল। ২৩ ডিসেম্বর ১৯০০। ৯৬ পৃ.।

২৭. **বিরহ** ঃ নাটিকা ১৩০৪ সাল (ইং ১৮৯৭)। ১০৯ পৃ.।

২৮. **পাষাণী** ঃ গীতিনাটিকা। আশ্বিন ১৩০৭ (২৫ ডিসেম্বর ১৯০০)। ১২২ পৃ.।

২৯. **Lyrics of Ind** ঃ ইংরেজি কাব্য। প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ লন্ডন থেকে প্রকাশিত। ৭৯ পৃ.।

৩০. **Crops of Bengal.** ২৩ মার্চ, ১৯০৬। ২৩, ১৮৪ পৃ.।

৩১. **চন্দ্রগুপ্ত** ঃ ঐতিহাসিক নাটক। ২৪ আগস্ট, ১৯১১। ১৬৭ পৃ.।

৩২. **পরপারে** ঃ সামাজিক নাটক। ২৮ আগস্ট ১৯১২। ১৮১ পৃ.।

৩৩. **ভীষ্ম ঃ** পৌরাণিক নাটক। ৮ জানুয়ারি ১৯১৪। ২৩৬ পৃ.।

৩৪. **সিংহল বিজয় ঃ** ঐতিহাসিক নাটক। ২৩ আশ্বিন, ১৩২২ (১৩ অক্টোবর, ১৯১৫)

৩৫. **বঙ্গনারী ঃ** (সামাজিক নাটক)। ১৩২২ (১০ এপ্রিল, ১৯১৬)। ১৪১ পৃ.।

৩৬. **মন্দ্র ঃ** কাব্য। ১৩০৯। ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০২। ১০৪ পৃ.।

৩৭. **আলেখ্য ঃ** কাব্য। ১৩১৪ সাল। (৮ জুলাই, ১৯০৭)। ১১২ পৃ.।

৩৮. **ত্রিবেণী (খণ্ডকাব্য) ঃ** ২৫ শ্রাবণ ১৩১৯। (৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২২)। ৮৫২ পৃ.।

৩৯. **পূর্ণিমা মিলন ঃ** দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত মজলিশি মানুষ ছিলেন। অনেক জ্ঞানী গুণী, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্যরসিকের তাঁর বাড়িতে যাতায়াত ছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সময় কাটাতে ভালবাসতেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'পূর্ণিমা-মিলন' নামে একটি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি একটি চিঠিতে জানিয়েছেন, "এক নূতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে। .... প্রতি পূর্ণিমায় দেশশুদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া এক একস্থানে এক এক বার প্রতি পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে 'মিলন' করা হইবে। নাম হইবে পূর্ণিমা-মিলন। ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদায় সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলা-মেশা, ভাব-বিনিময়, প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে...." দ্বিজেন্দ্রলালের ৫নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাস ভবনে ১৩১১ বঙ্গাব্দের দোলপূর্ণিমার সায়াহ্নে পূর্ণিমা মিলন-এর প্রথম অধিবেশন বসে। এটি প্রায় দু-বছর ধরে চলেছিল।

৪০. **ভারতবর্ষ ঃ** ১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে শুভ সূচনা। ঋগ্‌বেদীয় স্বস্তিবচন ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' কবিতা দিয়ে পত্রিকার সূচনা। ভারতমাতার রঙিন চিত্রসহ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ভারতবর্ষ' কবিতা, নিস্তারিণী দেবীর ধারাবাহিক 'সেকালের কথা', চিত্তরঞ্জন দাসের 'সাগরসঙ্গীত', অনুরূপা দেবীর ধারাবাহিক গল্প 'মন্ত্রশক্তি' প্রভৃতি দিয়ে প্রথম সংখ্যা শুরু। সম্পাদক ছিলেন জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। অবশ্য 'ভারতবর্ষ-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার পরিকল্পনা, রচনা নির্বাচন, এমনকি সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখে গিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। শিল্পী দ্বিজেন্দ্র গোস্বামী অঙ্কিত ভারতবর্ষ নামে একটি চিত্র (সমুদ্রের ঢেউ থেকে ভারতমাতা উঠছেন। মাথায় মুকুট। গলায় সাতনরি হার, ডান হাতে শস্যগুচ্ছ। আকাশে এক পাশে উদীয়মান চন্দ্র, ও অন্যদিকে বিলীয়মান সূর্য। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত কবিতা—যেদিন সুনীল জলধি হইতে...) পত্রিকার নামকরণকে সার্থক করেছিল। ১৩২০ থেকে আমৃত্যু ১৩৪৫ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জলধর সেন। পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী হয়েছিল।

৪১. **পরলোকগমন ঃ** ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ শনিবার রাত্ সাড়ে ন-টায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিপিনচন্দ্র পাল

১. **সঞ্জীবনী :** ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথমে সতীশ মল্লিকের দ্বারা ৪নং কলেজ স্কোয়ার থেকে এটি প্রকাশিত হয়। পরে ৬নং বাড়িতে নিয়ে আসা হয় ও এখান থেকেই নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সঞ্জীবনী পত্রিকার মাধ্যমে ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত ৬নং বাড়ি হয়ে উঠল বঙ্গভঙ্গ ও কয়েকটি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। কৃষ্ণকুমারের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল সমাজের হিতকরী নানা সমিতি। অবশ্য দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র কালীশঙ্কর শুকুল, গগনেন্দ্র হোম, পরেশনাথ সেন প্রমুখ ব্যক্তি যথেষ্ট সাহায্য করতেন।

২. **ভূপেন্দ্রনাথ বসু** (১৮৫৯-১৬.৯.১৯২৪) : রাজনৈতিক জীবনে স্যার সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে বরিশালে বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। আশুতোষের মৃত্যুর পর (১৯২৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। তিনি নানা সমাজহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধি দান করেন।

৩. **হেরম্বচন্দ্র মৈত্র** (১৮৫৭-১৬.১.১৯৩৮) : খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ। প্রায় ৩০ বছর সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি এম.এ. ক্লাসের অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'দি ইণ্ডিয়ান ম্যাসেঞ্জার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্যাডলার কমিশনে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে তিনি আপন মত পেশ করেছিলেন। ১৯৩১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত করেন।

৪. **ব্রাহ্মজনমত বা ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন** (পত্রিকা)। একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা।

৫. **ট্রিবিউন**—লাহোর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা। বিপিনচন্দ্র ১৮৮৭ এর অক্টোবর মাসে এই পত্রিকার সম্পাদকের পদ লাভ করেন। সম্পাদক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছুটিতে গেলে প্রায় পাঁচমাস তিনি সম্পাদকের কাজ করেন। পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন।

৬. **হিন্দু রিভিউ :** ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিপিনচন্দ্র 'হিন্দু রিভিউ' নামে একটি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা স্বসম্পাদনায় প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি দেড় বছর কাল জীবিত ছিল। এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুজাতীয়তাবাদকে স্বীকার করে নিয়ে আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বজনীন মানবতার মহাসম্মেলনের বাণী প্রচার করা।

৭. **নিউ-ইণ্ডিয়া ঃ** বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক নিউ ইণ্ডিয়া। এটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯০১ এর ১২ আগস্ট। বিপিনচন্দ্র এর সম্পাদক হলেও এই পত্রিকা পরিচালনায় দাশ (চিত্তরঞ্জন) পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। দেশবন্ধুর জ্যেষ্ঠতাত দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের বড় ছেলে সত্যরঞ্জন দাশ এই পত্রিকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। ১৯০৭-এর শেষ নাগাদ এটি বন্ধ হয়ে যায়।

৮. **বন্দেমাতরম্ ঃ** স্বদেশী আন্দোলনের ফলে চরমপন্থীদের (এক্সট্রিমিস্ট) নেতা বিপিনচন্দ্র পালের উদ্যোগে ইংরেজি দৈনিকরূপে এটি প্রকাশিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম জন্মবার্ষিকীতে এটি প্রকাশের ইচ্ছা থাকলেও বিপিনচন্দ্র বিশেষ কারণে ঐ সময় উপস্থিত না থাকতে পারার দরুন ৬ আগস্ট এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক নিজেই বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ এর আগস্ট থেকে ১৯০৮-এর অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় দুবছর দুমাস ও তিন সপ্তাহ জীবিত ছিল। ১৯০৬-এর ৬ আগস্ট থেকে ১৮ অক্টোবর এবং ১৯০৮-এর মে মাস থেকে ১৯০৮-এর ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। মাঝের সময়টুকু অর্থাৎ ১৯০৬-এর অক্টোবরের মধ্যভাগ থেকে ১৯০৮ এর ৩০ এপ্রিল সম্পাদক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ।

৯. **ডেমোক্রাট ঃ** এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে বিপিনচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হোত।

১০. **দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ঃ** ১৯১৯-২০-তে বিপিনচন্দ্রের সম্পাদনায় এলাহাবাদ থেকে এই ইংরেজি দৈনিকটি প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্র মতিলাল নেহরুর পরিচালিত এই পত্রিকায় 'নন কো-অপারেশন আওয়ার লাস্ট চান্স' শিরোনামায় দশটি প্রবন্ধ লেখেন। এই সব প্রবন্ধে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের মূলনীতিকে সমর্থন করেন। পরে এই আন্দোলনের কর্মসূচির রূপায়ণ নিয়ে মতিলালের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি এই পত্রিকার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন।

১১. **শোভনা ঃ** প্রথম যৌবনে রচিত উপন্যাস শোভনা। প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১২৯০ (জানু. ১৮৮৪)। বেশ কয়েকটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। মোট পাঁচটি খণ্ডে (১ম-১১টি, ২য়-১৫টি, ৩য়, -১৭টি, ৪র্থ ৫টি এবং ৫মটি খণ্ডিত অধ্যায় গ্রথিত। এটি একটি দেশাত্মবোধক উপন্যাস।

১২. **ভারতসীমান্তে রুশ ঃ** বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধ গ্রন্থ (১৮৮৫)। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে গ্রন্থ নামের নীচে অর্থাৎ উপগ্রন্থনামে রয়েছে 'অথবা অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মধ্য আসিয়ায় ভারতের দিকে রুশের রাজ্যবিস্তারের বিবরণ।' গ্রন্থটি ন'টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

১৩. **জেলের খাতা ঃ** আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৯১০।

১৪. **ভারতের জাতীয়তা ঃ** লেখক জলধর সেন সম্ভবত বিপিনচন্দ্রের লন্ডন থেকে প্রকাশিত The Spirit of Indian Nationalism (1920) বইটির কথা বলতে চেয়েছেন।

১৫. **চরিত্রচিত্র ঃ** প্রকাশকাল ১৯৫৮। এই গ্রন্থে মোট আটটি জীবনালেখ্য সঙ্কলিত হয়েছে। (১) ব্রাহ্ম সমাজ ও রাজা রামমোহন, (২) রামমোহন ও ব্রহ্মসভা, (৩) বঙ্কিমচন্দ্র, (৪) সুরেন্দ্রনাথ, (৫) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬) অশ্বিনীকুমার দত্ত (৭) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (৮) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, (৯) রবীন্দ্রনাথ।

১৬. **'গল্পগ্রন্থ'**—এই নামে বিপিনচন্দ্রের কোনো বই নেই।

১৭. **'সত্যমিথ্যা'**—তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ আছে—নাম 'সত্য ও মিথ্যা'। 'সত্যমিথ্যা' নয়। এতে পাঁচটি গল্প আছে। গল্পগুলি হোল—লাবণ্য, লণ্ডনে নন্দলাল, মৃণালের কথা, কল্যাণী, বাৎসল্যের আতিশয্য। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে এর প্রকাশ। এছাড়া বঙ্গবাণী (১৩৩০) পৌষ-এ তাঁর 'পরকীয়া' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮. **ভারতের আত্মা**-বিপিনচন্দ্রের ইংরেজিতে লেখা বই Soul of India (১৯১১)-র কথা লেখক বলেছেন।

১৯. **জাতীয়তা ও সাম্রাজ্য ঃ** বিপিনচন্দ্রের Nationality and Empire (১৯১৬) বইটির কথা লেখক বলেছেন।

২০. **আত্মজীবনী ঃ** 'সত্তর বৎসর' নামে একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন। এটি ১৯৬২-তে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হয়েছিল (মাঘ ১৩৩৩ থেকে বৈশাখ ১৩৩৫) পর্যন্ত।

২১. **বালগঙ্গাধর তিলক ঃ** লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। মহারাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুলাই তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে শিক্ষালাভ করে নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন ও পরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি ছিলেন প্রথম সারির নেতা। ইংরেজ সরকার তাঁর কার্যকারণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে ১৮ মাস অন্তরিন করে রাখেন। হিন্দিকে জাতীয় ভাষা করার দাবি ছিল তাঁর। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

২২. **হোমরুল লীগ ঃ** প্রথম মহাযুদ্ধকালে অ্যানি বেসান্ত হোমরুল লীগ নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন। অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের মতো ভারতও যাতে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার পায় তার জন্য আন্দোলন করা এই লীগের উদ্দেশ্য ছিল। বাল গঙ্গাধর তিলকের উদ্যোগে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ২৩ এপ্রিল মহারাষ্ট্রে হোমরুল লীগ বা স্বরাজলীগ গঠিত হয়।

২৩. **স্বরাজ পত্র ঃ** বিপিনচন্দ্র ১৯০৮-এর আগস্টে লন্ডন যান। ১৯০৯-এর মার্চে তিনি লন্ডন থেকে 'স্বরাজ' নামে একটি পাক্ষিকপত্র প্রকাশ করেন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

১. **কাশিমবাজারের রাজবংশ ঃ** কাশিমবাজারের জমিদার বংশে কালী নন্দীর নামই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর পুত্র রাধানাথ নন্দী! রাধানাথ নন্দীর পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী। ইনিই 'কান্তনন্দী' নামেই সুপরিচিত। এঁর পুত্র লোকনাথ ও পুত্রবধূ সুসারময়ী। এঁদের পুত্র হরিনাথ ও পুত্রবধু হরসুন্দরী। হরিনাথের পুত্র কৃষ্ণনাথ 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেছিলেন। এর স্ত্রী স্বর্ণময়ী। এই দম্পতি যথেষ্ট রূপবান ছিলেন। এঁদের দুই কন্যা অকালে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে এই বংশের এখানেই শেষ। পরে কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন।

২. **মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঃ** ১২৬৭ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮৬০ এর ২৯ মে) মঙ্গলবার অপরাহ্নু ৫টা ১৪ মিনিটের সময় শ্যামবাজারে ৩৭ নং রামকান্ত বোস স্ট্রিটে পৈতৃক বাটিতে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী জন্মগ্রহণ করেন।

৩. **নবীনচন্দ্র ঃ** কাশিমবাজারে রাজবাড়ির জামাতা ছিলেন। তিনি মহারাজা লোকনাথ রায়ের পৌত্রী, হরনাথ রায়ের কন্যা গোবিন্দসুন্দরীকে বিবাহ করেন। আর হরিনাথের একমাত্র পুত্র ছিলেন কৃষ্ণনাথ।

৪. **হরনাথ ঃ** হরনাথ নয় হবে হরিনাথ।

৫. **কৃষ্ণনাথ ও স্বর্ণময়ী ঃ** রাজা হরিনাথ রায়ের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করেন। স্বর্ণময়ী (১৮৯৭) বর্ধমানে ভট্টোকোলের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অপরূপ সুন্দরী হওয়ায় মাত্র ১১ বছর বয়সে কাশিমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দীর সঙ্গে বিয়ে হয়। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করলে মহারাণী মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিধবা হন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি (বঙ্গাব্দ ১৩০৪ সালের ১০ ভাদ্র) লোকান্তরিতা হন।

৬. **স্বর্ণময়ীর বিষয়ের অধিকারিণী হওয়া ঃ** যে কোনো কারণেই হোক কৃষ্ণনাথ মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি কোম্পানি বাহাদুরের হাতে ন্যস্ত করে যান। কৃষ্ণনাথের পত্নী স্বর্ণময়ী সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে এই সম্পদ ফিরে পান। এই সম্পত্তি তখন শাশুড়ী হরসুন্দরীর অধীনে চলে আসে। তিনি তখন কাশীধামে। তিনি নিজে তখন এই সম্পত্তি তার একমাত্র দৌহিত্রী ও উত্তরাধিকারী মণীন্দ্রচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেন।

৭. **মণীন্দ্রচন্দ্রের বিপুল সম্পত্তি লাভ ঃ** ১৮৯৮ এর ৩০ মে মণীন্দ্রচন্দ্র রাজবাড়ির বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন ও 'মহারাজা' উপাধিলাভ করেন।

৮. **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ভূমি দান ঃ** 'পরিষৎ পরিচয়' গ্রন্থে বিশিষ্ট গবেষক ও পরিষৎ-প্রাণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন....'প্রশস্ত ভূমির উপর আপনার উপযোগী অধিষ্ঠান ভবন নির্মাণ না করিলে পরিষদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া কাশীমবাজারের বিদ্যোৎসাহী বদান্য মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট কিছু ভূমি ভিক্ষা

করিবার জন্য পরিষৎ সঙ্কল্প করেন; ১৩০৭ সালের প্রারম্ভেই ১লা বৈশাখ তারিখে ইস্টার ছুটির সময়ে পরিষদের কতিপয় সভ্য এই জন্য কাশীমবাজার গমন করেন। ˚চারুচন্দ্র ঘোষ, ˚রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ও নগেন্দ্রনাথ বসু এই পাঁচজন মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া ভূমি প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থনামাত্রেই মহারাজ হালশীবাগানে অপার সারকুলার রোডের উপর পাঁচকাঠা ভূমি দান করিতে সম্মত হয়েন। কিছুদিন পরে মহারাজের কলিকাতা অবস্থিতি কালে ভূমির পরিমাণ আরও কিছু বাড়াইয়া দিবার জন্য মহারাজকে আবার প্রার্থনা করা হয়; হেমচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কতিপয় সভ্য এই জন্য মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং এবারেও মহারাজ প্রার্থনামাত্রেই ভূমির পরিমাণ আরও প্রায় দুইকাঠা বাড়াইয়া দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ২০শে আগস্ট তারিখে দলিল লেখাপড়া হয়। পরিষদের পাঁচজন সভ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎকুমার রায়, প্রমথ নাথ রায়চৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই পাঁচজন পরিষদের পক্ষ হইতে ন্যাসরক্ষক নির্বাচিত হইলেন, এবং মহারাজ এই ট্রাস্টীদের অনুকূলে হালশীবাগান রোড ও আপার সারকুলার রোড সংযোগস্থানে ৭৩ ফুট দীর্ঘ ও ৬৪ ফুট বিস্তৃত জমির ন্যাসপত্র লিখিয়া রেজিস্টারি করিয়া দিলেন।" (পৃঃ ৪-৫)।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

১. **প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ঃ** পিতা বিখ্যাত যদুনাথ সর্বাধিকারী। জন্ম রাধানগর হুগলিতে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে। গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। শিক্ষান্তে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনার পর মুর্শিদাবাদে রাজ সরকারে কিছুদিন উচ্চপদে কাজ করেন। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় প্রথমে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস ও ইংরেজির অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। শোনা যায় বিদ্যাসাগর তাঁকে সংস্কৃত শেখাতেন আর বিদ্যাসাগর তাঁর কাছে ইংরেজি শিখতেন। গণিত ও জ্যোতিষে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। বীজগণিত ও পাটিগণিত রচনা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন।

২. **সূর্যকুমার সর্বাধিকারী** (৩১.১২.১৮৩২—১৯০৪) ঃ ছিলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর পিতা। হুগলি খানাকুল অঞ্চলের খ্যাতনামা চিকিৎসক। সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রথমে শ্রীরামপুর ও পরে কলকাতায় চিকিৎসা শুরু করেন। ফি না নিয়ে তিনি বহু দরিদ্র রোগীর সেবা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের তিনিই প্রথম ডীন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দি কালটিভেশান অব সায়েন্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইংরেজি পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড, বাংলা সাপ্তাহিক 'সাম্য' ও 'ভারতবাসী'র সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৩. **রাজকুমার সর্বাধিকারী ঃ** হুগলির রাধানগরে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম। পিতা বিখ্যাত যদুনাথ সর্বাধিকারী। বি.এ., বি.এল. পাশ করে লক্ষ্ণৌ গিয়ে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা', এবং 'সমাচার হিন্দুস্তানী' পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদ পান। পরে লক্ষ্ণৌ কলেজে আইন ও সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে দীর্ঘদিন কাজ করেন। কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হন। তাঁরই চেষ্টায় এটি দৈনিকপত্রে পরিণত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রদের উপযোগী করে ব্রিটিশ সংবিধানের ইতিহাস তিনিই প্রথম রচনা করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই তিনি পরলোকগমন করেন।

৪. **সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী ঃ** রাধানগর হুগলিতে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম। পিতা স্বনামধন্য সূর্যকুমার সর্বাধিকারী। তিনি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেন ১৮৮৯-তে মেডিসিন ও সার্জারিতে অনার্সসহ এম.বি. এবং ১৮৯১-তে এম.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। অস্ত্রোপচারে তিনি বিস্তর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নীলরতন সরকার, কালীকৃষ্ণ বাগচী, অমূল্যচরণ বসু প্রমুখ চিকিৎসকগণ College of Surgeons and Physicians of Bengal' নামে ভারতে প্রথম একটি বেসরকারী কলেজ স্থাপন করেন। পরে এটি নানা নামান্তরের পর আর.জি. কর মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হয়। তিনি এই কলেজের পরিচালন কমিটির প্রথম সভাপতি, প্রথম সর্বভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলনের সহ সভাপতি ও ২৫ বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। তিনি কর্নেল উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ তাঁর দেহান্তর ঘটে।

৫. **জ্যোতিপ্রসাদ ঃ** সর্বাধিকারী পরিবারের অন্যতম সুসন্তান। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

৬. **প্রবাসপত্র**—১৯২৩

৭. **ইউরোপে তিনমাস**—১৯২০

৮. **দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য কাহিনী**—১৯৩৩

৯. **জেনিভা ভ্রমণ**—১৯৩৩

১০. **স্মৃতিরেখা**—১৯৩৩

১১. **সনাতনী**

১২. **আবেগ ও উচ্ছ্বাস—তারিখ নেই।**

১৩. **Notes and Extracts** 1891-1912 C.U. XXIII, 454P.

১৪. **Thoughts and Problems.**

১৫. **প্রসন্নকুমারের লেখা পাটীগণিত।** প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন, "গভর্ণমেন্ট সংস্থাপিত অভিনব বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের

ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী পাটীগণিত গ্রন্থের অসদ্ভাব দেখিয়া আমি এই পুস্তক সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হই। সঙ্কলিত পুস্তক ইংরেজী অথবা সংস্কৃত পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। হাউন্ড, কোলন্সো, নিউমার্চ, চেম্বার্স, ওর‍্যাম, বার্নার্ড স্মিথ প্রভৃতির রচিত প্রধান প্রধান ইংরেজী পাটীগণিত গ্রন্থ দেখিয়া এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছি। স্থান বিশেষে হাউন্ড, কোলন্সো, চেম্বার্সের কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। আর আমাদের দেশে অঙ্ক করিবার যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার যে যে অংশ উত্তম বোধ হইয়াছে, তাহাও গ্রন্থ মধ্যে নিবেশিত করিয়াছি।

এই পুস্তকে অগত্যা কতকগুলি নতুন শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। এই সকল শব্দের সঙ্কলন বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেক সাহায্য করিয়াছেন। রচনা সমাপ্ত হইলে সংস্কৃত কলেজের ইউরোপীয় গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দাস ও সংস্কৃত কলেজের এখনকার সর্বপ্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য ইহারা উভয়ে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থখানি ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী হইল কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন।

এই পুস্তক রচনা বিষয়ে আমি পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই, বিদ্যার্থীদিগের উপকারে আসিলেই শ্রম সার্থক বোধ করিব।"

সংস্কৃত কালেজ

২১শে চৈত্র, ১২৬২ সাল শ্রীপ্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

বইটির ১৩শ সংস্করণ ১২ই আশ্বিন, ১২৭১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থটিতে এই বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট আছে.

সংখ্যালিখন, মিশ্রসঙ্কলন, অমিশ্রসঙ্কলন, অমিশ্রব্যবকলন, অমিশ্রগুণন, অমিশ্রভাগহার, সাঙ্কেতিক চিহ্ন, মিশ্ররাশি, লঘূকরণ, মিশ্রসঙ্কলন, দশমিক ভগ্নাংশ, অনুপাত, সমানুপাত. সমানুপাত বিধি, কুসীদ ব্যবহার, কোম্পানির কাগজ ক্রয় ও বিক্রয়, সম্ভূয় সমুত্থান, মূলাকর্ষণ, করণী, ক্ষেত্রব্যবহার। বইটি ৩৩২ পৃষ্ঠার।

১৬. **প্রসন্নকুমারের লেখা বীজগণিত :**

দুটি ভাগে এই পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম ভাগ প্রকাশিত হয় সংবৎ ১৯১৬ অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৩৮ সালে। ১ম ভাগের ৬টি পরিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় ভাগে ৪টি পরিচ্ছেদ। সংস্কৃতযন্ত্রে মুদ্রিত প্রথম ভাগের ৬টি পরিচ্ছেদ হোল :

১ম পরিচ্ছেদ -পরিভাষা ও সাংকেতিক চিহ্ন (পৃ-১)
২য় ,, -সঙ্কলন বা যোগ
ব্যবকলন বা বিয়োগ
গুণন, ভাগহার(পৃ. ১৪-৬৬)
৩য় ,, -গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক(পৃ. ৬৭-৯৪)
লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক
৪র্থ ,, -ভগ্নাংশ (পৃ. ৯৫-১৪৩)

৫ম „ -ঘাতাবেশ (পৃঃ ১৪৪-১৮১)
৬ষ্ঠ „ -করণী (পৃ. ১৮২-২৪১)
পরিশিষ্ট ২০ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ সংবৎ ১৯১৭ ইং ১৮৩৯
সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত

৭ম পরিচ্ছেদ -সমীকরণ (পৃ. ১-১৬৪)
৮ম „ -বৈষম্য (পৃ. ১৬৫-১৭৩)
৯ম „ -অনুপাত (পৃ. ১৭৪-২০৪)
১০ম „ -সমান্তর শ্রেণী (পৃ. ২০৫-২৩২)
পরিশিষ্ট ১-২৫

কয়েকটি পরিভাষা লক্ষণীয়

+ চিহ্নের নাম সংহিত
—„ „ হীনিত
± সংহিত বা হীনিত
∓ হীনিত বা সংহিত
× গুণক, গুণ ও গুণিত
= সমিত
∴ অতএব
∴ যেহেতুক

বই দুটি বিদ্যাসাগরের পরামর্শ অনুযায়ী রচিত হয়েছিল।

'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান' 'গ্রন্থের' লেখক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে, "উড, পীকক প্রভৃতির ইংরেজি বীজগণিত এবং ইউলর এবং লাক্রোয়ারের ফরাসি বীজগণিতের ইংরেজি অনুবাদ থেকে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংকলিত হয়েছিল। তাছাড়া ভাস্করাচার্যের সংস্কৃত বীজগণিত থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়। .. কি পরিভাষা ব্যবহারে, কি বীজগণিত সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলোর সমাধানে সর্বত্রই বাংলাভাষার ব্যবহাব গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য।" (পৃ. ১৮৮-১৮৯)

১৭ **নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায়ঃ** চব্বিশপরগনার মাহিনগরে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন নীলমণি মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৭-তে এম.এ. পরীক্ষায় সুবর্ণপদক লাভ করেন এবং এবং সংস্কৃত ও ইংরেজি এই দুই ভাষায় পারদর্শিতার জন্য ন্যায়ালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৭৩-৭৫ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে তাঁর সম্পাদনায় কূর্মপুরাণ প্রকাশিত হয়। তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে তিনি লোকান্তরিত হন।

১৮. **রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় :** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্যতম সুহৃদ ছিলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর কাছে শুধু বিদ্যাসাগর ইংরেজি শেখেননি, রাজকৃষ্ণ বাবুও ছিলেন। 'নববাবুবিলাস' 'নববিবিবিলাস' খ্যাত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন রাজকৃষ্ণ। সুকিয়াস্ট্রিটে রাজকৃষ্ণবাবুর বাড়িতে বিদ্যাসাগর প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। ১৮৫৬ এর ৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথম বিবাহ হয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বারো নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে। পাত্র পাত্রী যথাক্রমে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও লক্ষ্মীমণি দেবী। কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করার অনুমতি চেয়ে মাইকেল প্রধান বিচারপতির কাছে একটি চিঠি দেন। প্রধান বিচারপতির কোনো আপত্তি না থাকলেও কোনো কোনো বিচারপতি মাইকেলের চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাই মধুসূদনকে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট জনের কাছে চরিত্রের সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হয়। মধুসুদন এই মর্মে বিদ্যাসাগরকে (১৮৬৭ এর ১১ এপ্রিল) একটি চিঠি লিখে তার প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। ১৮৬৭ এর ২০ এপ্রিল বিদ্যাসাগর, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী-এই তিনজনে একসঙ্গে একটি সার্টিফিকেট দেন ও মাইকেল ব্যারিস্টারি করার অনুমতি পান।

পিতা ভবানীচরণের মৃত্যুর পর 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক হলেন পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু 'সমাচার চন্দ্রিকা'র আর সেদিন ছিল না। 'সংবাদপ্রভাকর' ও 'সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়ের' দাপটে 'সমাচার চন্দ্রিকা' ঠিক মতো চালাতে পারলেন না রাজকৃষ্ণ। দেউলিয়া হয়ে গেলেন পত্রিকা চালাতে গিয়ে। আর এই পত্রিকাটি কিনে নিলেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যাসাগরের একান্ত প্রীতিভাজন রাজকৃষ্ণ সংস্কৃত শিখতে চাইলে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা লিখে ফেললেন। প্রকাশকাল-নভেম্বর ১৮৫১। এটি রাজকৃষ্ণের পনেরো যোলো বছর বয়সের কথা। তারপর ১৮৮৯ সালে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকার ইংরেজি অনুবাদ করলেন এই নামে Introduction to Sanskrit grammar in Bengali. Translated into English with additions by Rajkrishna Banerjee." তিনি উপক্রমণিকাটির শুধু পুরোপুরি অনুবাদ করেননি প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু সংযোজিত করেছেন। ভূমিকায় তিনি লিখলেন, "The translator, from his experience as a teacher of Sanskrit at the Presidency College felt necessity of enlarging certain parts of the work for the better comprehension of the learners....."

১৮৫১ এর জুলাই মাসে রাজকৃষ্ণের 'নীতিবোধ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বইটি বিদ্যাসাগর লিখতে শুরু করেছিলেন কিন্তু সময়াভাবে আর পেরে উঠেননি। তাঁর বইতে 'বিদ্যাসাগরের বিনয়' নামে প্রবন্ধ ছিল। এছাড়া তিনি

'টেলিমেকস' নামে একটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। রাজকৃষ্ণের এক শিশুকন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর খুব ভালোবাসতেন। তার অকালমৃত্যুতে (তিন বছর) বিদ্যাসাগর ১৮৬৪-র এপ্রিলে বিদ্যাসাগর প্রভাবতীর উদ্দেশে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেটি তাঁর মৃত্যুর পর 'সাহিত্য' পত্রিকার ১২৯৯ সালের বৈশাখে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণারসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারেনা'। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন '১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট বিদ্যাসাগর মহাশয় পরমবন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবুকে সংস্কৃত প্রেসের এক তৃতীয়াংশ চারিসহস্র টাকায় এবং কালীচরণ ঘোষকে এক তৃতীয়াংশ চারিসহস্র টাকায় টাকায় বিক্রয় করেন"। 'বিদ্যাসাগর' (পৃঃ ৪১৯)

১৯-২০ **রোজনামচা ও তীর্থভ্রমণ ঃ** দেবপ্রসাদের পিতামহ যদুনাথ সর্বাধিকারী (১৮০৫-১৮৭০) দারুণ রোগে আক্রান্ত হয়ে উদ্ধারের আশায় তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ১২৬০ (১৮৪৫)-এর ফাল্গুন মাসে বেরিয়ে, ফিরেছিলেন চার বছর পরে। যদুনাথ তাঁর ভ্রমণকালে তাঁর দৈনিক আচরণ ও অভিজ্ঞতা একটি রচনায় রোজনামচার মতো করে লিখে রেখেছিলেন। পরে এটি নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'তীর্থভ্রমণ' নাম দিয়ে ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

২১. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট তিনি লোকান্তর গমন করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১. **তথ্যটি ঠিক নয়, রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম** ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট (৫ ভাদ্র ১২৭১)

২. **গ্রিন—পুরোনাম** Green John Richard (1837-83)। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গন্থ হোল ঃ (i) Short history of the English People (1874), (ii) History of the English People (1877-80), (iii) Màking of England (1881) এবং (iv) Conquest of England (1883)।

৩. **হিউম** (১৭১১-৭৬)। বিখ্যাত স্কচ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। তাঁর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ" Dialogues Concerning Natural religion (1750) এবং (ii) History of England (5 Vols.), 1754-62। পুরোনাম David Hume.

৪. **গিবন ঃ** পুরোনাম Gibbon Edward (1737-94)। ইংবেজ ঐতিহাসিক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The decline & fall of Roman Empire (6vols. 1776-88)।

৫. **দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ** (১১.৩.১৮৪০-১৯.১.১৯২৬) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সন্তান। চিন্তাশীল, প্রাবন্ধিক ও কবি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মেঘদূত কাব্যের একটি

পদ্যানুবাদ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৩) বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায়, অভিনবত্বে ও কল্পনার বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (১৮৯২), 'তত্ত্ববিদ্যা' (চারখণ্ডে ১৮৬৬-৬৯), 'অদ্বৈতমতের সমালোচনা' (১৮৯৬), 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন' তাঁর দর্শননির্ভর গ্রন্থ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি তিনবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৬. **প্রকৃতি ঃ** রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংকলন। সমকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে সংকলন করে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩০৩ (৭ অক্টোবর, ১৮৯৬)। ১৬৭ পৃ.। ১৩টি প্রবন্ধ এতে সন্নিবিষ্ট। দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু গ্রহণ-বর্জন করা হয়েছে।

৭. **জিজ্ঞাসা ঃ** ফাল্গুন ১৩১০ (মার্চ ১৯০৪), ৩০৮ পৃ.।
পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এই বৈজ্ঞানিকের দার্শনিক প্রবন্ধের সংকলন।

৮. **কর্মকথা ঃ** ১৩২০ (১৩ নভেম্বর, ১৯১৩)। ২১২ পৃ.।
১১টি বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধের সংকলন।

৯. **চরিতকথা ঃ** ৫ ভাদ্র ১৩২০ (৮ নভেম্বর ১৯১৩)। ১০৩ পৃ.। কয়েকজন বরণীয় জীবনের স্মরণীয় সংকলন।

১০. **জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-১৮৯৭) ঃ** ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় জন্ম। ট্রিনিটি কলেজে বছর চারেক পড়াশোনা করলেন। সে সময় গণিতে সেরা ছাত্রদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হল। ম্যাক্সওয়েল হলেন দ্বিতীয়। কাজ শুরু করলেন আলোকবিদ্যা নিয়ে। 'বর্ণান্ধতা' নিয়েও কিছু কাজ করলেন। এর ফলে তিনি রয়েল সোসাইটির রামফোর্ড পদক পেলেন। এরপর তিনি বিলেতের কিংস কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে চলে গেলেন। শনিগ্রহের বলয় নিয়ে কিছু কাজও করলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ হন তড়িৎ চুম্বকীয় বিষয় নিয়ে সমীকরণ। আলো যে এক ধরনের 'তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ' সেটিই তিনি প্রমাণ করলেন। ১৮৭৯ এর ৫ নভেম্বর মাত্র ৪৮ বছর বয়সে এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

১১. **কেলভিন ঃ** (২৪-১৯০৭) ঃ পুরোনাম উইলিয়ম টমসন ব্যারন কেলভিন। বিশিষ্ট স্কচ বৈজ্ঞানিক। ইনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাপের গতি সম্পর্কে এই বৈজ্ঞানিকের গবেষণা যথেষ্ট মূল্যবান। ইনি নানাপ্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্‌ভাবন করেছেন।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১ **ভগবানচন্দ্র ঃ** ভগবানচন্দ্রের পিতার নাম রামনিধি মুখোপাধ্যায়। রামনিধি মুখোপাধ্যায়ের চারপুত্র ঃ জ্যেষ্ঠ আনন্দচন্দ্র, দ্বিতীয় মহেশচন্দ্র, তৃতীয় ভগবানচন্দ্র ও চতুর্থ গোবিন্দচন্দ্র।

২ **রাজেন্দ্রনাথ ঃ** ভগবানচন্দ্রের তৃতীয়া পত্নী ব্রহ্মময়ীর গর্ভে রাজেন্দ্রনাথের জন্ম

হয়। জন্ম তারিখ ১২৬১ সালের ১০ আষাঢ় শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন।

৩. **কালীগঞ্জের ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা ঃ** ভ্যাবলা থেকে কালীগঞ্জ প্রায় তিরিশমাইল দূরবর্তী। সেখানে নীলকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে রাজেন্দ্রনাথ ইংরেজি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছিলেন।

৪. **বারাসাতে এক আত্মীয়ের বাসায় ঃ** রাজেন্দ্রনাথের পিতা ভগবানচন্দ্র যখন বারাসাতে মোক্তারি করতেন, সে সময় জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় নামে একটি বালক তার সাহায্য প্রার্থী হয় ও পরে ভগবানচন্দ্রের আগ্রহে জয়গোপাল লেখাপড়া করেন। পরে তিনি ভগবানচন্দ্রের সহায়তায় বারাসাতে একটি কাজ পান। এটি রাজেন্দ্রনাথের মা ব্রহ্মময়ী দেবীর জানা ছিল। পিতৃহীন রাজেন্দ্রনাথের অবস্থার কথা জানালে তিনি আনন্দে, কৃতজ্ঞচিত্তে রাজেন্দ্রনাথকে বাসায় নিয়ে এসে একটি ইংরেজি স্কুলে ভরতি করে দেন। ওখানে থাকার সময় পুত্র মাঝেমাঝে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে দেখে মা ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। এর মধ্যেই আশ্রয়দাতা জয়গোপালের পরলোক গমনে রাজেন্দ্রনাথের লেখাপড়ার সম্ভাবনা একেবারে শেষ হয়ে যায়।

৫. **আগ্রায় মাতুলালয়ে যাত্রা ঃ** ব্রহ্মময়ীর জ্যেষ্ঠ সহোদর তথা রাজেন্দ্রনাথের মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য সে সময় আগ্রা শহরে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করে বাস করছিলেন। বাধ্য হয়ে ব্রহ্মময়ী পুত্রকে দাদার কাছে পাঠালেন। ভ্যাবলা থেকে বারাসাত ২৬ মাইল, বারাসত থেকে ব্যারাকপুর আট মাইল, এই চৌত্রিশ মাইল পদব্রজে চলার পর ব্যারাকপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এর পর গঙ্গাপার হয়ে বৈদ্যবাটি স্টেশন হয়ে আগ্রা যাওয়ার ট্রেন ধরেন রাজেন্দ্রনাথ।

৬. **আগ্রা থেকে সুকৌশলে ফিরিয়ে আনা ঃ** মাতৃদেবী ব্রহ্মময়ী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত এই মর্মে আগ্রায় তার যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ রাজেন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরে এলেন ও রাজেন্দ্রনাথের অনিচ্ছায় ষোলো সতেরো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দেওয়া হোল। তাঁর পত্নীর বয়স তখন মাত্র বারো বছর।

৭. **কলিকাতায় পড়াশোনা ঃ** রাজেন্দ্রনাথের এক খুড়তুতো ভাই যোগেন্দ্রনাথ কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে মোটা মাইনের ট্যাক্স কালেক্টরের কাজ করতেন। ভবানীপুরে তার বাসা ছিল। রাজেন্দ্রনাথ তারই বাসায় থেকে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির স্কুলে ভরতি হন। পড়াশোনা করে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। রাজেন্দ্রনাথ কিন্তু মতিলাল শীলের স্কুলে পড়েননি।

৮. **প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্তর্গত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঃ** প্রবেশিকা পাশের পর রাজেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ভরতি হন। পরবর্তীকালে এই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগটি পৃথক হয়ে শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে অভিহিত হয়েছে। তিনি তিন বছর এই কলেজের পূর্ত বিভাগের কাজ শিখেছিলেন। ডিগ্রি লাভের আগেই স্বাস্থ্যহানির জন্য তাকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়।

৯. **কলকাতার মেস :** বিজ্ঞানী রামব্রহ্ম সান্যালের জীবনী থেকে জানা যায়, মেডিক্যাল কলেজের কাছে আরপুলি লেনের এক মেসবাড়িতে তারা থাকতেন।

১০. **স্যার ব্রাডফোর্ড লেসলি :** প্রথমে হাওড়া পুল কলকাতাকে হাওড়ার সঙ্গে যুক্ত করত। এই পুল ছিল কতকগুলি লোহার নৌকার ওপর দাঁড় করানো। সেই জন্য এই পুলকে বলা হত ভাসমান সেতু। লোক ও গাড়িঘোড়া চলাফেরার জন্য এটি তৈরি হয়েছিল। পুলের মাঝখানটা খোলা থাকত বড় বড় স্টিমার নৌকা চলাচলের জন্য। সাধারণত রাতে এই পুল খোলা থাকত। কখন খোলা হবে কখন বন্ধ থাকবে তার বিজ্ঞাপন আগে থাকতে খবরের কাগজে দেওয়া হোত। এই পুল তৈরি করেন তদানীন্তন আউধ ও রোহিলখণ্ডের রেলের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ (পরে স্যার) ব্রাডফোর্ড লেসলি। এটি তৈরি হয় কলকাতা পোর্ট কমিশনারের টাকায়। খোলা হয় ২৭.১০.১৮৭৪ তারিখে ও ভেঙে ফেলা হয় ১৯৪৫ সাল। আবার যে পুলটি ব্যান্ডেল স্টেশনের সঙ্গে নৈহাটি স্টেশনকে যুক্ত করেছে—সেটি জুবিলি পুল নামে বিখ্যাত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেকের সুবর্ণ জয়ন্তী (জুবিলি) উপলক্ষে ১৫.৩.১৮৮৭ তারিখে খোলা হয়। তাই এর নাম জুবিলি পুল। এটিও তৈরি করেন লেসলি সাহেব।

পলতায় জলের কল নির্মাণের কার্য : রাজেন্দ্রনাথের জীবনচরিতকার লিখেছেন, "সেই সময় পলতার জলের কলে শোধনের 'ফিল্টার' জল থিতাইবার বৃহৎ বৃহৎ আধার (settling tank) বসান ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বহুবিধ কার্য হইতেছিল। লেসলি মহোদয়ই ছিলেন তাদের প্রধান কর্ত্তা ...রাজেন্দ্রনাথ পলতা জলের সমস্ত ঠিকাদারী লাভ করিলেন।" স্যার রাজেন্দ্রনাথ—রাজকুমার চক্রবর্তী। পৃ. ২৮-৩০

কেদারনাথ দাস

১. **পিতা যাদবকুমার দাস :** প্রকৃত নাম যাদবকৃষ্ণ দাস। তাঁর বাবা ছিলেন হিন্দুস্কুলের শিক্ষক।

২. **জন্ম : ১৮৬৭ এর ফেব্রুয়ারি মাসে :** ১৮৬৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম হয়।

৩. **গবেষণা নিবন্ধ ও পুস্তক :** তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি গবেষণা নিবন্ধ ও তিনটি মূল্যবান ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক বই লিখেছিলেন। বইগুলি হোল :

১ Hand Book of obstetrics. (1914)
২ Text Book of Midwiferry (1920)
৩ Obstetric Forceps (1928)

৪. **আমেরিকা থেকে আমন্ত্রণ :** ১৯২২ এর মে মাসে তিনি আমেরিকান গাইনোলজিক্যাল সোসাইটি দ্বারা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকা গমন করেন এবং সেখানে 'ধাত্রীবিদ্যা' সম্পর্কিত একটি বক্তৃতা দান করেন।

৫. **কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ**—বর্তমানে যার নাম আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ।

৬. **পরলোক গমন :** ১৯৩৬ সালের ১৩ মার্চ স্যার কেদারনাথ দাসের মৃত্যু ঘটে।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

১ **যশোহর জেলার এক পল্লিগ্রামেঃ** যশোহর জেলার খরসুতি বা গৌরসুটি (Gour.suti.) নামক এক অখ্যাত গ্রামে। 'খরসুতি' লিখেছেন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'জাতক সমগ্র (১ম) এর ভূমিকা অংশে এবং 'গৌরসুটি' বলা হয়েছে ঢাকা বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত আজহার ইসলাম রচিত 'ঈশানচন্দ্র ঘোষ' জীবনী গ্রন্থে (১৯৯২)।

২. **জন্ম ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দেঃ** জন্মের সঠিক বৎসর ১৮৫৮ সালের মে মাস। (জাতক সমগ্র'র সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত ভূমিকা অংশ) জন্মের এই তারিখকে সমর্থন করেছেন আজহার ইসলাম।

৩. **পিতার মৃত্যু ঃ** ঈশানচন্দ্রের পিতার নাম ছিল চন্দ্রশেখর ঘোষ ও মায়ের নাম ছিল কালীতারা। তাঁর ৮ বছর ৯ মাস বয়সে একই দিনে পিতা ও প্রথমা ভগিনীর মৃত্যু হয়।

৪. **বি. এ. পরীক্ষা ও গণিত ঃ** ১৮৮০-৮১ সালে ঈশানচন্দ্র বৃত্তিসহ বি.এ. পাশ করেন। শোনা যায় 'এ' কোর্সের ছাত্রদের মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন।

৫. **এম. এ. পরীক্ষাঃ** ১৮৮১-৮২ সাল ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উচ্চস্থান লাভ করেন।

৬. **কলকাতা আগমন ও 'অমৃতবাজার' ও 'ইংলিশম্যান' কাগজে কাজঃ** জানা যায় কলকাতা এসে তিনি সংস্কৃত কলোজিয়েট স্কুলে অস্থায়ী পদে মাস দুয়েক কাজ করেন ও 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও 'ইংলিশম্যান' কাগজে লিখে কিছু অর্থোপার্জন করেন।

৭. **হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টারঃ** হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার রূপে তিনি ১৯১৬ সালের ১৬ জানুয়ারি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৩-এ তিনি হেয়ার স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন।

৮. **হিতোপদেশঃ** শিশুপাঠ্যপুস্তক। প্রকাশকাল—১৯০৫

৯ **ভারতবর্ষের ইতিহাসঃ** বালকপাঠ্য। প্রকাশকাল—১৯০৬

১০. **পালিজাতকঃ** গ্রন্থটির মূল নাম এরূপঃ 'জাতক অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত ফৌসবোল সম্পাদিত 'জাতকার্থ বর্ণনা' নামক মূল পালি গ্রন্থ হইতে—অনুবাদ কার্যটি মোট ছ'টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিলঃ

১ম—১০ পৌষ, ১৩২৩

২য়—৩০ কার্তিক, ১৩২৭

৩য়—১১ আশ্বিন, ১৩৩২

৪র্থ—১৫ ভাদ্র, ১৩৩৪

৫ম—?

৬ষ্ঠ—১৫ আশ্বিন, ১৩৩৭

পুস্তকটি প্রকাশের পূর্বে এই কাহিনিগুলি নব্যভারত, সাহিত্য সংহিতা, জগজ্জ্যোতি, হিতবাদী, বসুমতী প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বইটি প্রকাশিত হবার পর কবি রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন এভাবে—"জাতকের বাংলা অনুবাদ পরলোকগত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একটি আশ্চর্য কীর্তি। বৃহৎ এই গ্রন্থখানির মধ্যে কোথাও শৈথিল্য নাই, সর্বত্রই লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার পরিচয় আছে। এরূপ বহুশ্রমসাধ্য ও চিন্তাসাধ্য অধ্যবসায় বাংলাসাহিত্যে বিরল। এই অসামান্য উদ্যোগে লেখক বাংলা পাঠকদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন। এই গ্রন্থখানির অনুশীলন করিয়া অনেক উপকার পাইতেছি; সেইজন্যও অনুবাদকের নিকট ব্যক্তিগতভাবে আমি কৃতজ্ঞ।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩।

১১. **কসৌলি পাস্তুর ইনস্টিটিউটে বড় বাংলো :** সেকালে পাগলা কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা নেবার ব্যবস্থা ছিল সিমলার কাছে কসৌলির পাস্তুর ইনস্টিটিউটে। সেখানে বহিরাগত রোগীদের বাসস্থানের অসুবিধা দেখে তাঁর লোকান্তরিতা পত্নী শশিমুখীর স্মৃতির উদ্দেশে একটি বাংলো তৈরি করে দেন।

১২. **যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল :** ঈশানচন্দ্রের কন্যা ভুবনেশ্বরীর যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হওয়ার পর তিনি কন্যার স্মৃতিরক্ষার জন্য যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি শয্যার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থদান করেন।

১৩. **পরলোকগমন :** ১৯৩৫ এর ২৮ অক্টোবর ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। ৭৫ বছর বয়সে নয়।

১৪. **পুত্র প্রফুল্ল চন্দ্র :** (৩.৩.১৮৮৩—২৭.৩.১৯৪৮) ইনি পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন। এবং ১৯০৭ এ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে 'India as known to Ancient and Mediaeval Europe" নিবন্ধ লিখে 'গ্রিফিথ পুরস্কার' লাভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি রেকর্ড থেকে জানা যায় তিনি ১৯০৪, ১৯০৬-১৯৩৯ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে এবং ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এমেরিটাস অধ্যাপক (Emeritus Professor) রূপে কাজ করেন। এর আগে একমাত্র ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এমেরিটাস অধ্যাপক হয়েছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। শেক্সপীয়রের ভাষ্যকার হিসেবে একসময় তিনি বিপুল খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পিতার নামে 'ঈশান অনুবাদমালা' গ্রন্থরচনার জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০ হাজার টাকা দান করেন। পরে তাঁর বিরাট গ্রন্থ সংগ্রহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যান।

১৫. **প্রতুলচন্দ্র ঘোষ :** ঈশানচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র প্রতুলচন্দ্রের জন্ম হয় ১৯০০ সালে। পিতাও জ্যেষ্ঠভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন ও সেই সূত্রে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন।

মোজাম্মেল হক

১. **জন্ম ঃ** নদিয়া জেলার শান্তিপুরের বাউইগাছি গ্রামে।

২. **মাতামহ ঃ** মোহাম্মদ বাদউল্লাহ কর্তৃক প্রতিপালিত হন।

৩. **বাল্যশিক্ষা ঃ** মাইনর স্কুল থেকে ভার্নাকুলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ। তামাচিকা ইংরেজি স্কুল (১২৮৫), পরে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে এনট্রান্স পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

৪. **কুসুমাঞ্জলি ঃ** কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৮৮১

৫. **অপূর্বদর্শন ঃ** কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৮৮৫

৬. **হজরত মোহম্মদ ঃ** কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৯০৩

৭. **জাতীয় ফোয়ারা ঃ** কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৯১২

৮. **শাহনামা ঃ** শাহনামা (১৯০৯) এটি কাব্য নয় এটি একটি অনুবাদগ্রন্থ। এছাড়াও তিনি 'ইসলাম সঙ্গীত' (১৯২৩) কাব্য ও 'দরাফ-খান গাজী' (১৯১৯) নামে একটিও উপন্যাসও লিখেছিলেন।

৯. **মহর্ষি মনসুর** (১৮৯৬);

১০. **ফেরদৌসী চরিত** (১৮৯৮);

১১. **প্রেমহার ঃ** কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৮৯৮

১২. **তাপসকাহিনী** (১৯১৪, ২য় সং);

কয়েকটি গদ্য গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। যেমন

১৩. **হাতেমতাই** (১৯১৯);

১৪. **টিপু সুলতান)** উপন্যাস ঃ

১৫. **জোহারা** (১৯১৭)

১৬-১৭ **মাসিক পত্র প্রকাশ ঃ** তিনি 'লহরী' (১৮৯৯) এবং 'মোসলেম ভারত' (১৯২০) এই দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

এই 'লহরী' সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ্ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিবরণ দিয়েছেন তা এরূপ— শান্তিপুর হইতে প্রকাশিত "নানাবিষয়িনী কবিতাময়ী সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।" প্রকাশকাল-বৈশাখ ১৩০৭।

মোসলেম ভারত ঃ প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩২৭ (২৪.৫.১৯২০)। সম্পাদক মোজাম্মেল হক মুখবন্ধে লিখেছিলেন, "মুসলমানের অতীতের সম্বল, বর্তমানের সঙ্কট এবং ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমুজ্জ্বল ছবি তাহাদের নয়ন সমক্ষে ধরিতে পারিলে, অথবা দুটো উৎসাহের কথা বলিলেও প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়াই সেই শুভ উদ্দেশ্যের কামনা করিয়াই আজ আমরা আমাদের বড় সাধের মোসলেম ভারতকে আমাদের সাহিত্যিক সমাজে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। ...আমাদের 'সাহিত্যিক সমাজ' বলিলে কেবল মুসলমান সমাজকে বুঝাইবে না, পরন্তু বঙ্গদেশবাসী বহু ভাষাভাষী হিন্দু মুসলমান মানব সঙ্ঘকেই বুঝাইবে।"

রচনা অংশের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের 'গান', অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'ফকীরের ধর্ম,' মহম্মদ বরকুতউল্লাহের' ক্রুসেডের পরিণাম', মোহম্মদ শহীদুল্লাহের 'ভারতের সাধারণ ভাষা', কাজী আবদুল ওদুদের 'সাহিত্যিকের সাধনা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। এছাড়া হেমলতা দেবী, চণ্ডীচরণ মিত্র, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শশাঙ্কমোহন সেন, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি এই পত্রিকার লেখক ছিলেন। এছাড়াও তিনি শান্তিপুর মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন।

১৮. **স্কুল পাঠ্যপুস্তক ঃ** শিশুরঞ্জন, বর্ণশিক্ষা, সাহিত্যশিশু, পদ্যশিক্ষা, সরল বাংলা শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি স্কুল পাঠ্যপুস্তক ও রচনা করেছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

১. **জন্ম ঃ** ১৮৮৫ সনের ২২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

২. **পিতা ঃ** যাত্রামোহন সেনগুপ্ত, মা বিনোদিনী দেবী।

৩ **বিদ্যালয় শিক্ষা ঃ** চট্টগ্রামের হাজারী স্কুল, পরে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল। কলকাতায় ভবানীপুর সাউথ সাবার্বান স্কুল, পরে হেয়ার স্কুল। এবং এই হেয়ার স্কুল থেকেই তিনি এনট্রান্স পাশ করেন। (ভারত সরকারের তথ্যও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত পদ্মিনী সেনগুপ্তের লেখা 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত' বইতে ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলের উল্লেখ নেই, যদিও জলধর সেন এই স্কুলটির কথা উল্লেখ করেছেন)।

৪. **বিলেত যাত্রা ঃ** ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট। সঙ্গে গেলেন জেঠতুতো দাদা সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তিনি ডাক্তারি পড়ার জন্য গেলেন।

৫. **বিবাহ ঃ** নেলি গ্রের সঙ্গে বিয়েতে শুধু যাত্রামোহনের আপত্তি ছিল তা নয়, আপত্তি ছিল নেলির মায়েরও। তাই তারা দু'জনে কেম্ব্রিজ থেকে মাইল পনেরো দূরে রয়স্টন শহরের এক রেজেস্ট্রি অফিসে গিয়ে গোপনে দু'জনে বিয়ে করে আসেন।

৬. **ভারতীয় মজলিসের সভাপতি ঃ** ইন্ডিয়ান মজলিসের বির্তক সভাতেও তিনি যথেষ্ট নাম করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের এবং ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৭. **ডাউনিং কলেজের সুনাম ঃ** যতীন্দ্রমোহনের জীবনীকার পদ্মিনী সেনগুপ্ত জানাচ্ছেন, "ক্রিকেট ও টেনিসে তিনি কেমব্রিজের সব খেলোয়াড়ের একজন হিসাবে 'য়ুনিভার্সিটির ব্লু' লাভ করলেন।" পৃ. ১২

৮. **ইংরেজ পত্নী ও দুই পুত্র ঃ** ইংরেজ পত্নীর নাম নেলি গ্রে ও তাঁদের দুই পুত্র শিশির সেনগুপ্ত ও অনিল সেনগুপ্ত (বুঢ়ঢা)। পরবর্তীকালে ইনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় মহিলা প্রেসিডেন্ট (১৯৩৩) নির্বাচিত হয়েছিলেন। আগের অপর দুজন ছিলেন, অ্যানি বেশান্ত (১৯১৭), সরোজিনী নাইডু (১৯২৫)।

৯. **কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত ঃ** পরপর পাঁচবার তিনি কলকাতার

কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেষবারে নির্বাচিত হন ১৯৩০ এর ২৯ এপ্রিল। সেবারে তিনি কারাগারে থাকার কারণে মেয়র পদে যোগ দিতে পারেননি। সেবারে সুভাষচন্দ্র বসু মেয়র পদে নির্বাচিত হলেন।

১০. **রাঁচিতে অন্তরিন থাকা :** ১৯৩৩ এর ৫ জুন যতীন্দ্রমোহনকে রাঁচিতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তিনি অন্তরিন থাকবেন ও তাঁর দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হোল শ্রীনেলি সেনগুপ্ত ও তার ভাইঝি আইলীনকে। তিনি গৃহবন্দি থাকবেন, কারও সঙ্গে দেখা করতে যেতে তিনি পারবেন না, কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারবেন না। ছিলেন তিনি রাঁচির উপকণ্ঠে 'নগেন্দ্র লজে'।

১১. **পরলোকগমন :** ১৯৩৩ এর ২৩ জুলাই ভোর পৌনে দুটোর সময় পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন বিপ্লবী দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন।

সরলাদেবী চৌধুরাণী

১. **সখা :** বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা, সাহিত্যসেবী আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রত্যক্ষ প্রেরণায় শিবনাথের ছাত্র পুত্রপ্রতিম প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি কিশোর শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে ঋদ্ধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগাবার জন্য 'সখা' প্রকাশিত হোল। প্রায় আড়াই বছর কাল 'সখা' চালিয়ে দুরারোগ্য ক্ষয়কাশ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ২৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। এরপর ১৮৮৫-এর জুলাই মাস থেকে ১৮৮৬-এর ডিসেম্বর এই বছর দেড়েক 'সখা'র চালিয়ে শিবনাথ সম্পাদকের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'সখা' সম্পাদনা করেন অন্নদাচরণ সেন। এরপর যতদিন 'সখা' প্রকাশিত হয়েছে, সম্পাদনায় দায়িত্বে ছিলেন নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভুবনমোহন রায় 'সাথী' প্রকাশ করলেন, 'সাথী'র সঙ্গে 'সখা' যুক্ত হয়ে 'সখা ও সাথী' নাম হয়।

আর 'সখা'র প্রথম প্রকাশ ১৮৮২-তে নয় ১৮৮৩ সালে।

২. ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সখা পত্রিকায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় সরলা দেবী একটি কবিতা লিখে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সরলা দেবীর বয়স তখন ১০ বছর নয় —১১ বছর ৯ মাস। রচনাটির বিষয় ছিল "একটি ছোট মেয়ে মরে গেছে; তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন।" এই বিষয়ে পদ্য!

"প্রাণের বাছারে মোর, হৃদয়েরি ধন!
মা বলে আয়রে কোলে জুড়াক্ জীবন।
তেমনি সুধার স্বরে একবার কথা ক'রে।
কেন মুখে নাই তোর একটী বচন?
কোথা সেই হাসিরাশি খেলাধূলা সব?
উঠ যাদু, প্রাণ যায় দেখিয়ে নীরব!
আকুল প্রাণের মাঝে আয় প্রাণধন!

আয় আয় প্রাণ ভোরে বুকেতে চাপিয়া ধ'রে
ও চাঁদ মুখেতে তোর করিরে চুম্বন।
তবু কথা কহিলিনে? তবু কেন জাগিলিনে
এখন রহিলি যে রে মুদিয়ে নয়ান!
কি দশা হয়েছে যার দেখা চেয়ে একবার
কি দোষ হয়েছে—কেন হেন অভিমান?
মায়ের প্রাণের বাছা কোথা ছেড়ে যাবি?
দিব না যাইতে তোরে বুকেতে রাখিব ধ'রে
হৃদয়ের দেবী হৃদি উজলি রাখিবি।
সাধের প্রতিমা! তোরে দিয়ে বিসর্জন
কেমনে, কি লয়ে, আর ধরিব জীবন?
প্রাণের আলোক তুই, জীবন আমার,
ও আলো নিভিলে সব আঁধার আঁধার।
ত্যাজিয়া এ জন্মভূমি ভুলি এ মায়েরে তুমি
কোন্ জননীর কোলে লভিবে বিরামে?
জনম লইতে চাস্ কোন্ পুণ্যধামে?
অগণন দেবদেবীগণ আলোকের—
যেথায় খেলিছে বসি চরণে মায়ের,
চেয়ে সে মায়ের পানে কচি মুখে কচি প্রাণে
হাসিতে যাস কি ধন তুই (ও) সেই লোকে?
আমিও যাইব ওরে নিয়ে যারে সাথে করে
একেলা যাইতে ছেড়ে দিব নারে তোকে।'

শ্রীসরলাদেবী, কলিকাতা।

১৮৮৫ এর নভেম্বর সংখ্যায় আর একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। নাম ''পিতামাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য'। রচনাটি পুরস্কৃত হয়েছিল। তাঁর বয়স তখন ১২ বছর ১১ মাস।

৩-৪. **বালক পত্রিকা ও সরলাদেবীর রচনা**
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হোল ছোটদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা 'বালক' বৈশাখ ১২৯২-তে। এই পত্রিকায় সরলা দেবীর প্রথম রচনা 'দুর্ভিক্ষ' প্রকাশিত হয়' ১২৯২-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। এবং আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'বাব্‌লা গাছের কথা'।

৫. **মাডাম ব্লাভাট্‌স্কি ঃ** থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী। জন্ম রাশিয়াতে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু আমেরিকাতেই মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি কর্নেল অলকটের সহযোগিতায়

থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। এই সোসাইটি কোনো বিশেষ ধর্ম প্রচার না করে সদস্যদের নিজ নিজ ধর্মে আস্থাবান হবার জন্য উপদেশ দিতেন। অনেকেই মাডাম ব্লাভাট্স্কির অলৌকিক কার্যকলাপে সন্দিহান হয়ে পড়েন ও সোসাইটির সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এরপর মাডাম ১৮৮৭-তে ইংল্যান্ডে চলে যান ও সেখান থেকে তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা সম্পর্কিত একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। বিলেতে থাকার সময় অ্যানি বেশান্তও তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ১৮৯১-তে লোকান্তরিত হন।

৬. **রামভজ দত্তচৌধুরী ঃ** ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে উর্দু পত্রিকা 'হিন্দুস্থান' (লাহোর)-এর সম্পাদক ও ব্যবহারজীবী আর্যসমাজী রামভজ দত্তচৌধুরীকে সরলাদেবী বিবাহ করেন। এরপরে তিনি পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে পর্দানশীন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কাজে উদ্যোগী হন। ব্রিটিশ রাজরোষে স্বামী গ্রেপ্তার হলে তিনি পত্রিকার ভারগ্রহণ করেন। পণ্ডিত রামভজ ১৯২৩ এর ৬ আগস্ট মারা যান।

৭. **ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল ঃ** সরলাদেবীর সমাজসেবার প্রধান অভিব্যক্তি—ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল। তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থান ঘুরে নারীজাতির অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। মা স্বর্ণকুমারীর 'সখি সমিতি' এবং দিদি হিরণ্ময়ীর 'মহিলা শিল্পাশ্রম',—এই প্রতিষ্ঠান দুটির আদর্শ তাঁর সামনে ছিল। এই প্রতিষ্ঠান দুটির যে অভাব ছিল—সেটি পূরণের জন্য এই মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে সরলাদেবীর উদ্যোগে একটি নিখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। তাতে তিনি এই মহামণ্ডল স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন যে, ভারতে পর্দানশিন নারীদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই নাই। সেজন্য অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষায় ব্যবস্থার দরকার। ফলে অমৃতসর, দিল্লি, করাচী, হায়দ্রাবাদ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই মহামণ্ডলের শাখার প্রতিষ্ঠা হয়।

কলকাতায় কৃষ্ণভাবিনী দাসের আন্তরিক চেষ্টায় এটি একটি প্রকৃত সমাজহিতৈষী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। পতি ও একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কার্যে নিজেকে একেবারে সঁপে দিয়েছিলেন। ১৯১৯ এ তাঁর মৃত্যু হলে কবি প্রিয়ংবদা দেবী এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আব্দর রহিম

১. **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য এম. এ. তে প্রথম স্থান অধিকার।

২. **প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ঃ** ১৯০০-১৯০৩

৩. **ঠাকুর আইন অধ্যাপক ঃ** ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদ লাভ। "Principles of Mahamedan jurisprudence according to Sunni Law" গ্রন্থ প্রকাশ।

৪. **মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি ঃ** ১৯০৮

মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (দু'বার)

(১) ১৯১৬-এর জুলাই থেকে অক্টোবর—৪ মাস

(২) ১৯১৯ এর জুলাই থেকে অক্টোবর—৪ মাস

(জলধর সেনের বঙ্গগৌরব (২য়) এবং সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাংলা অভিধান' ৮ম সং ১৯৯৩ এই তথ্য পরিবেশিত। কিন্তু 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান-এ অন্য সালের উল্লেখ আছে)

৫. **কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভাপতি ঃ** ১৯৩৫—১৯৪৫

নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

প্যারীচরণ সরকার ঃ ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় প্যারীচরণ সরকারের জন্ম। তাঁদের পূর্বপুরুষদের বাস ছিল হুগলি জেলার তড়া গ্রামে। তাদের কৌলিক উপাধি ছিল দাস। এই বংশের বীরেশ্বর দাস নবাব সরকারে তহশিলদারের কাজ করতেন। বীরেশ্বরের কর্মদক্ষতার খুশি হয়ে তাঁকে 'সরকার' উপাধি দান করা হয়। এই বীরেশ্বরের পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র শিবরামের দুই ছেলে-বড়ো তারিণীচরণ ও ছোট ভৈরবচন্দ্র। ভৈরবচন্দ্রের চার ছেলে ও তিনি মেয়ে। ছেলেমেয়ের মধ্যে বড়ো পার্বতীচরণ, মেজো প্রসন্নকুমার, সেজো প্যারীচরণ ও ছোটো রামচন্দ্র। প্যারীচরণ হেয়ার সাহেবের পটলডাঙার স্কুলে ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৩ সনে হুগলি স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কলুটোলা ব্রাহ্মস্কুলে ৮ বছর প্রধান শিক্ষক রূপে ১৮৬৩ তে প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপক এবং ১৮৬৭ তে ঐ পদে স্থায়ী হয়ে আমৃত্যু কাজ করেন। মদ্যপান নিবারণের চেষ্টায় ১৮৭৫-এ বঙ্গীয় 'মাদক নিবারণী সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'ওয়েল উইশার' ও 'হিতসাধক' নামে দুখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ছোটোদের ইংরেজি শিক্ষার সুবিধার জন্য তাঁর রচিত 'First Book of Reading' এর বিভিন্ন খণ্ডগুলি একসময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এই শিক্ষাব্রতী মনীষীকে 'The Arnold of the East' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৮৭৫ এর ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি লোকান্তরিত হন।

২ **ফার্স্ট বুক, সেকেন্ড বুক ও থার্ড বুক প্রভৃতি ঃ**

১. ফার্স্ট বুক ঃ First Book of Reading for native children (Comprising numerous spelling and reading lessons progressively arranged on the principles of the most approved systems with copious observations as the art of teaching)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮৫০। প্রকাশক—স্কুল বুক প্রেস, ৪৫ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, ৫৯ পৃ. মূল্য—তিন আনা।

১৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে E. Leithbridge দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে ২৬ তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

সেকেন্ড বুক ঃ Second Book of Reading for Native Children (Comprising

Lessons prose and poetry, Compiled from approved works and progressively arranged, with Copious observation to faciliate the study of the English Language and its grammar. With woodcuts.)

প্রথম প্রকাশঃ ১৮৫১ (?)

১৩শ সংস্করণ ১৮৬৯। প্রকাশক-স্কুল বুক প্রেস, ৭৮ পৃঃ। মূল্য পাঁচ আনা। এটিরও ১৮তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে।

থার্ডবুকঃ Third Book of Reading for Native Children. (Comprising Lessons in prose and poetry. Compiled from standard works and progressively arranged with copious observations to facilitate the study of the English Language)

প্রথম প্রকাশঃ ৯ম সং ১৯৭০ প্রকাশক স্কুল বুক প্রেস, ৯৪ পৃ.। মূল্য পাঁচটাকা।

ফোর্থবুকঃ Fourth Book of Reading for native children. ষষ্ঠ সংস্করণঃ ১৮৬৮। প্রকাশক-একই। ১০২ পৃঃ মূল্য তিনআনা

Fifth Book of Reading for native children.

প্রথম প্রকাশ— ?

Sixth Book of Reading for native children প্রথম প্রকাশ— ?

৩. ১৮৯৪-এ ডবল অনার্স সহ বি.এ. পাশ

৪. ১৮৯৭-এ বি. এল. পাশ ও ভাগলপুরে ওকালতি

ওড়িশায় মুন্সেফের চাকরি ১৯০৫ পর্যন্ত।

৫. ১৯০৫-এ বিলেত গমন ও ১৯০৭-এ প্রত্যাবর্তন

বিলেতে বার-ফাইনাল পরীক্ষা পাশ ও 'ফাস্ট অনার্সম্যান' হন।

৫০ গিনি পুরস্কার লাভ।

৬. ১৯২৮-১৯৩৪ঃ কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে নিযুক্ত।

১৯৩১-এ স্যার উপাধিলাভ

৭ **দুর্গাদাস বসু (১৯১০-১৬.৫.১৯৯৭)ঃ** ভারতীয় সংবিধানের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার, বিশ্বখ্যাত সংবিধান বিশারদ এবং বিচারপতি। ১৯৬৩-১৯৭১ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর ল প্রফেসর এবং আশুতোষ মেমোরিয়াল লেকচারার ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট. (১৯৮০) এবং ১৯৮৫-তে পদ্মভূষণ উপাধি পান। ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে তিনি বহু গ্রন্থ লিখে গেছেন।

৮ ১৯৩২-এর গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনে বাংলার হিন্দুদের প্রতিনিধিরূপে যোগদান।

৯. ১৯৩৪ থেকে পাঁচবছর কাল বড়লাটের শাসন পরিষদে আইন সদস্যরূপে যোগদান। ঐ সময় 'কোম্পানীর আইন' ও বীমা আইন' বিধিবদ্ধ করেন।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

১. **পিতা ও মাতা ঃ**পিতা নীলমণি ব্রহ্মচারী পূর্ব রেলওয়ের একজন চিকিৎসক ছিলেন ও মায়ের নাম ছিল সৌরভমণি দেবী।

২. **জন্ম ও জন্মস্থান ঃ** ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন উত্তরবিহারের বিখ্যাত রেলওয়ে শহর জামালপুরে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম।

আদিনিবাস ঃ বর্ধমান জেলার সারদেঙা নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে-জন্ম গোপাল ভারতী ব্রহ্মচারী ঠাকুরের বংশধর।

৩ **শৈশবশিক্ষা ঃ** জামালপুরের ইস্টার্ন রেলওয়েজের বয়েজ স্কুলে

উচ্চশিক্ষা ঃ ১৮৯৩-এ হুগলি কলেজ থেকে গণিত ও রসায়নশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ/গণিতে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে Thawaytes পদক লাভ।

১৯৮৪ তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়নশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে স্বর্ণপদক প্রাপ্তি।

চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা ঃ ১৮৯৯-এ এল. এম. এফ ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বছর মেডিসিন ও সার্জারিতে প্রথম স্থান অধিকার করে গুডিভ ও ম্যাকলাওড পদক লাভ করেন।

৪. **পেশাগত জীবন ঃ** ১৮৯৯তে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে যোগদান। ১৯০১-এ ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে প্যাথোলজি ও মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক ও চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। ১৯০৫-এ কলকাতায় ফিরে এসে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) প্যাথোলজির শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। ১৯২৩-১৯২৭ পর্যন্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অতিরিক্ত চিকিৎসকের পদ অলঙ্কৃত করে প্রথম নন আই. এম. এস. রূপে সম্মানিত হন।

৫ **গবেষণা ঃ** ১৯০২ এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি.। ১৯০৪-এ ফিজিওলজিতে গবেষণা করে 'Studies in Haemolysis-এর জন্য পিএইচ. ডি. ডিগ্রি পান। এর ফলে তিনি কোর্টস পদক, গ্রিফিথ পুরস্কাব ও মিন্টো পদক লাভ করেন।

৬. **আবিষ্কার ঃ** ১৯০১-এ কোয়ারান্টাইন ফিভার অফ বেঙ্গল (Quarantine fever of Bengal) আবিষ্কারের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন। কালাজ্বরের শক্তিশালী প্রতিষেধক রূপে 'ইউরিয়া স্টীবামাইন' আবিষ্কার। ডাঃ ব্রহ্মচারীর মতে ইউরিয়া স্টীবামাইন হল অ্যামিনোফিনাইল স্টিবেনিক অ্যাসিড ($C_7H_{04}N_3SB$) সুদীর্ঘ সাত বছর নিরলস গবেষণার পর ডা. ব্রহ্মচারী এই যুগান্তকারী ঔষধ আবিষ্কার করলেন।

৭ **বিবিধ সম্মান ঃ** কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, চিকিৎসা বিভাগের সম্পাদক (Secretary) সভাপতি, সোসাইটির 'উইলিয়াম জোন্স' স্বর্ণপদক লাভ।

১৯১১ তে 'রায়বাহাদুর' উপাধি

১৯২৪-এ কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক লাভ

(জলধর সেন লিখেছেন ১৯২৯)

১৯৩৪-এ নাইটহুড প্রাপ্তি

১৯৩৬-এ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (ইন্দোরে অনুষ্ঠিত)

(প্রথম ভারতীয় চিকিৎসক সভাপতি)

এ ছাড়াও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টস পদক স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের 'মিন্টো পদক' লাভ করেন।

মৃত্যু ঃ ১৯৪৬ এর ৬ ফেব্রুয়ারি ৭১ বছর বয়সে।

মেঘনাদ সাহা

১. **জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ঃ** বিশিষ্ট রসায়নবিদ (৪.৯.১৮৯৪-২১.১.১৯৫৯)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৩৯), ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৫৪) হয়েছিলেন। ১৯৪৩-এ নাইট উপাধি পান এবং ১৯৫৪-এ পদ্মভূষণ উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন।

২. **প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ঃ** বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে রসায়নে গবেষণা করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র। ইনি প্রথমে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে রোনাল্ড রসের কাছে শিক্ষানবীশ ছিলেন, কিছুটা সময় দেরাদুন থেকে ঘুরে এসে তিনি বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুলে যোগ দেন। এরপর তিনি নিজব্যয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বার্লিন যান এবং কার্ল লিবারম্যানের সহযোগিতায় ফ্রিডেল ক্রাফট বিক্রিয়া নিয়ে অনুসন্ধান করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেছিলেন। নানা ধরনের জৈব বিক্রিয়া ঘটিয়ে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। ইউরোপে দীর্ঘকাল থাকার কারণে তিনি জার্মান, ফরাসি ও ইটালি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে (১৯৪৮ এর ২৫ জানুয়ারি) বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই ১ম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ও তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

৩. **জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ** আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে ভৌতরসায়নের গবেষণা শুরু হয়। এবং তাঁরই কয়েকজন ছাত্র এখানে গবেষণা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন নিয়োগী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৫-এ রসায়ন বিজ্ঞান স্থাপিত হলে আচার্য রায় পালিত অধ্যাপক পদে (১৯১৬) নিযুক্ত হন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সহকারী রূপে যোগ দেন।

৪. **ফণীভূষণ ঘোষ ঃ** আসল নাম ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত

পদার্থবিদ্যা বিভাগ (Dept of Applied physics) প্রতিষ্ঠিত হলে ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯২৫ সালে রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি পঁচিশ ফুটের কনকেভগ্রেটিং, অবলোহিত রশ্মির স্পেকট্রোস্কোপির গবেষণার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এখানে বসান। তিনি ও তার ছাত্ররা আণবিক স্পেকট্রোস্কপির ওপর অসংখ্য গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। তার যথার্থ উত্তরাধিকারী পূর্ণচন্দ্র মহান্তি এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করেন।

৫ **Science and Culture সম্পাদনা :** ১৯৩৫-এ তাঁরই উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ আসোসিয়েশন' স্থাপিত হয় ও তাঁরই মুখপত্র হিসেবে 'Science and Culture' নামক পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা মারফত তিনি দামোদর উপত্যকা সংস্কার, ওড়িশার উন্নয়ন, নদী উপত্যকা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সরোজিনী নাইডু :

১. **অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় :** অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞানে ডক্টরেট অর্থাৎ ডি. এস. সি. ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। তিনি জার্মানির 'বন' বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই ডিগ্রি লাভ করেছিলেন।

২. **বাঙালি পিতামাতার সন্তান :** সরোজিনীর বাবার নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মায়ের নাম বরদাসুন্দরী।

৩. **নিজামের অধীনে বড় চাকরি :** ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদ নিজাম দ্বারা শাসিত হোত। নিজামরা লেখা পড়া ভালোবাসত। তারা একটি কলেজ স্থাপন করেন। সেই নিজাম কলেজের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন ড. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অঘোরনাথ সেই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে মনান্তর দেখা দেওয়ায় তিনি ঐ চাকরি ছেড়ে দেন।

৪. তিনখণ্ডে তাঁর কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ

(১) The Golden Threashold (1905)

(২) The Bird of Time (1912)

(৩) The Broken Wing (1915)

পরবর্তীকালে তার আর একটি কাব্যগ্রন্থ (Songs of India) প্রকাশিত হয়।

৫. **তরু দত্ত :** কলিকাতার রামবাগানে দত্ত পরিবারের সন্তান। পিতা গোবিন্দচন্দ্র। জন্ম ৪ মার্চ ১৮৫৬। প্রথমে ফ্রান্সে ও পরে কেমব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'Lelonte de listle'-এর ফরাসি কবির কাব্য আলোচনা Bengal Magazine-এ প্রকাশিত হয়। তাঁর বিখ্যাত Ancient Ballads and Legends of Hindusthan' ১৮৮২-তে প্রকাশিত হয়। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস

'Le Journal de Mademoiselle d' Arvers' মৃত্যুর পর প্যারিস শহর থেকে ১৮৭৯ থেকে প্রকাশিত হয়।

৬. **বিবাহ ঃ** ড. গোবিন্দরাজুলু নাইডুর সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ হয়। তাঁদের দু'টি পুত্র ও দুটি কন্যা জন্মে। পুত্রদের নাম—জয়সূর্য ও রণধীর এবং মেয়েদের নাম—পদ্মজা ও লীলামণি।

৭. নেলী সেনগুপ্তা ঃ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পত্নী। বিবাহ পূর্ব নাম ছিল নেলি গ্রে। ভারতে এসে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন। পরে দিল্লির এক নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতা দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩৩ এ কলকাতা কর্পোরেশন তাঁকে অল্ডারম্যান নিযুক্ত করেন। দেশবিভাগের প্রতিবাদ করেন। স্বাধীনতার পর গান্ধীজির পরামর্শে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের চট্টগ্রামে যান ও ১৯৫৪ -তে পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলকাতায় আসেন ও এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

দেশী ব্যক্তিনাম

বিদেশী ব্যক্তিনাম

বাংলা বই

ইংরেজি বই

ইংরেজি সাময়িক পত্র

বাংলা সাময়িক পত্র

দেশ-বিদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান/সভা-সমিতি

লাইব্রেরি

হাসপাতাল

থিয়েটার / রঙ্গমঞ্চ

আইন-আদালত/কমিশন

আশ্রম, বিহার

আন্দোলন

প্রথা

বিখ্যাত ভবন

কোম্পানি

বৃত্তি, পদক, পুরস্কার

বিবিধ